স্বপ্নবন্ধকাশে

মলয়ীতা দেবসেন

স্বজনসকাশে

নবনীতা দেব সেন

প্রসঙ্গ-কথা

একদিন এই উৎসাহী তরুণ প্রকাশকের মনে হল আমাকে দিয়ে অবিলম্বেই আত্মজীবনী লেখানো দরকার, যেহেতু আমার সৌভাগ্য হয়েছে অনেক প্রণম্য মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের। তাঁদের কথা, তাঁদের স্মৃতি। কিন্তু যেহেতু আমি অলস, সেই দুরূহ কাজ এড়িয়ে যেতে, আমি বললুম, 'আরে, কত তো টুকরো টুকরো লেখা রয়েছে আমার প্রিয় মানুষদের নিয়ে। অনেক দিন ধরে তো এটা সেটা লিখছি এখানে সেখানে, সেসব গুছিয়ে নিলেই একটা স্মৃতিমেদুর বই হয়ে যাবে তো?' আমি কিছু বই দিতে পারব, আর কিছু তাঁকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। তো, তিনি অনতিবিলম্বেই একটি পাণ্ডুলিপি বানিয়ে এনেছেন, কিছু নিজের চেষ্টায়, কিছু আমার স্নেহভাজন, ছাত্রোপম শ্রীমান অর্ণব দত্ত ও শ্রীমান কানাই বারুই-এর সহায়তায়। আরো কতো প্রিয়জনের কথা যে এদিকে সেদিকে রয়ে গিয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই মকরসংক্রান্তিতে আমার সাতাত্তর বছর বয়েস হবে। কম তো মানুষের কাছাকাছি আসিনি? দেশে বিদেশে প্রচুর আশ্চর্য দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। অনেক স্নেহ পেয়েছি এ জীবনে। এযাত্রায় সবার গল্প একত্রে সাজানো গেল না। পরের বারের জন্য তোলা রইল। স্বজনসকাশে তো যত বেশি আসা যায় ততই আনন্দ!

সবচেয়ে আহ্লাদের কথা, এত শরীর খারাপ সত্ত্বেও, আমাদের পূজনীয় নীরেনদা স্নেহভরে এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে রাজি হয়েছেন। আমার প্রাণভরা প্রণাম রইলো। 'স্বজনসকাশে' এই নামের যাথার্থ্য প্রমাণিত হল ভূমিকাতেই।

৩০ নভেম্বর ২০১৪ নবনীতা দেব সেন

ভালো-বাসা

ভূমিকা

নবনীতা দেব সেনের কলম দু-দিকেই সমান চলে। যেমন কবিতায়, তেমনি গদ্যে। কিন্তু তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করার আগে— কবি হিসেবেই যেহেতু তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা, উপরন্তু তাঁর গদ্য-রচনাতেও যেহেতু মাঝে মাঝে তাঁর কবি-স্বভাবের ঝিলিক দেখি, তাই কবি নবনীতা সম্পর্কে অন্তত একটি কথা এখানে বলে নেব। সেটা এই যে, তাঁর কবিতারও আমি নিরতিশয় অনুরাগী এক পাঠক। বিশেষ করে তাঁর ছোটো মাপের সেইসব কবিতা পড়ে আমি চমকে যাই, আকারে ছোটো হলেও যা মস্ত মাপের এক-একটা ভাবনার দরজা একেবারে হাট করে খুলে দেয়। তখন ভাবি যে, বাস্ রে, যে-সত্যোক্তির আভাসটুকু দিতে আমাদের মতো পাকাঝুনো লেখকদের গাদাগুচ্ছের শব্দ খর্চা করতে হয় এবং তাতেও সেই কাজটা ঠিকমতো করে উঠতে পারি না, ইনি তো দেখছি শব্দ-প্রয়োগে এত মিতব্যয়ী হয়েও দিব্যি তার মর্মমূলে পৌঁছে যান। মুখে হয়তো এই প্রশংসার কথাটা নবনীতাকে কখনো জানানো হয়নি, কিন্তু মনে-মনে সবসময়েই বলেছি, শাবাশ।

যাই হোক, আমি লিখতে বসেছি 'স্বজনসকাশে' নিয়ে, যা কিনা তাঁর গদ্যগ্রন্থ। অথচ তার কথা লিখতে গিয়ে এই যে কবিতার কথা দিয়ে মুখপাত করলুম, এতে আবার কেউ না ভেবে বসেন যে, আমার টানটা আসলে তাঁর কবিতার দিকেই, সেই তুলনায় তাঁর গদ্য আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করে না, তা কিন্তু নয়। আবার তাঁর অপরূপ সব রূপকথা আর মজাদার সব ভৌতিক গল্পও আমাকে কিছু কম টানে না। সেই যে কবে এক ভুতুড়ে পরিবার নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন নবনীতা (যে-গল্পের গম্ভীর ও টেকো কর্তা-ভূতটি একটি থেলো-হুঁকো হাতে নিয়ে বাড়ির কাজকর্মের তদারকি করে বেড়ান), ভূত নিয়ে তার তুল্য সরস গল্প এক পরশুরাম ও লীলা মজুমদার ছাড়া এ-কালে আর কেউ লিখেছেন নাকি? কই, মনে তো পড়ে না।

'স্বজনসকাশে' নামের এই গায়ে-গতরে ভারী ও যারপরনাই উপভোগ্য বইখানায় অবশ্য দু-একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত থাকলেও, না আছে তাঁর রূপকথা, না আছে তাঁর ভৌতিক উপাখ্যান। তা হলে আছেটা কী? আছে তাঁর সাহিত্যগতপ্রাণ জনকজননীর— নরেন্দ্র দেব ও রাধারানি দেবীর— শাসনে ও স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর ধীরে-ধীরে বড়ো হয়ে ওঠার কথা। আছে আমাদের সারস্বত সমাজের জ্যোতিষ্কতুল্য বেশ কয়েকজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের কথাও। ভাগ্যিস আছে। তা নইলে তো আমাদের জানাই হত না যে, কবি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর তাঁর

কন্যা নবনীতা যখন চতুর্থীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বসেছেন, মুক্ত মনের মানুষ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন— এতদ্দেশীয় কুসংস্কার ভেঙে— কীভাবে তাঁকে দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়ে ছেড়েছিলেন। শুনে সুনীতিকুমার সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়েই যায়।

অন্যদিকে তেমনি আবার লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়, নবনীতা যখন আমাদের জানান যে, বি.এ. পরীক্ষায় কলা-বিভাগের তাবৎ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধ্যাপিকা সুকুমারী দেবীকে ঈশান বৃত্তি দেওয়া হয়নি। না-দেবার কারণ কী? না তিনি বর্ণহিন্দু নন, খ্রিস্টান। এদিকে এই বৃত্তি পাবার এটাই নাকি অন্যতম শর্ত যে, প্রাপককে বর্ণহিন্দু হতেই হবে। শুনে আমরা অবাক মেনে ভাবি যে, যাঁর প্রদত্ত অর্থ এই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, সেই ঈশানচন্দ্র বসুমশাইয়ের এমন শর্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নিল কেন? যা নেহাতই দৈবায়ত্ত, সেই বর্ণহিন্দুত্বকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে এতে যে গুণী ছাত্রের জ্ঞানার্জনের নিজস্ব যত্ন ও উদ্যোগকেই পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তাও কি তাঁরা বুঝলেন না? শুনতে পাই যে, এই বৃত্তিটি এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। সত্যিই যদি তা-ই হয়, তো আমি বলব, বাঁচা গেছে!

আর কথা না বাড়িয়ে এখন আবার নবনীতা ও তাঁর এই বইয়ের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। নবনীতাকে তো তাঁর বালিকা-বয়স থেকেই চিনি আমি, তাই এই দীর্ঘকালের পরিচয়ের সুবাদে এখন আমি নিঃসংশয় বলে দিতে পারি যে, তাঁর অনেকানেক গুণের মধ্যে কোনটি নবনীতার শ্রেষ্ঠ গুণ। পরকে আপন করে নেওয়া তো একটা মস্ত বড়ো গুণের কথা। এই গুণ কি সকলের থাকে? পনেরো আনা মানুষেরই থাকে না। নবনীতার কিন্তু আছে। এবং আছে একটু বেশি মাত্রাতেই। আর তাই আমরা লক্ষ করি যে, যাঁরা তাঁর কাছের মানুষ, তাঁদের নিয়ে যেমন তাঁর ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। তেমনি যাঁরা দূরের মানুষ, এক-আধ দিনের খুচরো আলাপচারির পরে তাঁরাও তাঁর আত্মজনের বৃত্তের মধ্যে চলে আসেন। তখন আবার তাঁদের নিয়েও শুরু হয়ে যায় নবনীতার ভাবনাচিন্তা।

এবং তাই নিয়েই এই বই। এখানে একটা জরুরি কথা বলে রাখি। নবনীতা পরকে আপন করেন বটে, তবে বাইরে বাঁশির রব উঠলেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান, তা কিন্তু নয়। আর তাই, যেমন দূরের বন্ধুদের, তেমনি তাঁর কাছের স্বজনদের মুখচ্ছবিও এ-বইয়ের আদ্যন্ত আমরা ফুটতে দেখি। সংখ্যায় বরং— যা কিনা খুবই স্বাভাবিক— তাঁরাই অনেক বেশি। তাঁদের মধ্যে দুই প্রবর পণ্ডিত আচার্য সুনীতিকুমার ও সুকুমারী দেবীর উল্লেখ তো আগেই করেছি, এবারে আসি তাঁর অন্যান্য আত্মজনের কথায়। তা একে তো নবনীতা বিখ্যাত এক কবিদম্পতির কন্যা, তায় নিজেও কবি, উপরন্তু চারপাশে যাঁদের দেখতে-দেখতে ও যাঁদের কথা শুনতে-শুনতে তাঁর দিন কেটেছে, তাঁদেরও

অধিকাংশ যে কবিই হবেন, এবং তাঁরাই চোদ্দো আনা ভরাট করে রাখবেন এই লেখিকার স্মৃতিপট, সে আর বিচিত্র কী।

বস্তুত এই বইখানি, যে-বই নবনীতার স্মৃতিকথাই বটে, পড়তে-পড়তে বারবার আমরা দেখা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের বাংলা ভাষার বিখ্যাত সব কবির ও জানতে পারছি, তাঁদের কারো-কারো বিষয়ে এমন অন্তত একটি-দুটি কথা, যা অন্যত্র পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাঁদের মধ্যে কে নেই এখানে? দু-চারজন নেই ঠিকই। তবে নরেন্দ্র দেব, রাধারানি দেবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত থেকে শুরু করে শঙ্খ, অলোকরঞ্জন, শক্তি, সুনীল ও প্রণবেন্দুর কথা বলে নিয়ে এই সেদিনই যিনি অকালে চলে গেলেন সেই শক্তিময়ী কবি মল্লিকা পর্যন্ত এসে তবে থেমেছেন। আবার ইতিমধ্যে এই বইয়েরই ইতস্তত ফুটিয়ে তুলেছেন এমন অনেক কাছের মানুষেরও মুখচ্ছবি, তাঁরা কবি তো নন-ই, এমনকী সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো ক্ষেত্রেই এমন-কিছু বিখ্যাতও নন।

মাঝে মাঝে ভাবি, যেমন আর-সকলের, তেমনি নবনীতারও তো প্রতিটি দিনের মেয়াদ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই, তার এক দন্ডও বেশি নয়, অথচ তারই মধ্যে চলছে তাঁর কবিতা রচনা, আর তারই সঙ্গে সামলাতে হচ্ছে হ্রস্ব দীর্ঘ এত এত গদ্য রচনার চাপ। এই যদি তিনি তাঁর কাছের কোনো মানুষকে নিয়ে একটি লেখা শেষ করে উঠলেন তো পরক্ষণেই মনে পড়ল যে, তাঁর ভিনদেশি বন্ধু পাকিস্তানের সাংবাদিক ও কথাকার জাহিদা হিনার কলকাতা-দর্শনের ব্যবস্থা তাঁকেই করে দিতে হবে। এবং করতে হবে এক্ষুনি। কিংবা অগৌণে তাঁকে যেতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কেন? না নোবেলজয়ী লেখিকা নাদিন গার্ডিমারের সঙ্গে তাঁর কেপ টাউনের বাড়িতে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়ে আছে। কিংবা যেতে হবে, শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে, অক্সফোর্ডে শ্রীযুক্ত নীরদ সি. চৌধুরীর বাড়িতে, কিংবা অন্য-কোনো কাজে আর-কোথাও। তদুপরি রয়েছে তাঁর আপন হাতে গড়া 'সই'-এর কাজ, যার দায়িত্বও কিছু কম গুরুভার নয়। সত্যি-সত্যিই তাই ভাবি যে, এত যাঁর কাজ ও ব্যস্ততা, এত মনোহারী গদ্য লিখবার সময়টা তিনি কোত্থেকে কেমন করে বার করে নেন।

ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবু, আর কিছু নয়, নবনীতার এই গদ্যগ্রন্থ সম্পর্কে অন্তত আর একটি কথা আমাকে বলতে হবে। সেটা এই যে, একইসঙ্গে একদিকে এমন টাটকা ও ঋজু এবং অন্যদিকে এমন হালকা ও ফুরফুরে মেজাজের গদ্য আমরা কালেভদ্রে পড়ার সুযোগ পাই। পাঠক, আপনি যখন এই বইখানি হাতে পেয়েছেন, তখন আর কালক্ষেপ না করে এটি পড়তে শুরু করুন, আপনার সময়টা বড়ো সুন্দর কাটবে।

৩০ নভেম্বর ২০১৪ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সূচি

কাছের মানুষ (নরেন্দ্র দেব) ১৫

আমার উনিশে এপ্রিল (নরেন্দ্র দেব) ২০

যা হারিয়ে যায় (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) ২৬

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন (বুদ্ধদেব বসু) ৩৩

জ্যোতি বসুর পড়শি ৩৮

পরলোকে শিল্পী সুনীল মাধব ৪৬

একে অনেক (সত্যজিৎ রায়) ৪৮

একাই এক-শো (নীরদচন্দ্র চৌধুরী) ৫২

শ্রীচরণেষু লীলা মাসিমা ৬৮

জ্ঞানপীঠের জ্ঞানোন্মেষ (আশাপূর্ণা দেবী) ৭১

কাকাবাবুকে বিদায় প্রণাম (অজিত দত্ত) ৭৪

সুদূরের পিয়াসী বিভূতিভূষণ এবং আজকের আমরা ৭৭

ট্রান্স ক্রিয়েটর (পুরুষোত্তম লাল) ৮০

আমাদের মাসিমা (নীলিমা সেনগুপ্ত) ৮৫

যাত্রী (কেয়া চক্রবর্তী) ৯০

গজুদি (সুচিত্রা মিত্র) ৯৪

মামণি রাইসম (ইন্দিরা গোস্বামী) ৯৮

চিনি-তর্পণের বন্ধু (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ১০১

শুধু সুনীলের জন্যে ১০৪

হাওয়া স্পর্শ করো (প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত) ১০৯

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) ১১৪

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ! (শ্যামলী খাস্তগীর) ১১৯

আমার মল্লিকা বনে (মল্লিকা সেনগুপ্ত) ১২৩

অশ্রু ঝলোমলো (ঋতুপর্ণ ঘোষ) ১২৬

একদিনের কলকাতা দর্শন (জাহিদা হিনা) ১৩১

এ বাড়িতে দুটি বস্তু ঢুকবে না, কম্পিউটার আর সেলফোন (নাদিন গার্ডিমার) ১৩৫
আমার গুরুমশাইয়েরা (সুকুমারী ভট্টাচার্য) ১৩৯
যৌবন বাউল (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত) ১৪৫
বাঃ বুম্বা (ড. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়) ১৫১
আমার গার্জেনরা ১৫৪
বকুল বিছানো পথে ১৬১
আমার বন্ধু শ্যামল ১৭২
মিমি আর জ্যোতি ১৭৬
ভালোবাসে আড়াল থেকে (তপন সিনহা) ১৮৮
দাদা ফাদার-ভাই ফাদার (ফাদার ফালোঁ-ফাদার আঁতোয়ান) ১৯০
গৌরীদি (গৌরী মিত্র) ১৯৫
নায়ক (রবিশংকর) ১৯৮
গোলাপবাগিচার দাদা (অজয় ঘোষাল) ২০৪
আনন্দ সংবাদ (প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়) ২০৬
'ইলাবাসের' জ্যাঠামশাই (যতীন্দ্রমোহন বাগচি) ২১০
দাদাভাইয়ের গল্প (অশোক ঘোষ) ২১৩
শেকলভাঙা মেয়ে (মীনাক্ষী সেন) ২১৬
সময় যৌবনকাল। ঠিকানা পৃথিবী (তপন রায়চৌধুরী) ২১৯
কফি খাবেন? (অমর্ত্য সেন) ২২৫
সেই প্রথম ও শেষ বলরুম ড্যান্স (অর্মত্য সেন) ২২৭
অমর্ত্যর নোবেল ২৩০

কাছের মানুষ

৫, ফার্নল্ড, ড্রাইভ, কেম্ব্রিজ,
ম্যাসাচুসেটস ০২১৩৮
ইউ. এস. এ.
১২ মে ১৯৬৯

শ্রদ্ধেয় গজেনকাকা,

স্নেহভরে আপনি আমাকে বাবা-মার বিষয়ে লিখতে বলেছেন। মা-বাপ সম্পর্কে সন্তানের আর মুখ ফুটে বলবার কীই বা থাকতে পারে। পণ্ডিতেরা বলবেন সন্তানের জীবনই তার মা-বাপের সব কথা প্রকাশ করে দেয়। তবে ঘরের কথা বাইরে বলতে, অর্থাৎ হাটে ভাঙতে আমি আমার বাবারই যোগ্য সন্তান। বিশ বছর আগে এক রবিবার। বাবার বন্ধুরা এসেছেন, শ্রদ্ধেয় শিশির ভাদুড়ী এবং আরো কয়েকজন। গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেছে, বাবা বললেন, 'তোমরা এখানেই খেয়ে যাও।' আমি তখন নেহাৎই ছোটো। মা দৌড়ে ভাত চড়ালেন। রাঁধুনীকে বললেন ডিমের ডালনা করতে। সামান্য মাংস আছে, কুলোবে না। খেতে বসে ডিম দেখেই বাবার প্রথম কথা, 'আরে, মাংসের গন্ধ পাচ্ছিলুম না সকাল থেকে? তবে ডিম দিয়েছ যে? ওহো বুঝেছি। কুলোবে না বোধ হয়? আরে ভাই বলো কেন, একপো মাংস আমরা কর্তা গিন্নি মেয়ে চাকর ঠাকুর মিলে ভাগ করে খাই, তার ওপর কুকুরটাও আছে।' গুণনিধি ঠাকুর তখন প্রায় বিশ বছর ধরে রাজত্ব করছে বাবার সংসারে— এহেন অপবাদ সইতে রাজি হোল না— একপো নয়, আধসের, এই ভ্রম সংশোধনটি সতেজ করে দিয়ে বললে, 'কিন্তু, এত্তেজনর কিমিতি হব?' মাকে তখন কিছুক্ষণ ধারে-কাছে পাওয়া গেল না, মা তো আমার মতো বা বাবার মতো নন, হেঁশেলের কথা বেরিয়ে পড়লে মা কখনো কখনো লজ্জা পেয়ে যান।

বাবাকে নিয়ে আমাদের গোলমাল লেগেই থাকে। বাবাকে নিয়ে সত্যি পেরে ওঠা গেল না। আজও বাবা ঠিক একই রকম অদমনীয়। ওই পনেরো-বিশ বছর আগেকার আরেকদিন। এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকার মেয়ের বিয়েতে ঘোরতর সেজেগুজে আমরা নেমন্তন্ন গেলাম। গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। তালাবন্ধ। বাড়ি নিষ্প্রদীপ। অবশেষে বাবা বললেন, 'চিঠিটা হারিয়ে গেছে বটে, আমার কিন্তু এবারে ঠিকই মনে পড়ছে, আজ নয়, পরের রোববার বিয়ে।' পরের রবিবারে দুরুদুরু বক্ষে ফের ট্রাই নেওয়া হল। বাঁশটাশ খুলে ফেলা হচ্ছে। শুক্রবার বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ বাড়ি নেই, কারণ আজ ছেলের বাড়িতে নেমন্তন্ন। বউভাত। বাবা ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'চলো, বেশ ট্রামে চড়ে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক। দিব্যি ফুরফুরে বাতাসে সন্ধ্যাটা ভালো কাটবে।' সেই সাহিত্যিকা আজ পর্যন্ত জানেন কিনা জানি না যে দু-দুবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আবার একদিন। আমরা হল্যান্ডে যাচ্ছি। বেলজিয়মের বর্ডারে পুলিস এসে বাবাকে খপ করে

ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতে হাসি-হাসি মুখে বাবা বলে গেলেন, 'ওই ভিসাটা কয়েকদিন আগে ফুরিয়ে গেছে কিনা। তোমরা হাগ-এ নেমে অপেক্ষা করো। পরের ট্রেনেই আসছি।' ট্রেন থেকে দেখলাম ধু-ধু মাঠের মধ্যে হাস্যবদন বাবা পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছেন। আমরা মায়ে-ঝিরে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে ঘণ্টা তিনেক হাগ স্টেশনের ট্রেন চলাচলের হিসেব-নিকেশ করলাম। ফোনে হোটেল বুক করা হল। সন্ধ্যাবেলা বাবা বিজয়ীহাস্যে একটি ট্রেন থেকে অবতীর্ণ হয়েই নির্ভীক সুরে প্রশ্ন করলেন, 'হোটেল-টোটেল সব ঠিক করে রেখেছো তো?' সহজভাবে মা বললেন, 'হ্যাঁ।'

সে-যাত্রায় আরেকবারও বাবা ভিসার গোলমালে পড়েছিলেন। ভিয়েনা যাচ্ছি। রুশ zone-এ রুশ পুলিস উঠলো। আমাদের রুশ পারমিটটা নেওয়া হয়নি, বাবার মনে পড়ল। কিন্তু বাবা তো সদানন্দ। যুগটা ছিল স্ট্যালিনের। মজলিশি হেসে বাবা তাঁর খানদানি গুম্ফ চাড়া দিয়ে বললেন, 'স্তালিন-মুস্তাশিও? লং লিভ স্তালিন-মুস্তাশিও।' হাসতে হাসতে আমাদের পাসপোর্ট দেখতে না চেয়েই পেরিয়ে গেল রুশ পুলিস। আজ এ ঘটনা সত্য বলে ভাবতে আমাদের নিজেদেরই পরম বিস্ময় হয়। একটা তুচ্ছ রসিকতার এই মাহাত্ম্য দর্শনে সবার চেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বাবা স্বয়ং।

কিন্তু এ তো গেল অন্য যুগের কাহিনি।

এখন বছর পাঁচেক আগের কথায় আসি। বাবা সঙ্গীতনাটক আকাদমির একটা সভায় দিল্লি গিয়েছেন। উঠেছেন আমার শ্বশুরবাড়িতে, অশোক রোডে। বয়স হয়েছে, একলা ভ্রমণ করছেন, কলকাতায় মা উদ্বিগ্ন। আমিও তখন মার কাছে, কলকাতায় আছি। যথাকালে বাবার পৌঁছ-সংবাদ এল, একটি পোস্টকার্ড। পরের ডাকেই আমার শাশুড়িমায়েরও চিঠি এলো বাবার কুশল সংবাদ জানিয়ে। মা তাতে এইরকম লিখেছেন, 'বেহাইমশাই বলছেন, তিনিও একটি কার্ড লিখেছিলেন। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, রাস্তা দিয়ে একটি লোক সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে দেখে, তাকে হাত নেড়ে থামিয়ে, তার হাতে সেই কার্ডটি দিয়ে বলেছেন, যে-কোনো ডাকবাক্সে ফেলে দিতে। আমি ঠিক জানি না রাধারানিদি, কবে সেই চিঠি পৌঁছুবে। দেরি হলে পাছে আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, তাই আমিও তাঁর পৌঁছ-খবরটি আজই জানিয়ে দিচ্ছি।'

আমার স্বামী সুখী মানুষের উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাটির কথা বলতে ভালোবাসেন। একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত মানুষের হাতে জরুরি চিঠি দিয়ে দেওয়ার মধ্যে জগৎসংসারের প্রতি যে অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় আছে, সেটা ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত ধরে রাখা খুব সহজসাধ্য নয়। পার্থিব কানুনে অবশ্য এটাকে দায়িত্বহীন বিশ্বাস বলতে পারা যায়। এটা সম্ভবপর হয়েছে কেবলমাত্র পৃথিবীর সঙ্গে বাবার যোগাযোগটুকু বৈঠকখানা মারফৎ বলে। বাবা জীবনে কখনো বাজারে যাননি, নিজের হাতে একজোড়া ধুতি পর্যন্ত কেনেন নি, গয়লাকে দুধ মেপে দিতে দেখেন নি, মিস্ত্রিকে দিয়ে ইট গাঁথান নি। এসব যাবতীয় মন্দকর্মের ভার মায়ের ওপর। বাবার সঙ্গে ব্যবসার যোগ কেবলমাত্র প্রকাশকদের মাধ্যমে। আর এই পাবলিশিং ব্যবসায়ে যে লোকঠকানো, সে তো ঠিক খোলা বাজারের মতন নয়, সেখানেও চা-অমলেট, জমজমাট বৈঠকখানা। তাই বাবা হাজার ঠকেও শেখেন নি। ঠকেছেন যে, সেইটে ধরতে ধরতেই বহু বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। তখন আর স্বভাব বদলানোর দিন বাকি নেই।

স্বভাবগুণে বাবা নিজের তৈরি আহ্লাদে নিজে মগ্ন থাকেন। বাবার আনন্দ কাড়তে পারে, এমন ঠগ বাজারে নেই। বাবাকে অনেকদিন আমি বলতে শুনেছি, আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের চারতলা

বাড়ি মোজেক মার্বেল সুদ্ধ আট হাজার টাকাতে তৈরি হয়েছে। একদিন বাবার এক বন্ধুর সামনে বাবা সরবে এ খবর ঘোষণা করছেন, সেই বন্ধুটি বলে উঠলেন (চিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়), 'নরেন! তুই আর যাকে খুশি ধোঁকা দিতে পারিস, আমার সামনে দিস না। আমি তোর বাড়ির এঞ্জিনীয়র, ডিজাইনার, ওভারসিয়র— এ বাড়ির পাই-পয়সার হিসেব আমি জানি, আর রাধারানি জানে। আট হাজারে তোর বাড়ির একতলাটাও হয়নি।' মাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, মা বললেন, 'আপত্তি করে কী হবে বল? যে শুনবে সেই বুঝবে উনি হিসেবটা জানেন না। বাড়ির জন্যে আট হাজার মতো ধার করতে হয়েছিল, তাই ওই সংখ্যাটাই তোর বাবার মনে আটকে আছে, বাকিটা মনে থাকে না।'

আর, কিছু কিছু জিনিস মনে থাকলেই বা বাবার কি এসে যায়! চিরকালের ভোজনরসিক বাবাকে দুবার হার্ট এ্যাটাকের পরে এখন খুব সাবধানে অনেক নিয়ম মেনে খেতে হয়। 'এককালে একাই একটা পাঁঠা খেয়েছি, বুঝলি?' বলে হুঙ্কার দিয়ে বাবা দুই আউন্স মেদহীন মুরগির আলুনি স্টু হাসিমুখে খেয়ে নেন। মিষ্টি ছাড়া খাওয়া শেষ হত না বাবার কোনোদিন। এখন বাবার মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ। ঠাট্টা করে বলেন, শরীরে মধুর আধিক্য হয়েছে কিনা। সত্যি কোনো বস্তুতেই বাবার অতিরিক্ত আসক্তি দেখিনি, এক মানুষে ছাড়া। (আর বাবার গুম্ফ জোড়াতে! শুনেছি আমার ঠাকুমার শ্রাদ্ধে বাবা চুল-গোঁফ কামিয়ে ঘরে ঢুকতে মা চিনতে পারেননি সেই নিরীহ ব্যক্তিটি কে!)

বাবার লাগতো দিনে দু-প্যাকেট নেভীকাট আর গড়গড়াতে অন্তহীন অম্বুরী। সারাবাড়িতে গয়া অম্বুরীর সুরভি, বাবার ঘরভর্তি শান্ত সাদাটে ধোঁয়া আর মৃদু গুড়গুড় ব্যঞ্জন— এই শৈশব স্মৃতিই আমার অতি প্রিয়। লুকিয়ে গ্রীষ্মের দুপুরে যে বাবার জরি-জড়ানো নলচেটার স্বাদ গ্রহণ করিনি বারকয়েক, তাও নয়। কিন্তু আমার স্কুলের দিন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘরের সুগন্ধী ধোঁয়ার দিন ফুরালো। বাবার পায়ের যে ফুলোটাকে কখনো বেরিবেরি কখনো ফাইলেরিয়া ভেবে চিকিৎসা হচ্ছিলো, ধরা পড়লো তার গোড়াটা হৃদয়ে। তখনকার ডাকসাইটে ডাক্তার ছিলেন ডেনহ্যাম-হোয়াইট সাহেব। তিনি বললেন হার্দিক দোষে পা ফুলছে এবং বাবার আয়ু আর বছর পাঁচেক। কারণ যে-রেটে বাবা ধূমপান করেন তাতে তার চেয়ে বেশি টেঁকা সম্ভব নয়। সঙ্গে জুড়োলেন মন্তব্য— ধূমপান ছাড়তে বলেও লাভ নেই, চল্লিশ বছরের অভ্যাস, ও এক যমে ছাড়াতে পারে।

তা যমের বদলে ডাক্তার ডেনহ্যাম-হোয়াইট যথেষ্ট হলেন বাবার ক্ষেত্রে। ডাক্তারখানার টেবিলেই বাবা সিগারেট দেশলাই ফেলে দিয়ে এলেন, বাড়ি এসে বললেন, গড়গড়াটা মেজে তুলে রাখতে। সে গড়গড়া আর নামানো হয়নি। বাবার গোঁফের তলায় পরিচিত অগ্নিবিন্দুটিও আর কোনোদিন জ্বলে ওঠেনি।

এর বিশ বছর বাদে, পানজর্দা ছাড়তেও বাবার কেবল কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল। যে-জিনিস ছাড়তে শুধু মুহূর্তের মনস্থির করা প্রয়োজন হয় তাকে আসক্তি বলে গণ্য করা উচিত কিনা জানি না। মার এক বন্ধু (শিল্পী শ্রীমুকুল দের স্ত্রী, বীণা দে) একদিন মাকে বলেছিলেন, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগভয়ক্রোধঃ— তোমার স্বামী, রাধারানি, সত্যি স্থিতধী পুরুষ।' কথাটি আমার মনে গেঁথে আছে। তাঁর এই উক্তিটি আমার বাবার চরিত্রের সব চেয়ে উপযুক্ত বর্ণনা বলে আমি মনে করি।

তবে আসক্তি কাকে বলে, বাবা জীবনে কোনোদিন জানেননি, তা বলবো না। বাবার নানা আসক্তি ছিল— বই কেনা, বই পড়া, ভ্রমণ, চিঠি লেখা, ধূমপান, পানজর্দা, ভালো খাওয়া, আর সভাসমিতিতে গিয়ে শতসহস্র বন্ধুসঙ্গ করা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেক মুক্ত বাতায়নই বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু বাবার কোনো অভিযোগ দেখছি না। বাবা বলেন, 'পা বাড়িয়ে আছি।' আমার শুনতে ভালো লাগে না।

১৯৫৯ সাল। বাবা যাচ্ছেন আমাকে জাহাজে তুলতে, বম্বে। ট্রেন ছাড়তে আমি বাবাকে বললাম, 'বাবলা, এই জামাটা তো তোমার জামা নয়? এটা মাঝখানে খোলা, ঝিনুকের বোতাম সেলাই করা, বুকে ঘড়ির পকেট নেই!' বাবার পাঞ্জাবি হয় বাঁদিকে খোলা, বুকে ঘড়ির পকেট থাকে, সোনার বোতাম লাগিয়ে পরা অভ্যেস। বাবা বললেন, 'তাই তো? তবে এটা কার জামা?' কি আমার বাপের বাড়ি, কি মামার বাড়ি— দুপক্ষ থেকেই এই প্রথম বাড়ির মেয়ে পড়াশুনো করতে কালাপানি পার হচ্ছে। বাড়িতে নানা আত্মীয় সমাগম হয়েছিল। বাবা অন্যের জামা গায়ে দিয়ে আমাকে বম্বে তুলতে চললেন। হাতাটা প্রায় ইঞ্চি চারেক ছোট, বগল খিঁচে ধরেছে। বাবা ডিনার অর্ডার দিলেন। তারপর পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন রুমাল, কলম, ট্যাঁকঘড়ি, বা পার্স, কোনোটাই নেই। অন্য জামার পকেটে থেকে গেছে। আমরা দুদিন ধরে বম্বে যাব। ট্রেনে খেতে হবে। নেমে কুলি, ট্যাক্সি, তারপর হোটেল খরচ। কী ভাগ্যি, মা টিকিট দুটো আমার হাতব্যাগে ভরে দিয়েছিলেন। মা তখন খুবই অসুস্থ। হাওড়াতেও আসতে পারেননি— ভাগ্যগুণে পাশের কামরায় যাত্রী ছিলেন কবিবন্ধু শ্রীপ্রণবেশ দাশগুপ্ত ও তাঁর বাবা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত। সারাপথ নির্মলেন্দবাবুই আমাদের বাপবেটিকে ভরণপোষণ করতে করতে বম্বে অবধি নিয়ে গেলেন। খড়গপুর থেকে মাকে 'তার' করে দিলাম T. M. O.-তে বম্বের হোটেলে টাকা পাঠাও। বম্বে শহরে নেমে দেখি আমার মামা সশরীরে উড়ে এসে পড়েছেন। আমার এক দাদা স্নান সেরে বেরিয়ে নিজের পাঞ্জাবিটা খুঁজে পাননি, তখনই আবিষ্কৃত হয়েছে যে বাবা তাঁর জামা, রুমাল, টাকা, ঘড়ি সর্বস্ব ঘরে ফেলে রেখে কেবলমাত্র কন্যাটিকে ট্যাঁকে গুঁজে বিদেশ বিভুঁই রওনা হয়ে গেছেন। মা তখন টাকা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হননি, বাবার অভিভাবক হবার জন্য অতিপ্রিয় দাদাটিকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি সমুদ্রে ভেসে পড়বার পরে আমার আপনভোলা বাবারটির খবরদারি করবেন কে? মায়ের চেয়ে আমার মামা বাবার জন্যে এককাঠি বেশি ভাবেন বই কম নয়, তাই আর কাউকে না পাঠিয়ে তিনিই স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন।

জাহাজ ছাড়ার আগের দিন। বাবা একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সারাদুপুর সমুদ্রদর্শন হচ্ছে। আমি একটু ক্ষুব্ধ। কাল চলে যাবো কতো বছরের জন্য, কোথায় আমার দিকে একটু মন দেবেন, তা নয়—। সত্যি বলতে কি, বাবার মনোযোগ আমি বাল্য থেকে খুব কম পেয়েছি। মা বলেন, বাবার প্রথম প্রেম লেখাপড়া, দ্বিতীয় প্রেম সভাসমিতি। আমি অবশ্য তা বলি না। প্রথমেরও আগে প্রথম আছে। সেটার কথাই এখন বলছি। বাবার সিন্ধুপ্রীতি যখন অসহ্য হয়ে উঠল আমি তেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম— যা জীবনে কোনোদিন দেখিনি। বাবার বড়ো বড়ো দুই চোখে ভরা ভরা অশ্রু।

নিদারুণ লজ্জা পেয়ে, বাবাকে আমি কতদূর ভুল বুঝেছিলাম ভেবে, 'মরমে মরে গিয়ে' ছেলে-ভোলানো সুরে বললাম, 'এই তো বাবলা, তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' বাবা কোঁচার খুঁটে চশমা মুছে বললেন, 'সে আমি জানি। কিন্তু কি জানিস, তোর মায়ের জন্যেই

ভাবছি। ওর শরীরটা বড্ড ভেঙে পড়েছে কিনা, এতটা মনোকষ্ট সয়ে যে কি তিন বছর বাঁচবে? তোকে ছেড়ে তো কখনো থাকেনি।'

বেজায় অভিমান হয়ে গেল। ও, সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে মার জন্যে মন কেমন করা হচ্ছিল! সেই যে বাবার চোখে অশ্রুবিন্দু এবং আজ অবধি সেই শেষ, সে কেবল মারই জন্যে। আর আমি কিনা ভাবলাম—! তাই বলছি, প্রথমেরও প্রথম আছে। বাবার প্রথম— মা। আর মায়ের প্রথম— বাবা। পৈতৃক জীবনে আমার আর সংসারে প্রথম হওয়াটা হয়ে ওঠেনি। (গোত্রান্তরের পরে কী হয়েছে না হয়েছে সে কথাটা তো হাটের মধ্যে বলবো না!)

এক এক বছর যাচ্ছে, আর বাবার একটি করে প্রিয় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা অশ্রুপাত করেন না। বুঝতে পারি 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন' মূর্তির অন্তস্থলে হাজার গঙ্গার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মুখে বলেন, 'এবার আমার পালা। পা তো বাড়িয়েই আছি।' কিন্তু আমরা? পা বাড়ানো কি এতই সহজ কথা?

* * * *

এটা শুধু বাবার গল্প হল। মার গল্প? মার কোন গল্পটা বলবো? মার অতি বিচিত্র শৈশব, মা করুণ মধুর কৈশোর-স্মৃতির প্রিয় গল্পগুলি শুনতে শুনতে আমি আমার মাকে চিনতে শিখেছি। আর আমার বাবা যে এমনি বাবা, এমন অকপট, অম্লান— স্ত্রীকন্যার দাবির বন্যায় তাঁর মনের কৌমার্য যে এতটুকু হরণ করতে পারেনি, আমার এই চিরতরুণ চিরব্রহ্মচারী বাবার গোড়ায় রয়েছেন এক কুশলী শিল্পী— আমার মা। সংসারে থেকেও বাবা স্বচ্ছন্দে পরম অহঙ্কারী— হাঁসের ডানার মতো করে বাবার হৃদয়মনের আষ্টেপৃষ্ঠে প্রতিরোধক তৈললেপন করে বাবাকে যিনি সংসার-proof মালিন্য-proof করে রেখেছেন, তিনি আমার মা। নীলকণ্ঠের মতো সংসারের যা কিছু গরল মা আপনার মধ্যে ধারণ করে রেখে, বাবার সুমুখে শুধুই অমৃতের অংশটুকু বেড়ে দিয়েছেন। তাই আশি বছরেও বাবার মাথার সব চুল কুচকুচে কালো। তাই বাবার সারাহৃদয় কচিসবুজ। আমার জীবনশিল্পী মায়ের কথা আমি কি আর লিখবো।

* * * *

অমর্ত্য বললেন, জামাই হয়ে মাননীয় শ্বশুর-শাশুড়ির বিষয়ে বক্তৃতা দেবার প্রগল্‌ভতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাও যদি তাঁরা অর্থনীতিবিদ হতেন, তবু একটা কথা ছিল। তবে একথা ঠিকই, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে দুরু দুরু বক্ষে যখন কবি নরেন্দ্র দেবের অটোগ্রাফ নিতে গেসলেন, তখন হাসিখুশি গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটিকে দিব্যি পছন্দ হয়েছিল। তারপর যখন সেই ভদ্রলোক কন্যাসম্প্রদান করতে বসে পুরোহিতকে দাতব্য ধুতিচাদর দক্ষিণা ভুল করে জামাইকেই ধরে দিলেন, তখনও তাঁকে রীতিমতো পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া, রহস্যময়ী অপরাজিতা দেবীকে চিরাচরিত শাশুড়ি মূর্তিতে পাওয়ার অভিজ্ঞতাটি ঠিক সহজে কল্পনা করা যেত না, ঘটে না গেলে!

এই আষাঢ়েই দেশে ফিরছি। বাবার জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে চাই। আমাকে লিখতে আদেশ করেছেন, আমি যো-হুকুম পালন করলুম। কিন্তু হাটবাজারে ঘরের কথা রটানোটা উচিত হল কি?

ইতি
প্রণতা
নবনীতা

আমার উনিশে এপ্রিল

হঠাৎ এক একটা তারিখের গায়ে এক এক রং-এর এক এক গন্ধের জামা পরানো হয়ে যায়। সেই রং সেই গন্ধ আর চট করে মোছে না। আমাদের সকলেরই জীবনে এরকম কিছু বিশেষ দিন আছে, দিন থাকে। জীবন এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব দিনের গা থেকে পোশাকগুলি কখনো কখনো আলগা হয়ে আপনিই খসে পড়ে যায়, তারিখগুলিকে স্মৃতিভার মুক্ত করে দিয়ে। আবার কখনো তা হয় না, কিছুতেই মুক্তি পায় না তারিখটা। জীবনের সঙ্গে বাঁধা থাকে জন্মের মতো। সেই পুরনো জামাটা কোনোদিন পুরনো হয়ে যায় না, যত দিন যায়, পুরনো গন্ধটা তারিখটা গায়ে আরও বেশি করে এঁটে বসতে থাকে। যেমন কিছু জন্মদিন। যেমন কিছু মৃত্যুদিন। যেমন কিছু কিছু আশ্চর্য গোপন একান্ত নিজস্ব দিন, যার বিশিষ্টতা হয়তো তুমি ছাড়া আর কারুরই জানা নেই। কেউ না জানুক তুমি নিজে তো [illegible]দিন দিনটাকে ভুলবে না, তুমি জানো। আবার এরকমও কয়েকটা তারিখ আছে যেগুলো মনে করতে না চাইলেও তারা মনে পড়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্তের ছবি, কিছু শব্দের ধ্বনি নিয়ে দুর্নিবার তারিখগুলো ফিরে ফিরে আসে। এরকম করেই আমরা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বনিবনা করে নিয়ে, অনন্ত সময়ের সঙ্গে মানিয়ে গুনিয়ে, এই সামান্য সুখে আর যন্ত্রণায় গাঁথা অসামান্য জীবনখানি যাপন করি। নিজের সঙ্গে নিজে ঘর করি।

উনিশে এপ্রিল আমার বাবা কবি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর তারিখ, ৫ বৈশাখ। হিসেব করলে দেখি অনেক দিন হয়ে গেল বাবা বাড়ি নেই। আমাদের 'ভাল-বাসা' বাড়িতে ঢুকলেই দোরের সামনে যে সুন্দর একটি বেয়াড়া মতো বড়োসড়ো, পালিশ করা কাঠের ডাকবাক্স আছে, আমার বাবার নিজস্ব ডিজাইনের তৈরি, তাতে তিনটি নাম আছে, নরেন্দ্র দেব, রাধারানি দেবী আর নবনীতা দেব। নামের পাশে একটা করে ছক কাটা, 'আছে'/'নাই' করার কথাটা মনেই থাকত না তাঁর।

কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পরে একদিনে মায়ের মনে পড়েছিল বাবার সখের 'আছে'/'নাই' লেখা ডাকবাক্সটার কথা। একদিনে কোথা থেকে ফিরছিলুম আমরা, মা আর আমি। বাড়িতে ঢুকেই মায়ের হঠাৎ চোখে পড়ল, ডাকবাক্সে লেখা, নরেন্দ্র দেব— 'নাই'। মা এগিয়ে গিয়ে সম্ভবত এই প্রথমবার, নিজের হাতে ছকটি পাল্টে দিলেন, লিখিত হল, 'আছে'। মা বললেন, 'এটা এইরকমই থাকবে।'

মা এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরে আমিও মায়ের শেখানো পথে 'ভাল-বাসা' বাড়ির অভ্যর্থনাপটে নরেন্দ্র দেবের মতো রাধারানি দেবীর পাশেও 'আছে' ছকটি রেখেছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই আবিষ্কার করি, অতিথিরা কেউ যত্ন করে ওটা পাল্টে দিয়েছেন। আমার 'বেখেয়ালের ভুল' শুধরে ওঁদের বোধবুদ্ধি অনুসারে বাবা মা দুজনকেই 'নাই' করে রেখেছেন। আমি এসে

আবার ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনি। ওঁদের 'ভাল-বাসা' বাড়ি কি ওঁদের বাদ দিয়ে ঘরভর্তি থাকতে পারে? এতদিনে, কী আশ্চর্য, আমার চোখে পড়েছে, বাবার তৈরি মেট্রো প্যাটার্নের মস্ত ডাকবাক্সোটা দৃশ্যত কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কত সুশ্রী। কই আর তো কারুর বাড়িতে এমনটি দেখিনি? আবাল্য দেখে এসেছি অন্যমনে, ওর স্বতন্ত্র গড়নটি আলাদা ভাবে নজরই করিনি কোনোদিন।

বাবাকেই কি আগে নজর করেছিলুম আমি? আমার স্ট্যালিন গোঁফওয়ালা গমগমে গলা আর প্রাণখোলা হাসির ছ'ফুট বাবাকে? তাঁকে কি চিনতুম আমি ঠিকঠিক? উনিশে এপ্রিলের আগে? তাঁকেও আমি আজন্ম দেখে এসেছি অন্যমনে। প্রায় না দেখারই মতো করে।

হয়তো অত বড়ো মানুষটিকে অত কাছে থেকে ঠিক সবটা দেখা যায় না। উনিশ এপ্রিলের পরে আমার সেই প্রেক্ষিতটি খুলে গেল, দূর থেকে যেমন একটি অট্টালিকাকে সম্পূর্ণ দেখা যায়, তার ভিতরে দাঁড়িয়েও না, পাশে দাঁড়িয়েও না। দূর থেকে আমি আমার বাবাকে অনেক বেশি করে দেখতে পেলুম। তাঁর কিছুটা জানা, আর অনেকটাই যে আমার অজানা ছিল, টের পেলুম। উনিশে এপ্রিল থেকেই আমার বাবার সঙ্গে আমার প্রকৃত চেনাশুনোর শুরু। এবং বাবাকে পেয়ে হারানোর উপলব্ধিও সেই থেকে।

জানি তিনি রোমান্টিক কবি মানুষ, আর এক কবির প্রেমে পড়ে বিধবা বিবাহ করে, পুরনো বনেদি বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে সংসার পেতেছিলেন। মেঘদূত, ওমরখৈয়াম, হাফিজ অনুবাদ করেছেন। (এটিই সম্ভবত বাংলাতে প্রথম হাফিজের অনুবাদ।) কিন্তু পরে জানলুম বাবা মেঘদূত অনুবাদ করেছেন দুই বয়সে, দুই ভাবে। প্রথমে স্বনামে, প্রবল জনপ্রিয়তায়। তা সত্ত্বেও ১৪টি সংস্করণ ধরে সেখানেও সমানে পাঠের অদলবদল করেছেন। কিছুতেই তৃপ্ত হননি। দ্বিতীয়বার তিন দর্শক পরে, মল্লিনাথ ছদ্মনামে, একেবারে অন্য স্বাদের অনুবাদ উপস্থিত করলেন। এটা জানতে পেরে সেই প্রথম তাঁকে হঠাৎ কিছুটা অচেনা লেগেছিল। কেন? নিজের তুমুল জনপ্রিয় অনুবাদ নিয়ে কি তবে অতৃপ্তি ছিল তাঁর? নিজেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন কি?

বাচ্চাদের গল্প বলতে পারতেন ভালো, আর ভালোবাসতেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে। নরেন্দ্র দেবের শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্যের বহু অনুরাগী আছে এখনও। কিশোরদের জন্য জনপ্রিয় পত্রিকা বের করেছিলেন, 'পাঠশালা' নামে, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর আঁকা মলাটে লেখা থাকত, 'আমাদের এই পাঠশালাতে পড়বে শুধু ছুটির পড়া/পাঠশালার এই আটচালাতে চলবে দেশের মানুষ গড়া' আর ভিতরে থাকত শব্দ সন্ধান, ধাঁধা, আর ছোটোদের সাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' ছবি সহ পাঠশালাতেই বেরিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের 'লালু'ও। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র একসঙ্গে লিখেছেন সেখানে। বড়ো হয়ে বুঝেছি পত্রিকাটির মূল্য। বাবার শতবার্ষিকীর সময়ে বন্ধু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জেনেছি, 'পাঠশালা'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত, বাবার লেখা 'পরাগ ও রেণু' বাংলাতে কিশোরদের জন্য রচিত (টিন এজারদের নিয়ে) প্রথম উপন্যাস। বাবার সম্পাদিত 'কাব্যদীপালি' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সমসাময়িক কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথের নাম দিয়ে বিশ্বভারতী থেকে ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে যেটি বেরিয়েছিল (ত্রুটিপূর্ণ বলে তড়িঘড়ি বাজার থেকে তুলে নেওয়া সত্ত্বেও যেটি 'প্রথম সংকলন' বলে বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে) তার অনেক আগেই এসে গিয়েছিল নরেন্দ্র দেবের করা সংকলনটি। তার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ত্রিশের দশকের গোড়ায় বেরিয়েছিল, তাতে তিনি এক নারীকবিকে যুগ্ম

সম্পাদনায় নিয়েছিলেন, এবং তাঁর নামটিই, রাধারানি দেবী প্রথমে বসিয়েছিলেন। কোনো নারীর সম্পাদনায় সমসাময়িক বাংলা কবিতার সংকলনও সম্ভবত সেই প্রথম।

বাবা কিছু উপন্যাসও লিখেছেন একদা, যা শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাসের নিন্দেমন্দের লক্ষ হয়েছিল। আমি দেখিনি বাবাকে উপন্যাস লিখতে। ছড়া, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, অনুবাদ এইসব সৃষ্টিকর্মগুলি করতে দেখেছি। আর দেখেছি অসীম ধৈর্যে অল্পবয়সীদের নতুন লেখা সংশোধন, সম্পাদনা, আলোচনা করতে।

আমার জন্মের আগে সিনেমা বিষয়ক একটি বইও লিখেছিলেন বাবা, নাম 'সিনেমা'। ১৯৩৪ সালে বেরোয় বইটি। ১৯২৯-৩১ পর্যন্ত লেখাটি 'ছায়ার মায়া' নামে এক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। বই-এর সঙ্গে প্রচুর ছবি ও স্কেচ শেষে সিনেমা সংক্রান্ত বিদেশী শব্দগুলির জন্য একটি পরিভাষার তালিকাও প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। বইটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, ভারতীয় ভাষাতে তো বটেই, সম্ভবত সারা এশিয়াতেই সেটি চলচ্চিত্র বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম বই। এ সব কথা জেনেছি সত্যজিৎ রায়ের কাছে, বাবার মৃত্যুর অনেক পরে। এখন বুঝতে পারি কেন আমাদের বাড়িতে অত বিলিতি ফোটোগ্রাফি, সিনেম্যাটোগ্রাফির পত্রিকা ছিল। বাবা তো কোনোদিন ক্যামেরা স্পর্শ করেননি? কিন্তু বাবা খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন, স্কেচ করতেন। আমাকে খুব ছেলেবেলায় ছবি এঁকে চিঠি লিখেছেন। দেবীপ্রসাদ ঘোষের বই থেকে জেনেছি বাবা খ্যাতনামা ইম্প্রেসারি ও হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় ফিল্ম লাইব্রেরিতে ফিল্ম ক্লাব তৈরি করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ সেটির উদ্বোধক ছিলেন, দুটি ফরাসি ছবি দেখিয়ে ক্লাবের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩১ এ, তিন-চার বছর তার কাজকর্ম চলেছিল। চিদানন্দ দাশগুপ্তের (১৯৪৭) সিনেক্লাব প্রয়াসের পূর্বসূরী ছিলেন তাঁরা। বাবার জীবদ্দশায় এসব খবর শুনিনি।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত ফিচার লিখতেন বাবা। আমাদের বাঁধানো বইগুলিতে অবাক হয়ে পড়েছি, কত যে ব্যাপ্তি তাঁর বিষয় বৈচিত্রের। আধুনিক বিজ্ঞান, সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ইতিহাস, প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ব সাহিত্য কত কিছু নিয়ে কত যে অজানা খবর। উদয়শংকরের বিদেশের কাজকর্মের ওপরে ছবিসহ প্রথম লেখাটি ছিল বাবার। মধ্যযুগের ইউরোপের কিংবদন্তী প্রণয়ীযুগল, আবেলার্দ আর এলোয়িজের কাহিনি এমন এক ফিচারেই আমি প্রথম পড়েছিলুম। কোথা থেকে সংগ্রহ করতেন এত রকমের তথ্য? তখন তো ইন্টারনেট ছিল না? জীবনের এতদিকে উৎসাহ ছিল তাঁর? একা অতগুলো লিখতেন বলে কোনোটাতে নামই দেননি, কোনোটা ছদ্মনামে লিখেছেন। কিন্তু আমার লম্বা চওড়া ভালোমানুষ বাবা বন্ধুস্থানীয় প্রকাশকরা দিব্যি অকুতোভয়ে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেন। মা অনুযোগ করতেন, বাবা লজ্জিত হতেন, কিন্তু বাবা কিছুতেই চাইতে পারতেন না।

নিরিবিলি ছাদের ঘরে সারাদিন কাজ করতেন, তপস্বীর মতো। রাত বারোটায় শুতে আসতেন নীচে। বাবার সকাল হত ভোর চারটের সময়ে। মিছরির জল খেয়ে লিখতে চলে যেতেন তাঁর চারতলার পড়ার ঘরে। ছটার সময়ে নেমে এসে কুকুরকে নিয়ে হাঁটতে বেরুতেন। লেকে চক্কর দিতেন, আর ফাঁকে ফাঁকে হাওয়াখেতে আসা সিনিয়র সিটিজেনদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরে এসে আদা, ছোলা চিরতার জল খেয়ে আবার ওপরে। নটা বাজলেই নেমে এসে ছানা, ফল, লেবুর জল খেয়ে পুনরায় কাজে ফেরত। লিখতেন, কাটতেন, ফেয়ার করতেন, প্রুফ দেখতেন,

অন্যদের প্রেরিত লেখা পড়তেন চিঠির উত্তর দিতেন। আর বইপত্র পড়তেন। প্রচুর চিঠি আসত তাঁর কাছে প্রতিদিন, আর প্রচুর পত্রিকা। কাউকে বিমুখ করতেন না, সবাইকে লেখা দিতেন। বাবা নিজেকে বলতেন দুগ্ধপোষ্য, চা, কফি বা কোহল কোনোটাই পান করতেন না। হেসে বলতেন, 'আমার পূর্বপুরুষরা এত পান করে গেছেন, আমার রক্তে এমনিতেই কোহল পাওয়া যাবে, সেই ভয়েই তো আমি গাড়ি চালাই না!' শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তেল মেখে ঠান্ডা জলে স্নান। আমার দেখা বাবা স্বল্পাহারী ছিলেন, (যদিও গর্ব করে বলতেন অল্প বয়সে সুনীতিবাবুর মতো তিনিও আস্ত পাঁঠা খেয়েছেন) কিন্তু ভোজনের অভ্যাসটি ছিল নিঃশব্দে খারাপ। ভাত খেতে বসে অন্তত সপ্ত ব্যঞ্জন তাঁর চাই, তেতো থেকে মিষ্টি, তা শাকপাতা হলেও ক্ষতি নেই। দুপুরে শেষ পাতে দই, রাতে শেষপাতে ক্ষীর। মা-ও ঠিক চাহিদামাফিক যোগান দিতেন, কুচো কুচো একটুখানি একটুখানি রান্না দিয়ে বাবার থালার পাশে সুন্দর করে মন-রাখা বাটির সারি সাজিয়ে। সে খাদ্য প্রস্তুত হত হিসেব করে, বাবার রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর শোণিতের শর্করা সামাল দিয়েই। সদাশিব বাবাকে কখনো কিছু 'মন্দ হয়েছে' বলতে শুনিনি। অভিযোগ তাঁর স্বভাবে ছিল না, আদেশ করাটাও না। জলতেষ্টা পেলে কারুর কাছে জল চাইতেন না নেমে এসে নিজেই ফ্রিজ থেকে জল নিয়ে পিপাসা নিবারণ করে ওপরে ফিরে যেতেন তিরাশি বছর বয়সেও। শান্ত মানুষ, কাউকে কখনো বকাবকি করতেও দেখিনি। দুপুরে বিশ্রামের অভ্যাস ছিল না বাবার, খেয়ে উঠেই আবার কাজে বসতেন, বিকেল অবধি। বাবার কাছে সারাদিন ধরেই অগুন্তি অতিথি সমাগম হত, তাঁরা দোতলায় বৈঠকখানাতে বসতেন, বাবা প্রত্যেকবার দেখা করতে চারতলা নামতেন। সিঁড়ির বিষয়ে হৃদরোগের দোহাই মান্য করতেন না। সিঁড়িতে বাবার সেই বিদ্যেসাগরী চটির ভারি শব্দের ছন্দ আমি চোখ বুজলে শান্ত পাই। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কোথাও না কোথাও আমন্ত্রণ থাকত বাবার, আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ত। তাই বিকেল হলে সেজেগুজে সভা সমিতিতে যাওয়া। ফুলমালা সহ ফিরে এসে নৈশভোজ সেরে আবার লেখাপড়া, মধ্যরাত পর্যন্ত। বাবা বলতে এইটেই শুধু জানতুম, এই বহিরঙ্গের দুর্ভেদ্য রুটিনটুকু।

এখন অনুশোচনার অন্ত নেই যে, এই নিরলস সাহিত্যশ্রমী, সহজ মানুষটার কবি পরিচয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কৌতূহলী, বিদ্বান, মানুষটির সঙ্গে আমার চেনা হয়নি। হবে কেমন করে, তিনি তো আমাদের মতো 'ডিগ্রিধারী বিদ্বান' ছিলেন না! তাঁর বহুমুখী চেতনার সীমাহীন জিজ্ঞাসা, মননশীলতার কৌতূহল, আর কল্পনার অভিনবত্ব বিষয়ে আমি যেন সচেতনই ছিলুম না। ভিতরের মানুষটার চেহারা যে কেমন, কখনো জানতে চেষ্টা করিনি। অধরা মানুষটিকে আমিও চিনতে চেষ্টা করিনি, তিনি নিজেও চিনিয়ে দেননি। জানি না তাঁরও অন্তরে কোনো অভিমান ছিল কি না? ছোটোবেলাতে বাবার কাঁধে চড়ে বেড়ালেও বড়ো বয়সে ব্যস্ত মানুষ বাবার ততটা কাছাকাছি যাওয়া আমার হয়নি, আমি ছিলুম মায়ের আঁচলধরা। সারমেয়রা থাকতো বাবার দায়িত্বে। তাদের টিকের তারিখ, তাদের প্রাতঃকৃত্য, সাবান মাখিয়ে স্নান, চিরুনি বুরুশ পাউডার, ওষুধপত্তর, সব ভার বাবার। তাদের কথা তিনি সব জানতেন, বুঝতেন, এদিকে আমি যে কোনো ক্লাসে পড়ি, আমার ভুলো মন বাবার তাও খেয়াল থাকতো আমাকে আপাল করিয়ে দিলেন ট্রেনের কিছু সহযাত্রীর সঙ্গে।

আমরা দুজনেই বোধ হয় দুজনের সম্পর্কে খুব কম জানতুম।

কখনো জানিনি, কখনো ভাবিনি, বাবা কী এত লেখাপড়া করেন সারাদিন, সারারাত, এই বয়েসে, একটানা টেবিলে বসে? কিসে কিসে বাবার আগ্রহ? কী পড়েন বাবা? কী লেখেন এত? বাবা যেন আলাদা কেউ। বই কিনতে ভালোবাসতেন, আজও আমাদের বাড়ি ভর্তি বাবার বইতে। ডাকে তাঁর নিত্যি নতুন ইংরিজি বাংলা বই আসতো, সেগুলো যে কী বই, আমি তাও সব সময়ে দেখতুম না। এখন তাঁর বইগুলো নেড়েচেড়ে অবাক হই, এত ব্যাপক, এত আধুনিক, এত বহুমুখী ছিল তাঁর জানার আগ্রহ? এত কৌতূহল ছিল তাঁর জীবন ও মনন বিষয়ে? নানা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও প্রাইমার, নানা বিষয়ের অভিধান, ডিকশনারি অফ ফিলসফি, ডিকশনারি অফ মিথলজি থেকে মেডিক্যাল কিডশনারি পর্যন্ত। আর কত ধরনের যে এনসাইক্লোপিডিয়া, এমনকি দু-সেট দুরকমের চিলড্রেন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, যাতে বিশ্বের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দিয়ে তাঁদের নিজস্ব বিষয়ের ওপরে নিবন্ধগুলি লেখানো হয়েছিল, সেটি বিলেত থেকে এসেছিল একটি পোকা-নিরাপদ লম্বা লোহার বাক্স সমেত, যার ওপরে এমবস করে এনসাইক্লোপিডিয়ার নাম লেখা। বাবার সেই প্রাণপ্রিয় বইগুলি তিনি আদর করে জামাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যারপরনাই আহ্লাদিত হলেও জামাই সেটি এ বাড়িতেই জমা রেখে গিয়েছিলেন, শ্বশুরের প্রাণের ধনটি আর স্থানচ্যুত করেননি। ভাবলে অবাক লাগে, নিজেই বুঝতে পারি না কেমন করে সারা জীবন এত সুদূর ছিলুম এত অসাধারণ একজন বাবার কাছ থেকে। কত কিছু শেখার সুযোগ হেলায় হারিয়েছি। অথচ বাবা হাসিখুশি মিশুক, স্নেহপ্রবণ, ধীর স্থির মানুষ, পরকে আপন করার মন্ত্র জানা ছিল তাঁর, কাউকে দূরে ঠেলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। আমার দুর্দান্ত মামাতো ভাইটি, অভীক, তখন বছর আষ্টেকের, সে একটা রবিনহুডের সবুজ পোশাক আর পালকের টুপি পেয়ে রবিনহুড হল, আর আমার বাবাকে করল তার লিটল জন। বাবা সেই সম্বোধনে মহানন্দে সাড়া দিতেন, খেলাতে অংশ নিতেন, রবিনের তির ধনুক নিজে বানিয়ে দিতেন। কেউই তাঁকে ভয় পেত না, সবাই সম্ভ্রম করতো।

কিন্তু আমি তো কখনো খেলা করতে যাইনি বাবার সঙ্গে?

বাবা চলে গেলেন যেদিনে, যেদিনটা ৫ বৈশাখ, উনিশে এপ্রিল ছিল বটে, কিন্তু বাবার চৈতন্য লোপ পেয়েছিল বিদ্যুতের মতো সহসা, ৩ বৈশাখ। সকালে কুকুরকে নিয়ে লেকে বেড়িয়ে ফিরেছেন। কবি দম্পতিকে নতুন বছরের প্রণাম জানাতে এসেছেন কয়েকজন স্নেহভাজন মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কিছু রঙ্গ রসিকতায় বাবা হা হা করে হেসে উঠেই হঠাৎ চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সেরিব্রাল অ্যাটাক হল। সেই উচ্চকণ্ঠের হাসিই পৃথিবীর সঙ্গে বাবার শেষ আলাপন। বিদায়ী নিঃশ্বাসটি পড়ল উনিশে এপ্রিল।

উনিশে এপ্রিল আমার জীবনে বাবার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় শুরু হওয়ার দিন।

বাবার টেবিলে তাঁর স্বহস্তে একটি নির্দেশপত্র লেখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে আমাদের কী কী করতে হবে। তালিকাটির প্রতি পদেই চিরকালের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ভাঙা এক একটি নতুন চমক। স্কন্ধে চড়ে নয়, গাড়িতে চড়ে শেষযাত্রায় যাব। হরিবোল নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাই। চিতায় নয়, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে, ৪৫ মিনিটে। মুখাগ্নি করবে না, ওতে খুব চাপ সৃষ্টি হয় সন্তানের মনের ওপরে। শ্রাদ্ধ নয়, পিণ্ডদান নয়, শুধু একদিন ধর্ম নিরপেক্ষ স্মরণসভা করবে, সেখানে বাইবেল, উপনিষদ, আর কোরান থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের বাছাই গান হবে।

আর কিছু নয়। ব্রাহ্মণ ভোজন নয়, বাড়ির সামনে সার দিয়ে দরিদ্র নারায়ণ সেবাও খবর্দার নয়। ওই অর্থ মাদার টেরিসার বাচ্চাদের একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে দিয়ে আসবে। ২০০৯-এ এসে এই ভাবনাগুলি শুনতে আর আশ্চর্য লাগছে না, এ তো চালু হয়েই গিয়েছে। কিন্তু ১৯ এপ্রিল ১৯৭১, আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগের সমাজচিত্র আলাদা ছিল, তখনো কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে এর কোনোটারই স্বচ্ছন্দ প্রচলন হয়নি। প্রত্যেকটি ইচ্ছে ছিল বিপ্লবী, নতুন করে ভাবা।

প্রসঙ্গত, মনে রাখতে হবে, মা টেরেসা তখনো নোবেল পুরস্কার পাননি।

উনিশে এপ্রিল আমার বাবার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন। এক অচেনা বাবাকে চেনা শুরু হয়েছে সেই দিনটি থেকেই।

১০ এপ্রিল ২০০৯

যা হারিয়ে যায়

॥ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অগ্নান ॥

গত গ্রীষ্মে আমরা হারিয়েছি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। বাৎসরিক তর্পণকার্য সমাগত। আমার এই নিবন্ধ কিছু স্মৃতি কুড়িয়ে এনে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো মাত্র, তাঁর মতো বিদ্বজ্জনের মূল্যায়নের স্পর্ধা করি না, দীপশিখা ধরে সূর্য প্রদর্শনের মতো। এ লেখা নেহাতই ব্যক্তিগত স্বগতোক্তি, স্মৃতিতর্পণ। এক যুগের পক্ষ থেকে আরেক যুগকে প্রণতি জানানো। সুনীতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু— এঁদের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে, আর ক্রমাগত দরিদ্র করে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

সুনীতিবাবু ছিলেন আমার পিতা স্বর্গত নরেন্দ্র দেবের চেয়ে দু-বছরের ছোটো। ছেলেবেলায় উত্তর কলকাতাতে তাঁরা একই মাঠে ফুটবল খেলতেন, একজন ছিলেন সুকিয়া স্ট্রিটের বাসিন্দা, অন্যজন ঠনঠনে কালীতলায়। বড়োবেলাতেও তাঁরা গৃহ নির্মাণ করলেন একই পাড়ায় এক রাস্তায়। সুধর্মা থেকে 'ভালোবাসা' এক মিনিটের হাঁটাপথ। যার ফলে কাকাবাবুর ছোটো মেয়ে দুটির সঙ্গে এক মাঠে খেলা করেছি আমিও। বাবামায়ের সাহিত্য স্বজনের সংসারে আজ এই দেখছি আত্মার সম্পর্কেই আত্মীয়তা। তাই সুনীতিবাবু আর তাঁর স্ত্রী আমার কাকাবাবু-কাকিমাই ছিলেন। ছেলেবেলায় ওঁদের বাড়ির প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্মে আমার মা-র একটি জরুরি ভূমিকা থাকত, আমাদের বাড়িতেও তেমনি কাকিমার। একবার আমরা রাজগির বেড়াতে গিয়েছি, তখন আমি আট-ন বছরের, কাকাবাবু-কাকিমাও গিয়েছেন। একদিন দুপুরে কাকাবাবু-কাকিমা আমাদের বাড়িতে এসেছেন, নেমন্তন্ন খেতে আর আমি তাঁদের সামনে বসে বসে মনের সুখে আরেকরকম নেমন্তন্ন খাচ্ছি। অর্থাৎ দাঁতে নখ কাটছি।

—নখ খাসনি, খবরদার নখ খাসনি অসুখ করবে। কাকিমা বারণ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে নিই। একটু পরে আবার ভুলে ভুলে মুখে আঙুল। এবং তৎক্ষণাৎ— ফের? বারণ করলুম না? হাত নামা বলছি— কাকিমার বকুনি। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। অতএব পাঁচ মিনিট বিরতির পরেই আবার আমি যথাপূর্বম। এবার কাকিমা মা হয়ে গেলেন— ফের অসভ্যতা, বলতে বলতেই ঠাস করে একটি থাবড়া আমার গালে। ভাত খেতে খেতেই। বাঁ-হাতে। আচমকা অভিমানে আমি কেঁদে ফেলি কিন্তু এই নিদারুণ দুঃসময়ে মা, বাবা এমনকী কাকাবাবু কেউই আমার পক্ষ নিতে এগিয়ে এলেন না। বরং যেন ধন্য হয়ে গিয়ে চমৎকার সমবেত সংগীত গেয়ে উঠলেন— এইবারে ঠিক হয়েছে। আমি ছুটে বাগানে পালিয়ে গিয়ে খুব কেঁদেছিলুম— হে ভগবান কেন আমার নখ খাওয়ার বদ অভ্যেসটা সারিয়ে দিচ্ছ না? কিন্তু ভগবান অদ্যাপি ওটি সারাননি। আমার আঙুল আজ এমনি অবিকল কুষ্ঠরোগীর মতো হত না যদি কাকিমার কাছাকাছি থাকতুম। বড়ো হয়ে তখন আমি বিদেশে— একদিন মা-র চিঠিতে হঠাৎ খবর পেলুম, কাকিমা

আর নেই। যে-কাকিমা বজ্রবিদ্যুৎকে অত ভয় পেতেন— সেই কাকিমা এখন বজ্রবিদ্যুতেরই দেশে। কাকিমার সেই থাবড়াটার জন্য সেদিন খুব মন কেমন করছিল।

এখন তো স্বয়ং মা হয়েছি, বন্ধুবান্ধবদেরও সন্তান হয়েছে। কিন্তু এমন জোরালো বন্ধন কি আমাদের যুগে আর বজায় আছে? ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অবাধ্য বাচ্চাটা যদি কথা না শুনে অসভ্যতা করে, আমরা কি মাতৃস্থানীয়ের অধিকার বলে তাকে থাবড়া মারতে সাহস করব? তাতে বন্ধুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই নব্বই ভাগ। এই যে, বন্ধুকন্যাকে নিজের সন্তানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে সোহাগ এবং শাসন করবার আন্তরিক শক্তি, এই অমূল্য সংযোগ এখন আর গড়েই ওঠে না। বন্ধু তো দূরস্থান, জ্যাঠা খুড়োই কি আর থাবড়া বসাতে সাহস করেন আপনাপন অষ্টমবর্ষীয়া ভাইঝির মহার্ঘ গণ্ডদেশে? এমনকী বাপ-মারও যেন আর সেই আত্মবিশ্বাস নেই যে ভুল বোঝাবুঝি হবে না। যা করছি, ভালোর জন্যেই করছি, এ নিয়ে কেউই সন্দেহ করবে না, এ নিশ্চয়তা কখন যেন আমাদের রক্তের ভেতর থেকে উবে গেছে। সব বাঁধনগুলোই আলগা হয়ে যাচ্ছে। পিতামাতা যত বৃদ্ধ হন, সন্তানের ওপরে ততই তাঁদের স্নেহের অধিকারের জোর কমে যেতে থাকে। আর বাবামায়ের মৃত্যুর পরে সহোদর-সহোদরাও আবাল্যের প্রতিবেশী মাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়। এইসব দেখতে দেখতে এখন কাকিমার হাতের সেই থাবড়াটার জন্যে হৃদয় প্রাণ তৃষিত হয়ে ওঠে।

কাকাবাবুর কাছে আমি একদিকে যেমন সন্তান, আরেকদিকে তেমনি শিষ্যও ছিলুম। বাবার মৃত্যুর পরে কাকাবাবু পিতৃব্যের যোগ্য কর্তব্য করেছেন, আগাগোড়াই আমার পাশে থেকে দাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কৃত্য বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ জুগিয়ে এবং সহযোগিতা করে। আমার বাবার চতুর্থী শ্রাদ্ধক্রিয়াতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কাকাবাবু। পরম সেই সৌভাগ্য, সে-কৃতার্থতা আর মন থেকে কোনোদিনই মুছবে না। এবং সেই উপলক্ষে তাঁর যুক্তিবাদী পণ্ডিত মননের এক আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছিলুম।

কাকাবাবু কাজ শুরুই করলেন আমাকে যে মন্ত্র পাঠ করিয়ে, তা উচ্চারণ করতে আমারই সংস্কারে বাধল। আমি একেই অব্রাহ্মণ, তায় নারী— কিন্তু এ যে... গায়ত্রী। কাকাবাবু! এক ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, তুমি লেখাপড়া শিখেও এমন মুখ্খর মতন কথাটা বললে? যে-মানুষ বেদ উপনিষদ পড়েছে, মন্ত্রের মানে যে বোঝে, যার জীবনধর্ম হচ্ছে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা— তাকে গায়ত্রী পড়াব না, পড়াতে হবে কোনো নিরক্ষর ভূতকে, যে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছে? এর পরে আর প্রশ্ন চলেনি। এই উত্তরের বিভায় অশীতিপর সুনীতিবাবুর নির্মোকহীন, যুক্তিযুদ্ধ অন্তরলোকটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত প্রত্যেকের সামনে। ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু এতে সুনীতিবাবুর মনের যেদিকটি চেনা যায়, তাচ্ছিল্যের নয়। যৌবনে যিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁর এই সংস্কারমুক্তি, এ কেবল তাঁর দূরপ্রসারী জীবনবোধেরই ফলিত প্রমাণ। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর জ্ঞান তাঁকে জীবন থেকে বিচ্যুত, খণ্ডিত করেনি, বরং সংযুক্ত, ঘনিষ্ঠ করেছিল।

কাকাবাবুর সংস্কারমুক্ত মনের আরেকটি পরিচয় পেয়েছিলুম ১৯৭৫-এ, আমার মা শ্রীমতী রাধারানি দেবী যখন শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালা দেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে। সেই বক্তৃতা যখন কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন

শরৎচন্দ্রের ভার্যা বিবাহিত ছিলেন কি না এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাধারানি দেবী নিঃসংকোচে জানান যে, তাঁদের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী তিনি যদিও নিঃসন্দেহে ধর্মপত্নীই ছিলেন কিন্তু তথাকথিত বিবাহ হয়নি। অর্থাৎ কমন-ল-ওয়াইফ বলতে ইউরোপে যে-সংজ্ঞাটি বহু প্রচলিত এও তেমনিই। শরৎচন্দ্রকে যাঁরা বলেন ভীরু এবং সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু— তাঁদের প্রতি এই তথ্য এক চ্যালেঞ্জ। এতে প্রমাণ হয় যে নিজের জীবনে তিনি সংস্কারান্ধ ছিলেন না। মন্ত্র না পড়েও তিনি বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে।

কিন্তু হল উলটো। এই বিষয়টি নিয়ে এক শরৎ বিশেষজ্ঞ তুমুল বিরুদ্ধতার লবি গড়তে আরম্ভ করে দিলেন। এতে নাকি শরৎচন্দ্রের সম্মানহানি হয়েছে! সেই সময়ে সুনীতিবাবু মাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, যে, প্রতিবেশী হিসেবে তিনিও চিরকাল এই খবরই সত্য বলে জানতেন, যে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর হিন্দুবিবাহ হয়নি। এবং মা-র যে সেকথা লেখবার সৎ সাহস আছে এজন্য মাকে অভিনন্দিত করেন। সেই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন নিজের মন্তব্য সুনীতিবাবু একটি চিঠির মারফত জানান এবং ডা. সুকুমার সেনের অভিমতও নিজে থেকেই আমন্ত্রণ করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতটিও তিনি জেনে নিতে বলেন। ওঁরা তিনজনেই মায়ের অভিমতের অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। সেই চিঠিগুলি বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছিল সুনীতিবাবুর পরামর্শে।

এই ঘটনাটিতে তিনজন জীবন-অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষের খোলা, সত্যসন্ধ, তরুণ মনের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, তার হোতা ছিলেন কাকাবাবুই।

কাকাবাবুর সঙ্গে আমার নতুন করে নিয়মিত যোগাযোগ ঘটল। ১৯৭০ থেকে, যাদবপুরে কাজ নেবার পরে। মাঝে দীর্ঘ বারো বছর, পাক্কা একযুগ অজ্ঞাতবাসে কেটেছে, গার্হস্থ্যে, বিদেশবিভুঁইয়ে। তার মধ্যেও অবশ্য যোগাযোগ থেকেছে। সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার গুরুশিষ্য সম্পর্কটি নিতান্ত নিজেরই পাতানো, যদিও তাঁর শিষ্যত্বের যথার্থ যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই এখনও অর্জন করা হয়নি।

বাল্মীকিরামায়ণ চর্চা এবং তুলনামূলক সাহিত্য— এই দুটি বিন্দুতে ঘটেছিল কাকাবাবুর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ। থিম ও ফর্মুলা বিশ্লেষণ করে, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী ধরাবাঁধা শব্দচয়নের কায়দা এবং কাব্যের সামগ্রিক গাঠনিক তাৎপর্য বিচার করে বাল্মীকি রামায়ণকে 'কাব্য' হিসেবে না দেখে মৌখিক মহাকাব্য হিসেবে তার মূল্য নির্ধারণের একটি প্রয়াস আমি বিগত তেরো-চৌদ্দ বছর ধরেই করছি। মাঝে মাঝে আমি কলকাতায় এলে বা কাকাবাবু দিল্লিতে গেলে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হত। এ বিষয়ে আমার যখন যে লেখা বেরিয়েছে তাঁকে অফপ্রিন্ট দিয়েছি, কাকাবাবু মহাউৎসাহে পড়েছেন, মতামত বলেছেন।

রামচন্দ্র বিষয়ে কাকাবাবুর অবতারবাদ বিরোধী অভিমতে আমারও সর্বান্তঃকরণের সমর্থন ছিল কেবলমাত্র একটি প্রসঙ্গে ছাড়া। ওই বিষয়টি নিয়ে নানা বই পড়ে নিজে নিজে ভেবে বিদেশের পণ্ডিত এবং এখানে ফাদার আঁতোয়ানের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে, আমার মনে হয়েছে ইলিয়াডের সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোর যে সাদৃশ্য সেটির কারণ 'গ্রিক প্রভাব' নয়, তৎকালীন বিশ্বের মানবসমাজের সাধারণ যুগধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমমর্মিতা। ইলিয়াড ও রামায়ণ ছাড়াও আরও বহু 'হিরোয়িক এপিক'-এ জগৎ জুড়ে ওই একই ধাঁচের ঘটনার কাঠামো

পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চৌদ্দটি এপিকের কাঠামো বিশ্লেষণ করে লেখা আমার প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে আমাকে রামায়ণের ওপর কাজটি সমাপ্ত করতে কাকাবাবু খুব তাড়া দিতেন, উৎসাহ দিতেন। আমার একদিকের ব্যস্ততা অন্যদিকের আলস্যে এবং সর্বধ্বংসী দীর্ঘসূত্রতায় সেই কাজ এখনও অসম্পূর্ণ, এরই মধ্যে কাকাবাবু হঠাৎ চলে গেলেন।

'তুলনামূলক সাহিত্য' এই বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরেই যে দুজন সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন এদেশে, তাঁরা হলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কবি বুদ্ধদেব বসু। কবির চেয়ে পণ্ডিতের উৎসাহ এই বিষয়ে কম ছিল না। যদিও ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যধারা আনায় ভগীরথ ছিলেন বুদ্ধদেব বসুই, ভারতবর্ষে ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন-আপ্যায়ন হোক, এ কিন্তু সুনীতিবাবুর আন্তরিক অভিরুচি ছিল। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল দূর প্রসারিত। ভাষাচার্য তো কেবল নীরস বৈয়াকরণই ছিলেন না। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, নাটক— নানা ভিন্ন শাখায় বয়ে গিয়েছিল তাঁর রুচি এবং জ্ঞান। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য' বইটির বেশি বয়স হয়নি, কিন্তু 'বৈদেশিকী' নামে ছোটো বাংলা বইটির বিষয়বস্তু তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যই— এবং সেটি যখন প্রকাশিত হয় তখনও ভারতবর্ষে পেশাদারি তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা শুরু হয়নি। এখন মিথ নিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডা. সুকুমার সেন যে ধরনের মূল্যবান গবেষণা করছেন, তাকেও আমি বিশুদ্ধ তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা বলি। ডা. সুকুমার সেনের মতো ছাত্র যিনি রেখে গিয়েছেন, সে-রকম মাস্টারমশাই কি এদেশে আর পাব আমরা? যেভাবে পড়ানো হয়, যেভাবে পড়া হয়, যেভাবে পরীক্ষা দেওয়া হয়, যেভাবে খাতা দেখা হয়, যেভাবে নম্বর বাড়ানো হয়— সব কিছু দেখেই মনে হয় শিক্ষাক্ষেত্রে 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' সমাগত।

কাছেই থাকি, তাই যখন-তখন ছুটে ছুটে কাকাবাবুর কাছে চলে যেতুম যখনই কোথাও ঠেকে যেত, বেধে যেত। তাঁর মহামূল্য লাইব্রেরিটিকে অবাধ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি আমায়। কোনো প্রবন্ধ লিখছি, অমনি বইপত্র ঘাঁটতে ছুটেছি; কিছু অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো ঠেকে গেছি কোনো আঘাটায়— অমনি অভিধান কিংবা উপদেশ খুঁজতে ছুটেছি। আর বইপত্রই শুধু নয়, কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলে চিন্তাটাকে খেলিয়ে নিতেও ছুটেছি বার বার। প্রত্যেক সময়েই কিছু-না-কিছু জরুরি উদ্ভাস নিয়ে, ধনী হয়ে, ধন্য হয়ে ফিরেছি। এখন কেবলই আফশোস হয়— কেন আরও যাইনি, কেন যে রোজ যাইনি, কেন এত ভুল করলুম?

শুধুই কি বাল্মীকি রামায়ণ? তা কেন, ওঁর কাছে পাওয়া যেত সব কিছু। তুলসীদাসের রামচরিত মানসের চারশো বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে এস. ও. এ. এস-এ কাকাবাবুর কাছে পাঠ নিতে ছুটলুম সেমিনারে যাবার আগে। ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যাজ ওয়ান লিটারেচার নিয়ে বলতে হবে বিদেশে— আগে দৌড়োও কাকাবাবুর কাছে। দাক্ষিণাত্যে লিটারেচার অফ দি ইস্টার্ন রিজিয়ন বিষয়ে বক্তৃতা দেব, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে কথা না বললে কি হয়? যাই লিখব, যাই বলব তাঁর সঙ্গে কথা বলে না নিলে যেন স্বস্তি নেই। তিনিও গেলে খুব খুশি হতেন, প্রাণ ঢেলে সাহস জুগিয়েছেন মনে নানাভাবে বল দিয়েছেন। যেমন সার্থকতার শুভক্ষণ, তেমনি আমার দুঃখের মুহূর্তে, পরাজয়ের মুহূর্তে, কাকাবাবুর আশীর্বাদী হাত পিতৃস্নেহে মাথায় পেয়েছি।

গত বছর ২৭ মে কাকাবাবু চলে যাবার একদিন আগেই তাঁর কাছে সকাল বেলায়

গিয়েছিলুম। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ইংরিজি কাব্যে অনুবাদ করেছেন মার্কিনী এক অধ্যাপিকা, বইটিতে নানা জায়গায় কাকাবাবুর উল্লেখ রয়েছে। সেই বইটি ওঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম যদিও তখন কাকাবাবুর চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে, দুই চোখই পট্টি বাঁধা। জানি, বইটা দেখতে পাবেন না। তবু খুশি হবেন, এই ভেবে নিয়ে যাওয়া। খুশি হলেনও। এক জায়গায় ভুল করে ওঁর নাম ছাপা হয়েছে এস. এন. চ্যাটার্জী। শুনে কাকাবাবু সুন্দর, অমলিন হাসলেন, মজা পেলেন। একটুও বিচলিত হলেন না। তাতে কী হয়েছে, অন্যত্র তো পুরো নামটা ঠিক চেহারাতেই আছে? যারা জানবার, ঠিকই জানবে।

আলোচনা শুরু হয়ে গেল জয়দেব নিয়ে। একটি সমালোচনায় আমি বললাম ঠাকুরের সেই 'ওতে গীত আছে কিন্তু গোবিন্দ নেই' উক্তিটি উল্লেখ করেছি। শুনে কাকাবাবু খুব খুশি। ওঁরও সেটাই মত— বললেন, 'ওটা আসলে স্ট্রেট পর্নোগ্রাফি, ভক্তি লিটারেচারের ছদ্মবেশে শুদ্ধ ইরটিক লিটারেচার ছাড়া কিছু নয়— এ বিষয়ে সুশীল দে-র মতটাই ঠিক।

এবং জয়দেবের মিউজিক্যাল কোয়ালিটি ছাড়া অন্য কোনো কাব্যগুণও নেই ভাবগাম্ভীর্য নেই, কোনো আত্মিক উত্তরণ ঘটান না তিনি'— এইসব বলতে বলতে কাকাবাবু ছন্দের প্রসঙ্গে চলে এলেন বাংলা লোকভাষার ছন্দ কীভাবে জয়দেব সংস্কৃতে ব্যবহার করেছেন— সেইটে আমাকে বোঝাতে গিয়ে আবৃত্তি শুরু করলেন— 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—' তার পরেই হঠাৎ থেমে পড়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। ওদিকে দুটি চোখ বাঁধা— কোনো ভাবান্তর তো ধরবার উপায় নেই— আমি অবাক। হঠাৎ থামলেন যে? তবে কি মনে পড়ছে না? তাই কখনো হতে পারে? কাকাবাবুর স্মৃতিতে জয়দেব আটকে যাচ্ছে, এও কি সম্ভব? আমিই কি তবে ধরিয়ে দেব? কিন্তু আমার তো কাকাবাবুর ঠিক বিপরীত ক্ষমতাটাই আছে— অসামান্য বিস্মৃতিশক্তি। তবু, জয়দেব এমনই যে পঙ্‌ক্তিটা মনে পড়ল। এবং মনে পড়বামাত্র পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল— কাকাবাবু কেন হঠাৎ থেমে গিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন। ভোলেননি, বরং উলটোই— ঠিকই মনে পড়েছে, কিন্তু কন্যার সামনে উচ্চার্য নয় বলেই উচ্চারণ করেননি। অথচ এই কাকাবাবুরই কিন্তু মুখে খারাপ কথা আটকাত না। একবার ১৯৬৪-তে দিল্লিতে (ইন্টারন্যাশনাল ওরিয়েন্টালিস্টস কংগ্রেসে) কাকাবাবুকে একঘর লোকের সামনে যা বলতে শুনেছিলুম। তখন সদ্য আফ্রিকা ঘুরে এসেছেন তিনি। 'জেনোসাইড ইন আফ্রিকা' বলে একটি লেখাও বেরিয়েছে তখন তাঁর। এক বাঙালি অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন— 'আফ্রিকাতে গিয়ে স্যার আপনি কেমন ছিলেন?' '—কেন চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না? আদরযত্নে আমার মুখখানি কেমন রাঙা টুকটুকে হয়েছে দেখছ না, ঠিক বাঁদরের পশ্চাদ্দেশের মতন?' চটপট উত্তর দিলেন সরল ভাষায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। নিজের মুখের জন্য ঈদৃশ অলৌকিক উপমা আর জগতে দ্বিতীয় কেউ খুঁজে পেতেন কি না সন্দেহ। কালিদাস তো নিশ্চয়ই না।

সেই দুর্ধর্ষ কাকাবাবুকেও হার মানিয়ে ছাড়লেন কবি জয়দেব। অমন ডনবৈঠক করা জিহ্বাগ্রেও তিনি তাঁর শ্মশ্রুবীকারিণী নার্স, কন্যাসমা আমি, এক পুত্রবধূ ছায়াবউদির সামনে উচ্চারণ করতে পারলেন না পরের সর্ববিদিত পঙ্‌ক্তিটি— পীন পয়োধর পরিসর মর্দন কম্পিত করযুগশালী। না, পিতাপুত্রীতে, শ্বশুর বধূতে একত্রে বসে উচ্চারণ করবার মতো ভগবত পূজার মন্ত্র জয়দেবের

পুণ্য কলমে উৎসারিত হয়নি। কাকাবাবুর সেই অপ্রতিভ নৈঃশব্দ্য কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের। তক্ষুনি তিনি অন্য উদাহরণ আনালেন, অন্য পঙ্‌ক্তি 'রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নম'— ইত্যাদি। তারপরে হঠাৎ রাগ করে বললেন, নাঃ। না তুমি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সমতুল্য হতে পেরেছ ভক্তির সারল্যে, না হয়েছ কালিদাসের সমকক্ষ কাব্যগুণে, যতই ছন্দকুশলী ধ্বনিক কুশলী হও না কেন, তুমি একটি ফোর্থরেট কবি। দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে দেহাতীতে পৌঁছোনো তোমার সাধ্যে কুলোয়নি কালিদাস সেইটে পেরেছিলেন। বলেই কুমারসম্ভব থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন। আমি শুনতে শুনতে মুগ্ধ মোহিত হতে হতে বললুম, ইস। আমরাও তো পড়াচ্ছি? আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কী দুর্ভাগ্য— আমাদের মতো হতভাগা মাস্টার পেয়েছে। আমাদের মতো অসীম গুরুভাগ্য নিয়ে আসেনি এরা। আমরা তো কিছুই জানি না। কাকাবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, আমিও কিছুই জানি না। কীই-বা জেনেছি? কতটুকু জেনেছি? আর যেটুকু জেনেছি সেটা জেনেই-বা কার কী লাভ হয়েছে জগতে? এত পড়াশুনো করে কীই-বা হয়? এসব পড়াশুনোর আর আমি কোনো মূল্যই পাইনে। আমি আজকাল খুব ডিসইলিউশনড হয়ে গেছি এসব ব্যাপারে। এবং ঈশ্বর, পরলোক— সব ব্যাপার নিয়েই আমার মনে এখন অশেষ প্রশ্ন জেগেছে— আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই! মনে মনে বললে আমাদের কী হবে? আমরা যে এখন এইসব নিয়েই চেষ্টা করছি একটা পরিপূর্ণ জীবন গঠন করতে? এতদিন আপনাদের মতো মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি বলেই তো এই সাহস।— মনে হয়েছে এই পূর্ণতার কণামাত্র পেলেও ধন্য হয়ে যাব— বাঁচা সার্থক আমরা পা রাখব কোন আশার ভিতপাথরে? কিন্তু মুখে এসব কথা কিছুই বলা হয় না। মুখে বলি— কিন্তু কাকাবাবু, এসব কক্ষনো আপনার মনের কথা নয়— এ নিশ্চয় অভিমানের কথা। কেন অভিমান, কার ওপরে অভিমান, এসব উহ্য প্রশ্নে না গিয়ে কাকাবাবু বলেন,

—দুর। এসব মান-অভিমানের ব্যাপারই নয়, রিয়্যালাইজেশনের ব্যাপার। বেশিদিন বাঁচলেই বোঝা যায় এই পৃথিবীটা বড়ো ওঁচা জায়গা। বুঝলে? এখানে জাস্টিসের চেয়ে ধরাধরির জোর বেশি, সত্যের চেয়ে দলাদলির জোর বেশি, যে বেশ ধরে হাতদুটো চেপে ধরতে জানে, কিংবা খুব টাকা ছড়াতে জানে, সে যা চাইবে তাই পাবে। যারা সত্য নিয়ে ধর্ম নিয়ে সুবিচারের আশায় বসে থাকবে, তারা আঙুল চুষবে। আমি এবারে বলেই ফেলি— তাহলে আমাদের কী হবে, কাকাবাবু? যদি মনে করেন পড়াশুনোরও মূল্য নেই, সত্য বিশ্বাসেরও মূল্য নেই, তবে আমরা কীসের ওপরে দাঁড়াই? বহির্জীবন যাদের ঠকিয়েছে, অন্তর্জীবন তো তাদের কিছু এনে দেবে? চোখ বাঁধা কাকাবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম স্নেহবিগলিত হয়ে পড়ে।— না না, তোমরা পড়বে না কেন, তোমরা পড়বে বই কী। তোমরা পড়াশুনো করে যাও। আমার কথা শুনে শুনে তোমাদের যুগ তো ডিসিশন নেবে না নিজেরা নিজেরা যে যেখানে পৌঁছোবে। আমিই কি বাপখুড়োদের মূল্যবোধ মতে চলেছি? এ সবই যুগের সঙ্গে পালটে পালটে যাবে। বুড়ো হয়েছি, এখন আমার মায়া-মোহ সব ঘুচে যাচ্ছে। বুড়ো হলে এমনই হয়। মনে নেই যে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন— 'মর্তে যেন না মুছে যায় মিথ্যে মায়াগুলি'— তিনিই মৃত্যুর আগে শেষ কবিতায় বললেন, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী'। সেই মিথ্যে মায়াগুলি আর এই ছলনাজাল কি এক জিনিস? মোটেই নয়। কত তিক্ততা এখানে।

আমারও তেমনি এখন মনে হয় আমার বিদ্যার্জন এবং বিদ্যা বিতরণে জগতের কোনোই উপকার হয়নি। ভক্তি ব্যাপারটাও আমার ঠিক আসে না। কোথাও যেন কোনো অর্থ খুঁজে পাইনে। এককালে ছিলুম হিন্দু ব্রাহ্মণ এখন আমি অ্যাগনস্টিক। অর্থাৎ অজ্ঞ, আমি জানি না। মনে হয় বিশ্বাসটা থাকলেই ভালো হত কিন্তু ওটা হারিয়ে ফেলেছি। এমনভাবে বললেন যেন হাত ফসকে বলটা অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। একটা কিছু বিশ্বাস থাকলেই ভালো হত— বললেন তোমার তো বিশ্বাস আছে, তুমি তা ছাড়বে কেন? এখন তোমাদের গড়ে ওঠবার সময়।

এই সময়ে নার্স এসে তাঁকে ভাত খেতে ডাকল। অনেকক্ষণ এসেছি। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় কাকাবাবুর কাছে এলে।

উঠে আসি, কিন্তু মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল আমার। আজকাল প্রায়ই কাকাবাবু এইরকম হতাশার কথা বলেন। অথচ ওঁর মতো পরিপূর্ণতা ক-জন মানুষ জীবনে পায়? এখনও দেহে মনে অফুরন্ত প্রাণশক্তি চিন্তায়, হৃদয়ে অফুরান উষ্ণতা। কোথায় ওঁর এই শূন্যতাবোধের উৎস? জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ দুটোতেই উনি সাফল্য অর্জন করেছেন, নাই থাকল ভক্তি। তবে কেন এই ব্যর্থতাবোধ? কোথা থেকে এসেছে এই আঘাত? পুত্রকন্যার অসীম ভালোবাসা, ছাত্রছাত্রী দেশবাসীর অসীম শ্রদ্ধা উনি আজও পেয়ে চলেছেন— তবে?

মন খারাপ করে ফিরে আসি। আমি এখনও জীবন-অনভিজ্ঞ, তাই হয়তো আজও আমার ঈশ্বরের মঙ্গল মূর্তিতে বিশ্বাস আছে, গুরুজনের স্নেহাশীর্বাদে নির্ভরতা আছে। শিল্পের শাশ্বত সত্যে শ্রদ্ধা আছে। এই ব্যর্থতা বোধই কি বার্ধক্য? সেই শেষ দেখা।

পরদিন সন্ধ্যায় রেডিয়ো খুলেই মা পাষাণ হয়ে গেলেন— আমি ছুটলুম সুধর্মাতে। কিন্তু কাকাবাবু আর বাড়িতে ছিলেন না।

নববর্ষ ১৩৮৫

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন

সেদিন এক বন্ধুস্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম, ঠাট্টা করে তিনি বললেন, 'আপনারা সবাই তো বৌদ্ধ।' এটা বেশ প্রাচীন বাঙালি রসিকতা, ওই 'বৌদ্ধ' আর 'বৈষ্ণব'। (এখন তো পঞ্চাশের দশকে নতুন দল যোগ হয়েছে, শক্তি!) আমার কথাটা শুনে ভালো লাগল না, বোধ হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বাধল, 'বললাম আমরা বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র। তাঁর শিষ্য নই। ছাত্র মানেই শিষ্য নয়। (শিষ্য গুরুকে সমালোচনা করে না। ছাত্র শিক্ষককে সমালোচনা করতেই পারে। এমন একটা ধারণা আমার মনে মনে ছিল।) তিনি কথাটা চ্যালেঞ্জ করলেন না। আমিও ব্যাখ্যা দিলুম না। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। শিক্ষক তো গুরুই। ধর্মগুরুই একমাত্র গুরু নন। জ্ঞানের প্রশ্নে তর্ক চলেই, ধর্মের প্রশ্নে যদিও-বা না চলে। ছাত্র তো শিষ্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এবং মনেপ্রাণে শিল্পী বুদ্ধদেব বসুর কাছেই সাহিত্য ধর্ম ও শিল্পীর ধর্ম বিষয়ে সত্যিই তো আমরা সেই কচি বয়সে দীক্ষিত হয়েছি। তিনি মনের মধ্যে কতগুলো বদ্ধমূল বিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছেন, যেগুলো তাঁর নিজের জীবনের, জ্ঞানের, বিদ্যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। বিনা কষ্টে বিনা যন্ত্রণায় আমরা কেবল তাঁর অর্জনের সুফলটা ভোগ করেছি, তিনি যা সারাজীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করেছিলেন, নির্ভাবনায় আমাদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিয়েছেন। আমরা সহজ ভাবেই সেগুলো জেনে ও মেনে নিয়েছি। নিজেদের ভেবে ভেবে, অনুভব করে করে আবিষ্কার করতে হয়নি সেইসব শিল্প ও শিল্পীর সত্য। বু. ব. কে শ্রদ্ধা করতুম, তাঁর বাক্যকে অবহেলা করবার কারণ দেখিনি। সাহিত্যচিন্তাই যাঁর প্রাণবায়ু, শিল্পীর পরিচয়ই যাঁর একমাত্র পরিচয় এবং শিল্পই যাঁর ঈশ্বর সেই মানুষটিকে এত কাছে পেয়েছি, এতগুলি বছর ধরে তার সুফল আমি পেয়েছি বই কী। তাঁরই প্রশ্রয়ে গড়ে উঠেছে আমার সাহিত্যরুচি। আমার শিল্পভালোবাসা, আমার জীবনজিজ্ঞাসা। তাঁর সঙ্গে আমার জীবনভাবনা একেবারেই মেলে না। অথচ শিল্পভাবনা বেশ কিছুটা মিলত, কেননা তাঁরটাই আমি আমারও নিজস্ব বলে মেনে নিয়েছি। ঝামেলা এড়িয়েছি। কিন্তু তাই কি? সত্যিই কি আমার জীবনভাবনা অন্য? আর ঝামেলা কি কোনোকালে এড়ানো যায়, না গেছে?

বুদ্ধদেব বসুর শিক্ষাভাবনার মূলমন্ত্রটুকু নিজের মতো করে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সব অভিমত মানিনি— নানা বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছি। বু.ব.-র কাছে শিখেছিলাম, শিল্পই জীবন, শিল্পই ধর্ম, শিল্পই ঈশ্বর এবং শিল্পই ভালোবাসা। শিখেছি, কিন্তু শিখিনি। আমার জীবনেও তো তাহলে শিল্পর সেই ঠাঁইই থাকা উচিত ছিল যা ছিল বু.ব.-র জীবনে। কিন্তু তা কি হয়েছে? শিল্পর জন্যই কি জীবনধারণ করি আমি? শিল্পই কি আমার নিদ্রাজাগরণের অদ্বিতীয় ধ্যান; আমার প্রথমতম প্রেম? শিল্প কি আমার ঈশ্বর হয়ে উঠতে পেরেছে? পারেনি। আমিই পারিনি।

বহির্জগৎ বু.ব.-কে ধরতে ছুঁতে পায়নি। সাংসারিকতার যে পাশবিক থাবাটা আমাদের টুঁটি

টিপে রেখেছে, বু.ব.-র ছায়াও স্পর্শ করতে পারেনি সেই রক্তকর্দমপঙ্কিল নখাগ্র। কেননা তাঁর পাশে পাশে অমোঘ একজন রক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বলেই বু.ব.-র পক্ষে অমন দুর্দান্ত শিল্পপ্রেমে বুঁদ হয়ে থাকা সম্ভব হয়েছিল জীবনভোর। একটি উষ্ণ মানুষী প্রেমই তা সম্ভবপর করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের তো 'রাণু' নেই? নেই বলেই আমাদের কথায় কথায় পাকড়ে ফেলে ধুলো, ধোঁয়া, নর্দমার কাদামাটি। কে বাঁচাবে? নিজের বুকটা পেতে দিয়ে? কে আগলে রাখবে আমাদের? শুধুই 'বৌদ্ধ'? নাকি 'রাণব'ও আমরা কিছুটা? গুরুপত্নীর স্নেহের আশ্রয়ে মননের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়েও যে অনেক নতুন পাতা গজিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর কথা অনেকে বলবেন। আমি একটু বরং বলি আমাদের প্রতিভাময়ী গুরুপত্নীর কথা। গুরুগৃহের সুমঙ্গলা গৃহিণী যিনি। তাঁরই কল্যাণে দু-শো দুই এত আনন্দ-উজ্জ্বল থাকত, তাঁর স্বভাবগুণে দু-শো দুই ঠিকানায় ছিল চিরযৌবনের রাজত্ব। ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের যৎসামান্য পরশ পেতে সাধে কি আর উন্মুখ হত তরুণ কবিদের চিত্ত?

দু-শো দুই রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে উপচে পড়ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘর। ক্লাসের পড়াগুলো ক্লাসের চিন্তাভাবনার জের সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত্রি পর্যন্ত চলত গুরুগৃহে। গুরুপত্নীটি পাকনৈপুণ্যে দ্রৌপদী আর স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র। নিজের বাড়িতে যে আহ্লাদি আচরণ কদাচ চলবে না, মাসিমা প্রতিভা বসুর আদুরে প্রশ্রয়ে তাও চলত। ফলে নিজের বাড়িতে সময় কাটানোর চেয়ে 'কবিতাভবন'-এ থাকতেই আমার বেশি ভালো লাগত। বু. ব.-কে সবসময়ে বিরক্ত করা যেত না— উনি নিজের ঘরে আপনমনে কাজ করতেন, আর আমরা পাশের ঘরে উথালিপাথালি আড্ডা দিতুম। মাসিমারই লেখাটা শেষ হত না, টেবিলে পড়ে থাকত। সেলাইটা শেষ হত না। মেশিনে পড়ে থাকত। পরদিন গিয়ে দেখি ম্যাজিক— সবই শেষ, সবই সুসম্পূর্ণ।

'কবিতাভবন'কে সেদিক থেকে 'গুরুগৃহ' বলতে বাধা নেই। গুরুপত্নী এবং গুরুমশাই দুজনের কাছেই জীবন বিষয়ে দুই ধরনের অত্যন্ত জরুরি শিক্ষা পেয়েছি। দুটিমাত্র ঘরের মধ্যে কী করে যে এমনভাবে একটি তপোবন এবং একটি উপবন তাঁরা দুজনে তৈরি করেছিলেন! একটি ঘরে চলত জ্ঞানের তপস্যা, অন্যঘরে জীবনের নিত্যলীলা। প্রতিভা বসু একদিকে যেমন মাতৃমূর্তি— অন্যদিকে একইসঙ্গে বালিকার মতো জীবনরসে স্বতঃউচ্ছল, সরস সুখী। আবদারে-বায়নায় রাজি করিয়ে রুমি পাপ্পার সঙ্গে মাসিমাকেও নিয়ে হিন্দি সিনেমায় যেতুম আমরা। কী করে যে তিনি অত আড্ডা মেরেও অত কাজ করতেন?— রান্না, সেলাই, ছেলে-মেয়ের যত্ন, পড়ানো, শাসন, উপন্যাসের পর উপন্যাস রচনা করে অর্থোপার্জন এবং আমাদের অসীম অত্যাচার সহ্য করা। সংসার-অক্ষম ঋষি-স্বামীর যোগ্যতমা সঙ্গিনী ছিলেন তিনি— কবির যেটুকু পার্থিবসম্পদ, তা সবই লক্ষ্মীস্বরূপা প্রতিভা বসুরই একক এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল। প্রতিভা বসুকে দেখে জেনেছি যে নাক পর্যন্ত সংসারে ডুবে থেকেও সাংসারিকতার ক্ষার রসে জারিত না হয়ে আপন শিল্পীসত্তাকে এবং অন্তরের চিরতারুণ্যকে অধরা ফুলের মতোই বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আমি অন্তত দুজনের কারুর কোনো শিক্ষারই মান রাখিনি। না হয়েছি বু. ব.-র মতো শিল্পধ্যানী, না হয়েছি প্র. ব.-র মতো গৃহশিল্পী। এই দুই শিল্পীর সংসার থেকে শিক্ষা নেবার ছিল হাজারটা জিনিস। সংসারের কোনো বিড়ম্বনাই প্রতিভা বসুকে ম্লান করতে পারেনি, সংসারে সর্বদা আলো বাতাস খেলত তাঁর হাসিঠাট্টার গুণে। বু. ব.-কে মাঝে মাঝে খুবই বিষণ্ণ দেখেছি, আকস্মিক

ক্রুদ্ধও দেখেছি হয়তো (যদিও তাঁর ক্রোধ বালকের মতো নির্মল কোলাহল মাত্র), কিন্তু প্রতিভা বসুর সর্বদা সহজ, সহাস্য উপস্থিতি যেন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে জানত।

২০২-তে কেবল তো সাহিত্যই নয়, অন্যান্য শিল্পের আলোচনাও চলত। বিদেশি ছবি, থিয়েটার, পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়ে আমার প্রাথমিক ধারণাগুলি তৈরি হয়েছিল ওবাড়িতেই। আমি কফি হাউস কালচারের অঙ্গ ছিলাম না, প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যেতে পেয়েছিলুম কফি হাউসে ঢুকব না এই কড়ারে। পৃথিবী বিষয়ে নতুন নতুন ধারণাগুলি 'কবিতাভবন'-এই আমার আয়ত্ত হয়েছিল। মনুষ্যজীবন বিষয়ে, নারীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের 'ভালোবাসা' বাড়িতে ঠিক যেরকম ধারণা প্রচলিত ছিল, 'কবিতাভবন'-এ কিন্তু তা ছিল না। ৭২নং বাড়িও অনাধুনিক ছিল না, শিল্পসাহিত্যের আলোচনা সর্বক্ষণ এখানেও চলত, সাহিত্যের আড্ডা বসত নিয়মিত। কিন্তু এবাড়িতে সব কিছুর মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বাঙালি সাহিত্যিকরা। শিল্পী বলতে সতীশ সিংহ থেকে হেমেন মজুমদার, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ, সুনীলমাধব (অবনীন্দ্র-নন্দলাল তো বটেই) পর্যন্ত, শিশির ভাদুড়ী, রাইচাঁদ বড়াল, শম্ভু মিত্র, উদয়শংকর, তিমিরবরণ, পঙ্কজ মল্লিকেরা। ভালোবাসা বাড়িতে শিল্পীদের আনাগোনা ছিল, আলোচনার বিষয়বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু সবদিক থেকেই তা দিশি ঐতিহ্যের ভাববাহী— আমাদের বাড়িতে বইত বঙ্গসংস্কৃতির বাতাস। অমন দুর্দান্ত রোমান্সের বিয়ের পরেও আমার মা বাবা মোটামুটি প্রথানুসারী জীবনযাত্রা করতেন। এবাড়িতে মদের নামগন্ধ চলত না। বু. ব.-র মুহূর্তে মুহূর্তে চা চাই, নরেন্দ্র দেব চা খেতেন না। দুজনের কিন্তু একটি মস্ত মিল ছিল— জাগ্রত মুহূর্তগুলি কাটাতেন পড়ার টেবিলের একাগ্রতায়। দুপুরে ঘুমের প্রশ্ন ছিল না। বই-অন্ত প্রাণ ছিলেন দুজনেই। (তার কৃতিত্ব অবশ্য দুজনেরই প্রচণ্ড করিতকর্মা গৃহিণীদের)। সংসারের আইনকানুন তাঁদের জানা ছিল না, জানার উৎসাহও ছিল না। বেশ ব্রাহ্মনীতিমতে আমাদের ছোট্ট সংসারটি চালাতেন আমার বাল্যে বিধবা যৌবনে সধবা মা। যেসব বিষয়বস্তুর কদাচ উল্লেখমাত্র হত না ৭২ নম্বরে, ২০২-তে তাই নিয়েই সোচ্চার বিতর্ক চলত। 'কবিতাভবন'-এর নৈতিক বিশ্বাসগুলি বেশ একটু আলাদা ছিল 'ভালোবাসা' বাড়ির চেয়ে। যেমন, স্কুলের কিশোর-কিশোরীর প্রেম-প্রণয় এবাড়িতে ছিল অচিন্তনীয় পাকামি, কিন্তু ওবাড়িতে তো নেহাতই প্রাকৃতিক সম্ভাবনা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারা খুব সহজভাবেই ওবাড়ির জীবনচেতনার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিশোরবয়সে ইউরোপ ভ্রমণ করেও শটপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়িয়েও আমি দিশি ভাবনায় প্রথাবদ্ধ ধ্যানধারণায় নানান সামাজিক বাধা নিষেধের মধ্যে বড়ো হয়েছিলাম। অপরপক্ষে বারো বছর বয়েস থেকেই শাড়ি ধরেও মিমি রুমির সামাজিক স্বাধীনতা ছিল ঢের বেশি, আচরণে ছিল মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য। কিছুটা পাশ্চাত্যপন্থী। জামাই হয়েও জ্যোতি যখন বু. ব. এবং প্রতিভা বসু বলে ডাকতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়িকে— আমি তো শুনে মর্মাহত। মাসিমা অতি মিষ্টি— তাঁকে আমারই মা ডাকতে ইচ্ছে হয়। তাঁকে কিনা নাম ধরে ডাকা? একে তো বয়েসে ঢের ছোটো, তায় মেয়ের বন্ধু! তায় জামাই হচ্ছে। এ-রকম উদ্ভট সম্বোধন কখনো করতে হয়? প্রতিভা বসু কিন্তু খুবই সহজভাবে সাড়া দিতেন, মেনে নিতেন সবার সব পাগলামি। জ্যোতি সোজাসুজি সম্বোধন করত না বটে ওভাবে। কিন্তু সর্বদাই উল্লেখ করত, বা ভাববাচ্যে বলত। আমি অবাক হয়ে যেতাম প্রতিভা বসুর মনের ব্যাপ্তি ও তাঁর আধুনিকতা দেখে। খুদে পাপ্পা দিব্যি 'নিরুপম' বলে ডাকত মধ্যত্রিশের নিরুপম চট্টোপাধ্যায়কে।

এহেন আচরণ আমার উদ্দামতম কল্পনার অতীত ছিল তখন। এখন কত অনায়াসে বিশ ত্রিশ বছরের বড়ো মানুষকেও নাম ধরে ডাকি, সময় কত বদলে দেয় মানুষকে। আমার সেই মা-র সঙ্গেই এখন কত সহজেই যেকোনো একদা নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে খোলাখুলি স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করি, নিজের মেয়েদেরও সঙ্গে ডেকে নিই। আর প্রতিভা বসু ত্রিশ বছর আগেই এই কাজ করেছিলেন, ওবাড়ির সামাজিক চিন্তাভাবনা আমার বেশ দুঃসাহসী মনে হত— পশ্চিমি মুক্তদৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত কবিতাভবনের ভাবমূর্তি আর 'ভালোবাসা' বাড়ির ভাবমূর্তি এক ছিল না। অথচ প্রতিভা বসুরই কাপড় ছাড়ার ঘরে ছোট্ট লক্ষ্মী-প্রতিমাটি ছিল। বেস্পতিবারে পুজো হত। মাসিমার কাছে প্রসাদ খেতে খুব ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে ঠাকুরঘর নেই, প্রতিমা পুজোর চল ছিল না। ভালোবাসায় একটিই পুজো হত, সরস্বতী পুজো। কিছু বই, আমার ছেলেবেলার সেতারটা, দোয়াত কলম সামনে জলচৌকিতে সাজিয়ে ধূপ জ্বেলে নিয়ে, আসনে বসে বাবা রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটি পুরোটাই পড়তেন (সেদিন বর্ষা ঝরঝর করে কহিল কবির স্ত্রী)। মা তারপর সংস্কৃতে অঞ্জলিগুলো বলতেন এবং সরস্বতী প্রণামের। আমরা বিনা বিল্বপত্রে বিনা চন্দনে শুধুই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করতুম। এই পুজোটা তখন আমার একটুও মনের মতো ছিল না, কেমন শুকনো সাজানো মনে হত। বাতাসা নেই, প্রসাদ নেই, শাঁখ-ঘণ্টা নেই। এখন কিন্তু ভেবেই খুব ভালো লাগে। আমার ভালো লাগত অন্ধকার কোণের ধারে ধূপধুনোয় সুরভিত, দীপের আলো, (মোমবাতিই বেশি দেখেছি বোধ হয়) ফুল, শাঁখ, বাতাসার 'পুজো পুজো' লক্ষ্মীপুজোটি কবিতাভবনের। বু. ব. কে কদাচ এতে অংশ নিতে দেখিনি। লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে প্রতিভা বসুর এটা ছিল নিজস্ব খেলাধুলোর ব্যক্তিগত পাড়া। সন্তানরা ছাড়া কেউ এতে যোগ দিতেই পেত না— কবি অজিত দত্তের ছেলে-মেয়েরা এবং প্রতিভা বসুর ভায়ের ছেলে-মেয়েদেরই শুধু অবাধ অনুমতি ছিল সেই বাতাসা খাবার।

এই বিচিত্র বৈপরীত্যে ঐশ্বর্যবান ছিল 'কবিতাভবন'। এক কামরায় মালার্মে, ভ্যান গখ; হুইস্কি, সোডা। আরেক ঘরে লক্ষ্মীঠাকুর। আর 'ভালোবাসা'তে? না ছিলেন মালার্মে না হুইস্কি, না লক্ষ্মীঠাকরুন। ছিলেন বটে হাফিজ, কালিদাস, চা, কফি, সরস্বতী, আর রবিঠাকুর। আমি এই দুটি গৃহস্থালীর কাছে প্রায় সমানভাবেই কৃতজ্ঞ আমার জীবনচেতনার উন্মেষের জন্য সমানভাবেই ঋণী।

বু. ব.-র সযত্ন শিক্ষায় আমার সামনে যে সাহিত্য ও শিল্পের বিপুল বিশ্বটি আস্তে আস্তে উন্মোচিত হয়েছিল তাই নয়, তাঁর কাছে গড়ে উঠেছিল আমার শিল্পরুচি। শিল্পের ভালো-মন্দ বোধ। প্রেসিডেন্সির ইংরিজির ছাত্র, তারক সেনের কাছে সাহিত্যপাঠের নিয়মকানুন শিখেই এসেছি যাদবপুরে, কিন্তু ইংরিজির বাইরেও যে বিশাল একটি অজানা পৃথিবী রয়ে গেছে তা টের পেলাম যাদবপুরে এসে। আজ পৃথিবী অনেক ছোটো হয়ে এসেছে। 'তৃতীয় বিশ্ব' এই ব্যাপারের নীচে জড়ো হয়েছি আমরা অনেকে, পারস্পরিক ভাববিনিময় ঘটছে অনুবাদের মাধ্যমে। ফরাসি-জার্মান ছাড়িয়ে উঠে রুশ-স্প্যানিশ পেরিয়ে এতদিনে আমরা মারাঠি-তামিল শেখার কথা ভাবছি। দৃষ্টিভঙ্গি পালটাচ্ছে। বু. ব. এদিকটা ভাবেননি— কিন্তু অন্য অনেকগুলি দিকই ভেবেছিলেন। বাংলা, ইংরিজি, সংস্কৃত পেরিয়ে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন ইউরোপের সাহিত্যের প্রাচীন এবং আধুনিক দুই সময়ের সঙ্গেই।

ভারতীয় সাহিত্যে তখনও যে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ঝোঁক ছিল না তার মুখ্য কারণ পাঠ্য বইপত্তরের অভাব। এখনও সে-অভাব কমেনি। পাঠ্যবই হিসেবে দু-একটি নাটক নভেলের ইংরিজি অনুবাদ যদিও পাই তার উপর রেফারেন্স ওয়ার্কের বেলায় কলসি ঠনঠন। যাবতীয় ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সমালোচনা সবই তো ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়। ইংরিজিতে আলোচিত হয়ে থাকেন কেবল 'ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইন ইংলিশ'রা। আর আছে তাঁদের ওপরে মার্কিনি স্কলারদের সাউথ এশিয়ান বিভাগের উচ্চনীচ গবেষণাপত্র। স্বদেশি সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সমালোচনার যে চেষ্টা বু. ব. An Acre of Green Grass-এ করেছিলেন, সে-রকম কাজ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

আমার আজকের সাহিত্যমত হয়তো বু. ব.-র সঙ্গে অনেক জায়গায় মিলবে না। সাহিত্যশিল্পকে জীবনের বিপরীত বা পরিবর্ত বলে দেখতে আমি রাজি নই। কিন্তু আমার যে সাহিত্যচিন্তার অভ্যাস, যে সামান্য আত্মবিশ্বাসটুকু না থাকলে সৎসাহিত্য সমালোচনায় নামা যায় না, বু. ব.-র কাছেই তার জন্য আমি ঋণী। তিনি মন দিয়ে শুনতেন অর্বাচীন অপোগণ্ডদের উচ্ছ্বাস, মন দিয়েই আমাদের মতামত আলোচনা করতেন। তর্কবিতর্ক করে সম্মানিত করতেন আমাদের। আমাদের রুচি, বুদ্ধি, অনুভবকে কখনো অবহেলা করেননি। সর্বদা পূর্ণ মর্যাদায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা সবাই ছিলাম ভি আই পি। বাইরে তাঁর দুর্নাম ছিল দাম্ভিক, 'স্নব'— মানুষ বলে। আমরা কিন্তু দম্ভ দেখিনি। আমরা দেখেছি কেবলই উষ্ণতা, আর স্নেহ। কিন্তু স্বগতোক্তির তো শেষ নেই। আজ আমার কলম স্বেচ্ছাবিহার করছে। এ লেখকটির পাঠকও যে, এই লেখার লেখকও সেই— এ তো নিজের সঙ্গেই নিজের কথাবার্তা। অন্যের কাছে এর মূল্য নেই। হয়তো অর্থও হবে না।

যেকোনো জায়গায় পূর্ণচ্ছেদ টানতেই হবে।

৩০ নভেম্বর ১৯৮৬

জ্যোতি বসুর পড়শি

হ্যাঁ, আমরা জ্যোতিবাবুর পাড়ায় থাকি। সত্যি বলতে কী আমরা ওঁদের বাড়ির খুব কাছাকাছিই থাকি, একদম সামনের বাড়িতেই। না, না, আমাদের লোডশেডিং হয়। কে বলল হয় না? জ্যোতিবাবু সে-রকম লোকই নন যে, নিজের পাড়ার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করবেন। এ পাড়ায় ছাই কোনো হাসপাতাল-টাসপাতালও নেই যে, লাইনটা টেনে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। নাঃ, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে কোনো আলাদা ব্যবস্থা করেনি সি.ই.এস.সি.। আজকাল অবশ্য তত অসুবিধে হচ্ছে না আমাদের। ইনভার্টার এসেছে, দুটো আলো দুটো পাখা দিব্যি চলে। জ্যোতিবাবু বেচারির অবশ্য ইনভার্টার দেখিনি। উনি সন্ধ্যাবেলায় রোজই দেখতুম আপিস থেকে ফিরে দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে তালপাতার পাখা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খান। মা বলেন, কী করবে? আমাদের ঘরে আলো জ্বললে লোকে বলবে 'ইনভার্টার'। ওর ঘরে আলো জ্বললেই যে বলবে 'লোডশেডিং হয় না'! বড়োমেয়ে বললে, 'উনি তো বুদ্ধি করে আলো না জ্বেলে, কেবল পাখাগুলো চালালে পারেন। লোকে জানতেই পারবে না তিনতলার ঘরে পাখা চলল কি না!' কিন্তু সুবুদ্ধিটা বোধ হয় সে মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়নি। গবর্নর হাউসে চলে যাবার আগে অবধি ওঁদের এ-রকমই ব্যবস্থা চলছিল। ইতিমধ্যে হৃদ্‌রোগ এবং লিফ্‌ট নিয়ে সাতকাহন, লিফ্‌ট তো এলেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু চলে গেলেন রাজবাড়িতে। অনেক আগে, আমার ছাত্র বয়সে, মনে পড়ে জ্যোতিবাবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কালো ফিয়াট চালিয়ে পার্টি অফিসে যেতেন। ওই সময়ে উনি স্নানের পরে নিজের গেঞ্জি-টেঞ্জিগুলো ধুয়ে মেলেও দিতেন নিজেই। অবশ্য তখন উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু জ্যোতি বসু, বার-অ্যাট-ল তো ছিলেন!

খুব ছোটোবেলাতে, আবছা মনে পড়ে, গম্ভীর, ছোটোখাটো মানুষটি, একটা এয়ারগান নিয়ে রাস্তার কুকুরদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতেন। নাম ডক্টর এন.কে. বোস। সামনের দোতলা টানা বারান্দাওলা সাদা বাড়িটা তাঁরই। তার সামনেই যে হলদে রঙের দোতলা ছোটো বাড়ি, সেটা জ্যোতি বসুর বাড়ি। অনেক পরে এ বাড়িটার তেতলা হয়েছে। অনেক আগে ও বাড়িতে চালিহারা ছিলেন, তারপরে নিয়োগীরা। তিনতলা হবার পরে জ্যোতি ভট্টাচার্য, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনেক চেনা মানুষ ভাড়াটে হয়ে এসেছেন ওই জ্যোতিবাবুর বাড়িতে। ও বাড়ির একতলায় অনেক দিন ধরে আছেন এককালের দাপুটে খেলোয়াড় কল্যাণ বোস। পাড়ায় রটনা— কমলাদির সঙ্গে উনি নাকি বাড়িভাড়ার কেস লড়ে হেরে গেছেন। কোর্ট থেকে অ্যাভিকশন অর্ডার কবেই এসে গেছে। নোটিশের পরেও অনেক বছর পার হয়ে গেছে। কল্যাণদা এখনও আমাদের পড়শি। জ্যোতিবাবুর একতলাতেই আছেন। কেস আরও চলছে কি না জানি না, মুখ্যমন্ত্রীর আর পুলিশ ডেকে ভাড়াটেকে উৎখাত করা হয়ে ওঠেনি অর্ডারমাফিক।

চন্দনের যখন বিয়ে ঠিক হল, পাড়ারই মেয়ে, মোড়ের মাথার নাচের ইস্কুলের ছাত্রী, অবাঙালি

সুন্দরী ডলির সঙ্গে, কমলদির মুখে প্রথমে একটু গাঁইগুঁই শুনেছিলুম, বিয়ের পরেই দেখি কমলদি হাসিমুখে বউমাকে সঙ্গে নিয়ে নৈবেদ্যের থালা হাতে কালীবাড়িতে পুজো দিতে যাচ্ছেন! জ্যোতিবাবু ওসবের ধার ধারেন না, কিন্তু কমলদির নিজস্ব বিশ্বাসে বাধাও দেন না। স্বাধীন দেশ; গণতান্ত্রিক দেশ। নাস্তিক স্বামীর স্ত্রী হতেই পারেন কালীভক্ত; আর সাম্যবাদী বাবার ছেলে পুঁজিবাদী। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী জ্যোতিবাবু নিজের বিশ্বাস অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেন না। আবার অন্য লোকে যে যাই বলুক, ওঁর নিজের যা বিশ্বাস, তা থেকে ওঁকে নড়ানোও যায় না। সর্বসমক্ষে সেকথা ঘোষণা করতেও ওঁর বাধা নেই। তাতে যদি সমালোচনার পাত্র হতে হয়, তবুও। এর প্রমাণ তো সম্প্রতি কাগজে বেশ ভালোভাবেই পাওয়া গেল। ড. এন.কে বোসকে পাড়ার বাচ্চারা বেশ ভয় পেতুম। কিন্তু গম্ভীর জ্যোতিবাবুকে সমীহ করলেও, ভয় পেতুম না, আমার বাচ্চারা তো আরও নির্ভয়। ভোটের জন্যে প্রকাশ্যে গাঁয়েগঞ্জে বাচ্চাদের গাল টিপে আদর করে বেড়ান বটে জ্যোতিবাবু, কিন্তু গোপনে তিনি ছোটোদের বেশ পছন্দই করেন। একে অতি ব্যস্ত মানুষ, তায় চট করে কোনোরকম আবেগ প্রকাশ ওঁর ধাতেও নেই। লোকে বুঝবে কেমন করে যে উনি শিশুদের ভালোবাসেন! আমি যখন বাপের বাড়িতে আসতুম, মেয়েরা আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে কমলদি বাচ্চাদের প্রায়ই ওঁদের বাড়িতে ডেকে নিতেন। বাচ্চারা ফিরে এলে মাঝে মাঝে শুনতুম, দাদাও ওদের সঙ্গে গল্প করেছেন।

চন্দনের বউভাতের দিন জ্যোতিবাবু বরকর্তা, ঘোরাঘুরি না করে এক জায়গায় বসেই অতিথি সৎকার করছিলেন তিনি। আমার ছোটোমেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তো তোমার নাম জানি, কিন্তু তুমি আমার নাম জানো?' আমার কন্যার ছোট্ট মুখটা একপলক ওঁর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি তো জ্যোতি!' এমন কাঠখোট্টা উত্তরে আমি সংকুচিত, আর সবাই হেসে উঠল, জ্যোতিবাবু নিজেও মজা পেয়ে হাসিতে যোগ দিলেন।

ছেলেবয়সে চন্দন পাড়াতে বারোয়ারি পুজো করত। হইচই করে পাড়ার ছেলেরা মিলে সারারাত ঠাকুর সাজাত, ঠাকুর পাহারা দিত, জ্যোতিবাবু তাতে বাদ সাধতেন না। যোগও দিতেন না। একবার গভীর রাত্রে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে, মহোল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে ঢাকঢোল কাঁসর বাজাতে বাজাতে ছেলেদের দলবল ফিরল। ফিরেও প্রচণ্ড হট্টগোল করতেই থাকল। পাড়ার সবার ঘুম ভেঙে গেছে— আমরা অনেকেই বারান্দায় বেরিয়ে এসেছি। হঠাৎ একটা অন্ধকার বারান্দা থেকে সুস্পষ্ট ধমক এল। কড়া গলায়। ইংরেজিতে। মুহূর্তে হট্টগোল স্তব্ধ। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। ওই একবারই মাত্র জ্যোতিবাবুকে দেখেছি পাড়ার কাউকে বকুনি দিতে। আর সে-রাত্তিরে উনি পাড়ার সব বাবা মায়ের হয়েই বকুনিটা দিয়েছিলেন।

জ্যোতিবাবুর পড়শি হওয়ায় জীবনে অনেক উত্তেজনার মুহূর্ত আসত আমাদের। ডা. ডেভিড বলে রাঁচির একজন প্রসিদ্ধ মনোচিকিৎসক, মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে ফ্রি চিকিৎসা করতেন। একবার কোনো কারণে তাতে বাধা পড়েছিল। সাহেব তখন জ্যোতিবাবুর বাড়ির সামনে ধরনা দিলেন। দিনের পর দিন মাটিতে ফুটপাতে বসে থাকতেন। তাঁকে কেউ তুলেও দিত না, তাঁর কথা কেউ শুনতেও আসত না। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল। তবে জ্যোতিবাবুর পড়শি হওয়ার গ্ল্যামার যত ঝামেলাও তত। ডা. ডেভিড না হয় নীরব প্রতিবাদী। সরব প্রতিবাদীদের সংখ্যাও তো কম ছিল না। মিছিলের পর মিছিল আসত। নিয়মিত ঘেরাও হত। ধরনা হত। কত

উত্তেজনা! তারপর নিয়ম হয়ে গেল, 'তপোধাম' বাড়ির ওই মোড়ের কাছে এসে সব মিছিল থেমে যাবে। সুরক্ষার কারণে আর ওইদিকে এগোতে পারবে না। কিন্তু চিৎকারের তো আর এগোতে বাধা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর শান্তিভঙ্গ করার জন্য স্লোগানই যথেষ্ট। শতবীণাবেণুরবের তাই অভাব ছিল না।

শুধু কি মিছিল? কত যে পাগল আসত দেশকে ভালোবেসে (এখনও আসে) জ্যোতিবাবুকে গাল পাড়তে! এক পাগল ছিল, ভোরবেলায় উষাকালে সূর্যপ্রণামের মতো নিয়মিত এসে গলা ফাটিয়ে জ্যোতিবাবুর নামে নিন্দেমন্দ করত টানা দশ পনেরো মিনিট। তাতে জ্যোতিবাবুর কতটা শান্তিভঙ্গ হত জানি না, কিন্তু আমাদের নিশ্চয় হত। রোজ রোজ মন্দ কথা শুনে ঘুম ভাঙা কারো কি ভালো লাগে? মুখ্যমন্ত্রীর পড়শি হওয়ার কি হ্যাপা কম?

তারপর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আপিস যাওয়া। সে এক কাণ্ড! তখন দশ মিনিট ধরে আমাদের বাড়ির সামনের যত গাড়িঘোড়া একজন ট্রাফিক কনস্টেবল এসে হাত পা নেড়ে কন্ট্রোল করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বাঁশি বাজিয়ে চলে গেলে অল ক্লিয়ার। তারপর ছুটি। একদিন আমার মেয়েদের ইস্কুলের পরীক্ষা আছে। বাচ্চাদের গাড়িতে তুলে, সবে ব্যাক করে গাড়িটা জ্যোতিবাবুর বাড়ির সামনে এনেছি— ব্যস! কনস্টেবল বেরিয়ে এসে আমাকে আটকে দিলে। বললে, 'যেখানে ছিলেন সেখানেই ফিরে যান। স্যার চলে গেলে তবে গাড়ি যাবে।' আমিও তর্ক জুড়ে দিলুম— 'উনি নীচে নামতে নামতে গাড়িতে চড়তে চড়তে তো আমি বেরিয়েই যাচ্ছিলুম— আমাকে আটকে দিলেন কেন? ওদের পরীক্ষা'— কিন্তু পুলিশ বলে কথা! সে শুনবে কেন? বেশ তক্কাতক্কি হচ্ছে, হঠাৎ দেখি তার মুখের ভাব পালটে গেছে। ভালোমানুষের মতন হাত নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। যান।' হঠাৎ কেন এই হার্দিক পরিবর্তন? পিছন ফিরে দেখি সাদা টয়োটার পাশে ধুতি পাঞ্জাবি পরা জ্যোতিবাবু— ইশারায় পুলিশকে বলছেন, 'ওদের যেতে দাও।' আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেই হাসি!— যেটা প্রেসের জন্যে বিরল, কিন্তু পরিজনের মধ্যে বিরল নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দেখিনি কোনো 'আমলাসুলভ' দম্ভ। জ্যোতিবাবু চিরকালই স্বল্পভাষী, নিরাবেগ, স্বভাব-সংযত, অন্তর্মুখী এবং 'দাম্ভিকদর্শন' পুরুষ। তার সঙ্গে পদাধিকারের কোনো যোগই নেই। আগে উনি সাধারণ মানুষের বেশি কাছাকাছি ছিলেন, যখন ওঁরা এ পাড়াতে ছিলেন। এখন যে সরকারি মুখ্যমন্ত্রী-ভবনে বাস করেন সেখানে নানারকম সুরক্ষাচক্র ভেদ করে ঢুকতে হয়। শুনেছি, সকালে উনি যখন অফিসে যান, তখন নাকি সুরক্ষার চোটে উল্টোডাঙা পর্যন্ত যানজট পাকিয়ে যায়। এখন ওঁর যাঁরা পড়শি, তাঁরা অনেক অসুবিধা ভোগ করেন। আমাদের অভিযোগ করার কিছু ছিল না, মধ্যবিত্ত পাড়াতে মধ্যবিত্ত মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আমরা সুখেই ছিলুম। বরং এখনই, উনি চলে যাবার বেশ কিছুকাল বাদে, আমাদের বাড়ির সামনে নোটিশ পড়েছে— No Parking on Eitherside of the Road! ফলে আমি নিজের বাড়ির ছায়াতে গাড়ি রাখতে পারি না, আমার অতিথিরাও পারেন না। জ্যোতিবাবু তো নেই পাড়ায়, যে অভিযোগ জানাব, কেন এই No Parking? জ্যোতিবাবু নেই, শুধু ওঁর বাড়িটার সামনে একসারি পুলিশ বসে থাকে বেঞ্চি পেতে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পাহারা দেয়। তাদের নিয়ম করে ডিউটি বদল হয়। মধ্যরাত্রে। মধ্যদিনে। মাঝে মাঝেই পুলিশের গাড়ি আসে। কেন যে আসে, কে জানে? কী পাহারা দেবে? জ্যোতিবাবু তো সুখরাম নন।

তখন জ্যোতিবাবু এ পাড়াতে ছিলেন। একদিন কমলদি রেগে আগুন তেলে বেগুন— 'এতগুলো পুলিশ বসে আছে সামনের দিকে আর বেটা চোর কিনা, দিনের বেলায়, বাড়ির পিছনদিকে, তারে তোমার দাদার যেসব কাচা জামাকাপড় শুকোচ্ছিল— আঁকশি দিয়ে সেগুলো বাইরে থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে গেল? এতবড়ো আস্পদ্দা হয়েছে চোরের?'

এ তো দিনের বেলায়, রাতের বেলায়? এক রাত্তিরে রাস্তায় বেজায় চেঁচামেচি শুরু হল। আমি বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, একটা রোগাপটকা লোক পাঁই পাঁই করে ছুটছে একাই 'চোর! চোর!' চেঁচাতে চেঁচাতে। এক দঙ্গল লোক তাকে তাড়া করেছে। আর জ্যোতিবাবুর পুলিশেরা জনাতিনেক বন্ধ গেটের ফাঁক দিয়ে মহোৎসাহে চোরের দৌড় দেখছেন। আমি চেঁচিয়ে তাদের বলি, 'পুলিশ! পুলিশ! পাকড়ো, পাকড়ো, চোর পালাচ্ছে! চোর পালাচ্ছে!' পুলিশরাও কর্তব্যবোধে গলা মিলিয়ে 'চোর! চোর!' বলে চেঁচালেন কিন্তু গেটের বাইরে পা বাড়ালেন না, চোর দিব্যি মোড় ঘুরে, 'চোর! চোর!' পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। '—আশ্চর্য মশাই! কেমন পুলিশ আপনারা? নাকের ডগা দিয়ে চোর পালাল, ধরলেন না?' পুলিশদের একজন উত্তর দিলেন, 'কী করব দিদি? আমাদের যে ডিউটি এই বাড়িতে। রাস্তাটা আমাদের এরিয়ার বাইরে কিনা!' পুলিশমন্ত্রী নিশ্চয় এ খবরটা জানেন না। পুলিশদের হাত পা বাঁধা। তারা স্বস্থানেই শুধু ডিউটি করবে। সাধারণ লোকের তো ডিউটি বাঁধা নেই, তারা চোর ধরবে দৌড়ে দৌড়ে। তারা মুক্তপুরুষ। সর্বত্র তাদের ডিউটি আছে।

আমার মেয়ের বিয়ে তাই এ পাড়াতে হয়নি। কমলদি আমাকে বলেছিলেন, উনি একাই আসবেন। সেদিন জ্যোতিবাবুর কিউবা থাকার কথা। বিয়ের দিন বিকেল ৫টায় ফোন এল, 'মুখ্যমন্ত্রী যে আসবেন, তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

মুখ্যমন্ত্রী কিউবায় যাননি?

সে-খবরটা বিয়েবাড়ির তাড়ায় কারুর চোখে পড়েনি। তবে জানি যে, কমলদি ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। সেটা যদিও কাগজে বের হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চয় কলকাতা পুলিশই করবে, এই ভেবে আমি আর মাথা ঘামাই না, তবে খুশি হই। কিন্তু সন্ধে হতে-না-হতেই ঝোরঝরণ বৃষ্টি নামল, পথঘাট তারই বন্যায় ভেসে গেল। বরের আসতে খুব দেরি হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত আমরা বর বউ নিয়ে যখন সিক্কাপ্যালেসে রওনা হলুম, তার আধঘণ্টা আগেই আমাদের সদলবলে ওখানে উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু পথে আরও সমস্যা। জল যদি-বা পেরোলাম, পুলিশে দিলে পথ আটকে। আমরা আর এগোতেই পারি না। 'কীসের ভিড়? কীসের এত জ্যামজট?'— 'ওই একটা বিয়েবাড়ি হচ্ছে, তাতে জ্যোতিবাবু এসেছেন তারই সিকিয়োরিটির জন্যে'— আমি শুনে প্রায় কেঁদে ফেলি— 'ওটা আমারই মেয়ের বিয়ে! প্লিজ আমাদের আটকাবেন না— জ্যোতিবাবু এসে গেছেন, আর আমরা যেতে পারছি না?'— বরের গাড়িটা তো ছেড়ে দিয়েছি এক্ষুনি'— 'এটায় কনের মা, আর বরের বাবা যাচ্ছেন— দয়া করে এটাও ছেড়ে দিন— কেলেঙ্কারি হয়ে যাচ্ছে।'

যখন বরকনে পৌঁছোল তখন জ্যোতিবাবু, বিনয়বাবু, অশোক মিত্র, শঙ্কর সেন, অসীম দাশগুপ্ত, এঁরা গোল হয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন। মেয়ে-জামাই প্রণাম করতেই সকৌতুকে হেসে জ্যোতিবাবু ওদের বললেন, 'এই যে, এসো, তোমাদের Reception Committee

অপেক্ষা করছে—' দেরির জন্য একটুও অধীরতা বা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। বৃষ্টিতে ভিজে, ঝোড়ো কাক হয়ে আমার আসতে আরও দেরি হল। আমি যেতেই বললেন, 'যাক! এবারে তাহলে আমি উঠতে পারি, তুমি এসে গেছ। আগে চলে গেলে তো রাগ করতে!' জ্যোতিবাবুর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা তিনি খুব কড়া মেজাজের মানুষ। সেটা কিছুটা সত্যি। কিন্তু তিনি যে খুব উষ্ণ প্রকৃতির, স্নেহপ্রবণ ঘরোয়া মানুষও, সেকথাটার প্রচার নেই।

কমলদি তাঁর তরুণীকালে আমার মায়ের কাছে এসে দুঃখু করতেন— 'বউদি, কী যে সন্ন্যাসী মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আমার বরের কোনো শখ নেই!— কেবল কাজ আর কাজ, একটা সিনেমা দেখতে নিয়ে যায় না, একদিন বেড়াতে নিয়ে যায় না, প্রথমে তো ছিল খালি জেল আর বাড়ি। তারপর পার্টি মিটিং আর পার্টি মিটিং। এমন মানুষের সংসারী হওয়াই উচিত হয়নি'— অভিমান করে বলতেন কমলদি। অথচ, এখন তো দিব্যি নাতনিদের নিয়ে দুজনে মিলে আহ্লাদ করেন, সংসারী না হলে এমন নাতনিদের পেতেন কেমন করে? পশ্চিমবঙ্গের ব্যস্ততম মানুষটির ঘরণী হওয়া সত্যিই তো সহজ কথা নয়!

আমার আর অমর্ত্যর বিয়েটা হয়েছিল জ্যোতিবাবুর বাড়িতে, চিঠিতে ঠিকানা ছিল যদিও ৭২, হিন্দুস্থান পার্ক। পথে সেতু বাঁধা হয়েছিল দুই বাড়ির মধ্যে। আর ওদিকে দুটি বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ফেলে বাগানগুলো জোড়া দেওয়া হয়েছিল যাতে বসবার জায়গা হয়। জ্যোতিবাবুদেরই পিছনের উঠোনে মঞ্চ বেঁধে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এখনকার হিন্দুস্থান পার্কে এমন কথা চিন্তাও করা যায় না। 'মশাই, আপনাদের পাঁচিলগুলো একটু ভেঙে ফেলি? আমার মেয়ের বিয়েটা ভাবছি আপনাদেরই উঠোনে দেব!' তখন বেশিরভাগ বাসিন্দা যে যার নিজের বাড়িতে থাকতেন, এ পাড়ায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটবাড়ি ওঠেনি, আর মালিকানাযুক্ত ফ্ল্যাটের বহুতল সৌধ নির্মাণের চলই হয়নি তখন কলকাতায়। অবাক হয়ে শুনতাম বম্বেতে 'ফ্ল্যাট কিনে' ফেলা যায়!

দু-বছর হল জ্যোতিবাবু এ পাড়াতে পদধূলি দেননি। আগে ভোট দিতে আসতেন। এবার তো ভোটও লবণহ্রদে। পৈতৃক পাড়াটা অন্ধকার করে মুখ্যমন্ত্রী চলে গেছেন সরকারি বাসভবনে। এখন লোডশেডিং হয় না, কিন্তু জ্যোতিবাবুর অভাবে পার্মানেন্ট আঁধার। কত গোলমাল, কত হাঁকডাক, সাইরেন বাজিয়ে জরুরি লোকদের আনাগোনা, কত ধরনা, কত মিছিল, সব বন্ধ। সেদিন হঠাৎ একটা সাইরেন বেজে উঠল, দুপুর বেলায়। চেনা চেনা বাঁশি? বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, জ্যোতিবাবুর গাড়ি ঢুকল বাড়িতে, তাঁর সঙ্গীসাথি দলবলের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। আমি ভাবলুম এতকাল পরে পাড়ায় এলেন, কেবল পুলিশেরাই ওঁকে অভ্যর্থনা করবে? পাড়ার লোকে রিসিভ করবে না? চটি গলিয়ে কি ও বাড়িতে একটু যাওয়া উচিত? কিন্তু 'ও বাড়ি' তো সে-বাড়ি নয়। যখন গেলুম, আমাকে ঢুকতেই দিল না পুলিশ। সবিনয়ে বলতে লাগল, 'ম্যাডাম, বাহার যাকে, রাস্তামে খাড়া হো যাইয়ে।' আমি শুনব কেন? জবরদস্তি গায়ের জোরে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। বেশিক্ষণ না, একটু পরেই জ্যোতিবাবু নেমে এলেন লিফ্‌টে। আমাকে দেখেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সারা মুখ। এই তো, এই আলোটি দেখবার জন্যেই তো আসা! খুশি হয়ে, দুই মেয়ের খবর নিলেন। বললেন, 'দু-বছর পরে এলাম এ পাড়ায়— পাড়াটা একদম বদলে গেছে। কীরকম বড়ো বড়ো বাড়ি। চেনাই যায় না। মিসেস বিশ্বাসের বাড়িটা নেই, ওখানে বিজয় সরকারের বাড়িটা নেই।' ওই সুন্দর বাড়িগুলো ভেঙে বহুতল অট্টালিকা হয়েছে। আশালতা

বিশ্বাসও নেই, বিজয়কুমার সরকারও নেই। বাড়ি হাতবদল হতে হতে প্রোমোটারের হাতে। 'তবু ভালো লাগছে যে, তোমাদের বাড়িটা আর বলসাহেবের বাড়িটা আছে, নইলে পাড়াটা চিনতেই পারতাম না।' 'কী যে ভালো লাগল!' 'বলসাহেবের বাড়ি', 'বিজয় সরকারের বাড়ি' শুনে। আঃ, এসব কথা কতকাল শুনি না। আমার মা-বাবার কাছে বাড়িগুলোর এই পরিচয়ই ছিল। আমার মেয়েরা কিন্তু জানে 'বুড়োদাদের বাড়ি', 'নবুদাদের বাড়ি' বলে। এখন আরেক দফা বদলের পালা। তবু সান্ত্বনা দিতে বলি, 'কেন, পাঞ্জাবিদের বাড়ি, "তপোধাম" এসবও তো রয়েছে।'

জ্যোতিবাবু মাথা নাড়লেন— 'তবু পাড়াটা বড্ড অন্যরকম দেখাচ্ছে।' যেজন্য এসেছিলেন, সে-কাজটা সেদিন হল না। আরেকদিন ফের আসতে হবে। জ্যোতিবাবু একটু ক্ষুব্ধ, কিন্তু আমরা খুশি। বেশ তো, আরেকবার মুখ্যমন্ত্রীর সাইরেন বাজবে পাড়াতে। আরেকবার ঘরের ছেলে ঘরে আসবেন। আমাদের ভালো লাগবে।

জ্যোতিবাবুর আর হিন্দুস্থান পার্কে ফেরা হবে না। যতদিন না ওঁকে দিল্লিতে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোনো-না-কোনো আরও জরুরি পদে, ততদিন ওঁর আর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ছেড়ে নড়ার সম্ভাবনা নেই। ওই লবণহ্রদেই জারিত থাকবেন। যখন সি.পি.এম. কেন্দ্রের সরকারে যোগ দিল না, জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হলেন না, তখন হিন্দুস্থান পার্কের কিন্তু খুব মন খারাপ হয়েছিল। 'মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া' থেকে 'প্রধানমন্ত্রীর পাড়ায়' প্রোমোশন পাওয়ার এতবড়ো চান্সটা হাতছাড়া হয়ে গেল! এখন হিন্দুস্থান পার্ক বলাবলি করছে, ঠিক আছে, প্রধানমন্ত্রী না হয় নাই-বা হলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে তো সেই বাধাটা নেই? সেক্ষেত্রে, যদি আমাদের বাধ্য হয়ে একদিন 'প্রেসিডেন্টের পড়শি' ওই আখ্যা পেতেই হয়, তাতে আমাদের তেমন কোনো আপত্তি নেই। এই প্রসঙ্গটি একটু প্রপার চ্যানেলের কানে তুলে দেওয়া যায় না?

পালটে গেছে পাড়াটাই

প্রস্তুতি ছিল না এমন নয়। গত দু-সপ্তাহ ধরেই সারা ভারতবর্ষ এই কঠিন মুহূর্তটিকে সশঙ্কচিত্তে এড়িয়ে চলতে চাইছিল। তাই শক লাগেনি, তবু শোক লেগেছে। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হবে না, এটা ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে। আমার জন্ম ইস্তক তাঁর সঙ্গে অনিয়মিত দেখাসাক্ষাতের অভ্যাস ছিল যে। অভ্যাস ছিল তাঁর কাছে স্নেহের প্রশ্রয় পাওয়ার। বাইরে কঠিন, কিন্তু তাঁর কাছের লোকেরা সবাই জানেন, জ্যোতিবাবু ছিলেন খুব স্নেহপ্রবণ মানুষ। আমাকে তিনি শৈশব থেকে বড়ো হতে দেখেছেন। তাঁর সামনের বাড়ির মেয়ে আমি। তিনি আমার দাদা।

পুবের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, সামনের বিশাল বাড়িটা আমার দিকে অপরিচয়ের চোখে চায়। যেন প্রশ্ন করে, 'তুমি কে হে?' ঝকঝকে চকচকে পাঁচতলা আধুনিক সৌধ। একদিন ঠিক এখানেই ছিল জ্যোতিবাবুর ঘরসংসার। এখানে তাঁদের দোতলা বাড়িটি ছিল, যেটা পরে তেতলা হল। যে বাড়িটি কমলদির আর জ্যোতিবাবুর আর চন্দনের। পরের দিকে এসে থাকতেন কমলদির মা, তাঁর পুত্র বিমলকে নিয়ে। তাঁদের জন্য জ্যোতিবাবুর গ্যারাজের ছাদে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল আলাদা একটা ছোট্ট বাসগৃহ। তার জানলায় বসে কমলদির মা রাস্তা দেখতেন, সেলাই করতেন। বিমলমামা (আমার মেয়েদের ভাষায়) কোনো কাজকর্ম করতেন বলে শুনিনি। তিনি ছিলেন 'রাজার শালা'র মতো। এক সম্মানিত অতিথি মাত্র।

জ্যোতিবাবুর গ্যারাজে তাঁর বা আর কারো গাড়ি থাকেনি অনেক দিন। আগে থাকত, একদা ওইখান থেকে বেরোত জ্যোতিবাবুর গাড়ি। এখন জ্যোতিবাবুর পুরোনো বাড়ির সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র ভদ্রাসনসুদ্ধ গ্যারাজটা মুছে গিয়েছে। ও বাড়ির উঠোনটাও নেই, উঠোনের সেই মস্ত লোহার গেটটাও নেই, যেখানে খুব ছোটোবেলায় আমি চড়ে দাঁড়িয়ে ক্যাঁচকোঁচ করে মনের সুখে দুলেছি। তখন তো ও বাড়িতে পুলিশ ছিল না, জ্যোতিবাবুর ডাকসাইটে বাবাকে বন্দুক হাতে ওই গেটের সামনে আমি দেখেছি অবিশ্যি। ডা. এন.কে. বসু শুধু তো ডাক্তার না, বন্দুকধারী শিকারিও ছিলেন। এক তরুণ বিপ্লবী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। অন্য এক যুগে আবার আমার মেয়েরাও ওই গেটে দোলনার মতো দাঁড়িয়ে অবিকল ওই একইভাবে খেলেছে। কিন্তু জ্যোতিবাবুর পুলিশেরা দেখতে পেলেই আদর করে 'পড়ে যাবে' বলে নামিয়ে দিত। আজ আর নেই সেসব আলস্যপুষ্ট নিরাপত্তারক্ষীরা। কর্মহীন দীর্ঘ অবসরে দিবসরজনী হা-ক্লান্ত সেই পুলিশেরা যে বন্ধ গেটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখত মাঝরাত্রে রাস্তা দিয়ে চোর দৌড়োচ্ছে, 'চোর-চোর' চেঁচাতে চেঁচাতে। পিছনে দলে দলে লোকে তাড়া করেছে, 'পুলিশ! পুলিশ! ধরুন! ধরুন!' বলতে বলতে।

চোর এবং তাকে তাড়া করা লোকেরা সবাই দৌড়ে চলে গেল, জ্যোতিবাবুর পুলিশ কিছুই করল না। আমি খেপে উঠে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন আটকালেন না চোরটাকে? আপনারা ছ-জন লোক, ও একা।' পুলিশ অমায়িক হেসে বলে, 'ওটা তো আমাদের ডিউটি নয় দিদি। আমাদের ডিউটি এই বাড়িতে, এখন আমরা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পাহারা দিতে এসেছি। স্পট ছেড়ে যাই কেমন করে?' কিছুই বুঝলাম না। শুধু মনে হল, পুলিশমন্ত্রী জ্যোতিবাবু এই যুক্তির খবর জানেন না। এ আবার কেমন ডিউটিবান পুলিশ, জনসাধারণ দৌড়োচ্ছে, আর পুলিশ হয়েও তুমি চোর ধরবে না? এর কয়েক দিন বাদে এক চোর এসে আঁকশি দিয়ে জ্যোতিবাবুদের শুকনো কাপড় তার থেকে টেনে চুরি করে নিয়ে গেল। পুলিশেরা টের পেল না।

জ্যোতিবাবুর উঠোনেই আমার বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতিবাবুর বাড়ি আর তাঁর দাদার বাড়ির মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে দিয়ে, ওপাশে পাহাড়ি সান্যালদের উঠোনের পাঁচিলও ভেঙে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা করে নিয়ে মা-বাবা ওইখানে স্বজন-ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্যোতিবাবুর উঠোনেই আমাদের বিয়ের মণ্ডপ আর বরের আসন তৈরি হয়েছিল। আর সাজ্জাদ হোসেন সানাই নিয়ে বসেছিলেন। ওই বাড়ি আর আমাদের বাড়ি জুড়ে রাস্তার উপর দিয়ে একটা সেতু বানানো হয়েছিল, তলা দিয়ে গাড়ি যাতে যেতে পারে। আমার বড়োমেয়ে অন্তরার বিয়ের সঙ্গেও জ্যোতিবাবুর একটি চমৎকার অনুষঙ্গ রয়েছে। মনে পড়ে খুব মন কেমন করছে।

আমাদের বাড়িতে ওদের সই করা বিয়ে হল, স্বজন-ভোজন হবে সিক্কা প্যালেসে। সেদিন প্রবল বৃষ্টি, আমরা বর-কনেকে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি। কিন্তু ফাঁড়িতে পুলিশ আমাদের গাড়িগুলি আটকে দিল। নিরাপত্তারক্ষীরা যেতে দেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন। যতই বলি, তিনি আমাদের আমন্ত্রণেই যাচ্ছেন, আমাদের আগে যেতে দিন, পুলিশ কি শোনে সুশীল সমাজের বার্তা? হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছে দেখি, আরও কয়েকজন জরুরি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিবাবু বসে আছেন। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে বর-কনেকে বললেন, 'এসো, এসো, ওয়েলকাম! এই যে তোমাদের রিসেপশন কমিটি এখানেই ওয়েট করছে।'

আমরা যেমন বন্ধুদের গাড়িতে ইস্কুলে যাই, মন্ত্রীরাও যে তেমনই যান, তা কি জানতে পারতুম এই বাড়িতে না থাকলে? রোজ সকাল বেলায় জ্যোতিবাবুর গাড়িতে একসঙ্গে মহাকরণে যাবেন বলে এসে পৌঁছে যেতেন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। তিনি তো সিপিএম-ও নন। যতীনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জ্যোতিবাবু তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন তখন। জ্যোতিবাবু রাজ্যপালের বাড়িতে সরকারি আবাসনে থাকতে চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁকে খুব মিস করি আমরা, এ পাড়ার বাসিন্দারা। তার পরে ইন্দিরা ভবনে। ভেবেছিলুম অবসর নিয়ে হয়তো নিজের বাসভবনে ফিরে আসবেন। কিন্তু এলেন না। এতে আমাদের পাড়া বেশ একটু হতাশ হয়েছিল।

জানি, এ শোকের কোনো মানে নেই। যেতে তো দিতেই হবে একদিন। নশ্বরতা তার খাজনা নেবে। বয়সকে অগ্রাহ্য করে তিনি অনেকদিন ধরেই অনন্য মনোযোগে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। নেহাত্ স্বাস্থ্যের কারণে কিছুদিন যাবৎ তিনি রাষ্ট্রশাসনের কাজ আর রাজনৈতিক পদাধিকার থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু অভিভাবকের পদ থেকে তো অবসর গ্রহণ করা যায় না। জ্যোতিবাবু তো ছিলেন শুধু আমাদের পাড়ার নয়, আমাদের গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পিতৃপ্রতিম অভিভাবক।

হ্যাঁ, তিনি হতেও পারতেন সমগ্র ভারতবর্ষেরও এক জবরদস্ত পিতৃপ্রতিম অভিভাবক, যদি তাঁর নিজেরই দলের (অদ্যপি অপরিণত বুদ্ধি, সময়ের দাবি সম্পর্কে ধারণাবিহীন এক ছিন্নমূল পার্টির) কূপমণ্ডুকতা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল না মারত। সেদিন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ কেড়ে নেওয়ার মতো পলিটব্যুরোর এই অমার্জনীয় আত্মবিধ্বংসী অপকীর্তি একটি আত্মবিধ্বংসী বোমার চেয়ে কম ক্ষতিকর হয়নি। সংযতবাক্ জ্যোতিবাবুর নিজের কথায় যা ছিল, একটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি। দিনের পর দিন ধরে সেই ক্ষুদ্র এক টুকরো মন্তব্যের গভীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে চলেছে। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম সেদিন, জ্যোতিবাবু যেদিন এসেছিলেন তাঁর পুরোনো বাড়িতে কোনো একটি কাজে। আমাকে নীচে ডাকলেন, দুজনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলুম, প্রধানত দাদাই কথা বলেছিলেন। খুব বিমর্ষ। দিন বদলের কথা। 'বিশ্বাসদের বাড়িও ভেঙে দিল? সরকারদের বাড়িটাও? এই পাড়াটাকে তো আর চেনা যাচ্ছে না। তোমাদের বাড়ি আর বল সাহেবের বাড়িটা ভাগ্যিস বাকি আছে। নইলে তো আমি পাড়াটাকে চিনতেই পারতাম না।'

এই বাড়িদের নামগুলো কেবল পুরোনো বাসিন্দারাই জানেন। কোনটা যে বল সাহেবের বাড়ি, কোনটা যে জলাবাড়ির বিশ্বাসদের ছিল, কেউ জানে না আর। এখন সামনের এই বাড়িটা দেখে জ্যোতিবাবুর বাড়িও কি চিনে নিতে পারবে কেউ?

১৮ জানুয়ারি ২০১০

পরলোকে শিল্পী সুনীল মাধব

জন্মাষ্টমীর শুভলগ্নে শঙ্খধ্বনির মধ্যে জন্ম, ১৯১০-এ, পুরুলিয়াতে। মৃত্যু হল ১০ নভেম্বর ১৯৭৯। কার্তিক শেষের হিমঝরা ভোররাত্রে হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর নিজের ভিটেয়। শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্তের আলোআঁধারিতে রং তুলি নামিয়ে রেখে সত্যি সত্যি বিশ্রাম নিলেন শিল্পী সুনীলমাধব সেন। রক্তচাপ ভালো যাচ্ছিল না দু-দিন, শ্বাসকষ্ট, তারপর হৃদ্‌যন্ত্র ছুটি নিল। আধুনিক চিত্রকলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যেসব ভারতীয় শিল্পী, সুনীলমাধব সেনের স্থান তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যে-মন কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না, সুনীল মাধবের ছিল সেই জাতের শিল্পী-মানস। পূর্ণতার দিকে অতৃপ্ত অঞ্জলি বাড়িয়ে রাখার মুহূর্ত তাঁর জীবন থেকে ফুরিয়ে যায়নি। নিত্যই তাঁর প্রবেশ ছিল নতুনের মধ্যে। নিত্যই নানা পরীক্ষায় তিনি সম্পদবান করে তুলতেন নিজের শিল্পকলাকে।

ছেলেবেলায় দেওয়ালে কাঠকয়লার আঁচড় কেটে যাত্রার শুরু, ছাত্রবয়সে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়ায় এসে পেলেন অনুপ্রেরণা এবং শিল্পের কারুকলার হাতেখড়ি। কিন্তু বেঙ্গল স্কুলের রং রেখায় তাঁর মন ভরল না, শিল্পী সতীশ সিংহ এবং অতুল বসুর সংস্পর্শে এসেই প্রকৃত দিক্‌নির্দেশ জুটল। পোর্ট্রেট আঁকাতেই তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম প্রকাশ। ১৯৩৩-এ সিটি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি আইন পড়তে যান। আইন পাশ করে কোর্টে ঢোকেন ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ। কিন্তু অনন্ত রং নিয়ে যাঁর কারবার ও কালো গাউন তাঁকে বাগ মানাবে কেমন করে? প্রথম জীবনে শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে পারিবারিক বাধা ছিল প্রচণ্ড। ১৯৪০-এ চোদ্দো বছরের কিশোরী অরুণাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। যেন মূর্তিমতী ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীর জীবনে শিল্পের সার্বভৌমত্ব সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়ে অরুণা হয়ে উঠলেন শিল্পীর সত্যকার জীবনসঙ্গিনী। আইন ব্যবসায়ীর জোব্বা খুলে ফেলে দিয়ে সুনীল মাধব এবার পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে নিবিষ্ট হলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবনে। ১৯৪৫-এ কলকাতা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের পুরস্কার তাঁর জেদকে সম্মানিত করল। তারপরই ঝোলাঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারতবর্ষ বেশ কয়েক বছর। সংগ্রহ করলেন নানা স্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ১৯৫০-এ কলকাতার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর পরে, ১৯৫২-তে তিনি যোগ দিলেন ভারতখ্যাত ক্যালকাটা গ্রুপে— নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, রথীন মৈত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে। তারপর থেকে বার বার তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে দেশে এবং দেশের বাইরে। একা এবং দলের সঙ্গে। তাঁর শিল্পপদ্ধতি বহু বিচিত্র স্তরের মধ্য দিয়ে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, এক মিডিয়াম থেকে অন্য মিডিয়ামে গড়ে উঠেছে। পোর্ট্রেট আঁকার বাস্তবধারা থেকে তিনি সরে গেছেন পিকাসোর পথে, কিউবিজমে। সেখান থেকে গেছেন গির্জের জানালার ঢঙে স্টেইনড গ্লাস আঁকায়, কখনো-বা পটুয়াদের মতো স্ক্রোল এঁকেছেন, কখনো বালি সিমেন্ট

পুঁতি দড়ি নিয়ে গড়েছেন ত্রিমাত্রিক ছবি। কখনো যিশু, কখনো শিবদুর্গা, কখনো গণেশ বা জগন্নাথ। তাঁর উৎসাহ এক পুরাণ থেকে অন্য পুরাণে ছড়িয়ে পড়েছে। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের রামায়ণের চিত্রাঙ্কনের সময়ে অনেক বড়ো বড়ো রামায়ণী কথা আঁকা হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ তে তিনি প্রথম হিন্দুস্থান পার্কের এ বাড়িতে এলেন। এপাশে যতীন বাগচির 'ইলাবাস' ওদিকে আমাদের ভালোবাসা, কোনাকুনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়ি— এরই মধ্যে গড়ে উঠল তাঁর ছিমছিমে দোতলা। কিন্তু পাড়া মাত করেছিল তাঁর টু-সিটার কনভার্টির ইংলিশ ফোর্ড। শিল্পীর খেয়ালি মনটি যেন সর্বাঙ্গে বয়ে বেড়াত সেই গাড়ি। তার বুকপেট সিঁদুরে লাল, আর চওড়া মাডগার্ড কখনো সবুজ, কখনো ধূসর, কখনো নীল, কখনো খাকি। নিত্যনতুন পোশাকে সেজে বেরুত সেই গাড়ি। গাড়ির মালিকেরও বেশবাসে রংচং ছিল যথেষ্ট। সর্বদা বিলিতি পোশাক মাথায় পিকাসোর, সার্ত্রের সেই ফরাসি শিরোপা, সবুজ রঙের 'বেরে' টুপি।

কিছুদিন হল সেই 'পক্ষীরাজ'-এর তিরোধান ঘটেছে পাড়া শূন্য করে দিয়ে। দিক্‌চিহ্নের মতো আর দাঁড়িয়ে থাকে না সে শিল্পীর বাড়ির সামনে। আজ তার সওয়ারির ছুটি হয়ে গেল। টুকটুকে লাল পাঞ্জাবি আর নিখুঁত কোঁচানো ধুতি পরে শুভ্র পুষ্পশয্যায় শুয়েছেন, নিজের হাতের ছবিতে ভরা শোবার ঘরে। মুখে সেই লাজুক হাসি। যাঁরা আসছেন, বন্ধু-স্বজন, শিল্পী আর লেখকরা শিল্প অনুরাগীর সেই হাসি যেন তাঁদের বলছে 'যাই'।

বাড়ি ভরতি কেবল ছবি, ছবি, ছবি। শিল্পীর দিনগুলি, রাত্রিগুলি, জীবনের একাগ্রতম মুহূর্তগুলি ধরা রয়েছে চারিদিকে। সেদিকে তাকিয়ে নিঃসন্তান অরুণা সেন যেন হঠাৎই বলে উঠলেন— 'তা তো হল, কিন্তু আমি এখন কী নিয়ে বাঁচব?'

একে অনেক

সত্যজিতের সত্তর? শুনেই বলি : ধুত্তোর!
সত্যজিৎ তো চিরযুবক, বয়েস কে তাঁর গুনছে?
যা ইচ্ছে তাই বলে দিলেই গুলবাজি কে শুনছে?
কী করে হয় সত্বর, সত্যজিতের সত্তর?

সত্যি বলতে কী শ্রীসত্যজিৎ রায় আমাদের এক মহান এবং অদ্বিতীয় সমস্যা। তাঁকে আমরা প্রায় দেবতা বানিয়ে ফেলেছি, আর দেবতার তো বয়েস বাড়ে না। সত্যজিৎ রায়ের সত্তর বছর বয়েস হচ্ছে, এটা যেন মনে মনে ঠিক মানতে ইচ্ছে করছে না। আবার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের সত্যজিৎ দাপটে ('কী দাপট!') অন্তত এক-শো বছর বাঁচুন, এটাও ভাবতে খুব ইচ্ছে করে। অনন্তকাল ধরে সমানভাবে কর্মক্ষম থেকে, হাসিখুশি মনে তিনি প্রোফেসর শঙ্কু আর ফেলুদার কর্মকাণ্ড ফেঁদে চলুন, আর মনের সুখে নিত্যি নতুন চলচ্চিত্রী পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান— এটাও তো প্রত্যেকটি শিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরই মনে ইচ্ছে। সবারই মনে এক ইচ্ছে, কেননা সকলেই একটামাত্র লোককে নিয়ে জগৎ জুড়ে গর্ব করি। কুমিরছানার গপ্পর মতন ওই তো একটাই ব্যক্তিত্বকে বার বার তুলে ধরি পৃথিবীর সামনে।

সেই সত্যজিতের সত্তর হল। বেশ। হল তো হল। এত ধুমধাড়াক্কা করে মনে করিয়ে দেবার দরকারটা কী, তা তো বুঝি না। দুদ্দুর— সত্তর আবার শিল্পীর জীবনে একটা বয়েস? রবীন্দ্রনাথ, চ্যাপলিন, পিকাসো প্রত্যেকেই আশিতেও যুবক ছিলেন, সৃষ্টিশীল ছিলেন, আমাদের সত্যজিৎও থাকবেন। তবু, সত্তর নিয়ে একটা হইচই বাধানো নশ্বর সত্যজিৎ তো নট নন যে দেহপটই তাঁর ম্যাজিকের উৎস। তাঁর ম্যাজিক মাথার মধ্যে। মাথার মধ্যে সত্তর বছরকে পৌঁছুতেই দেননি সত্যজিৎ রায়, কোনো শিল্পীই দেন না। কতরকমের সত্তরই তো দেখছি। সত্তরের কাছে পৌঁছুনোর আগেই দেখেছি তরুণ তুর্কিদের খিটখিটে বৃদ্ধ হয়ে যেতে। আর আশির কাছে পৌঁছেও তরুণ শিল্পীকে দেখছি সাদা চুলদাড়ি নিয়ে খালি পায়ে দাপিয়ে বেড়াতে। সত্যজিৎ চিরদিনই অসুস্থ, স্থিতধী, শান্ত। বিদ্রোহী রণক্লান্ত হওয়ার ধরনই তাঁর নয়। তিনি ঠিক সেইভাবে রণহুংকার ছেড়ে 'যুদ্ধ' করেননি কোনোদিন। তাঁর শিল্পকে তিনি দ্বৈরথের মাঠ করে তোলেননি, বরং করেছেন ধ্যানের তপোবন, বা একটি উচ্চস্তরের ল্যাবরেটরি। যেখানে একটি তীক্ষ্ণ মেধাবী মানুষ নিজস্ব নিয়মমাফিক আপনমনে শিল্পের বিচিত্র ক্ষেত্রে সাহসী পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান। চিত্রনাট্য তৈরিতে, ফোটোগ্রাফিতে, সংগীত ব্যবহারে, অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজসজ্জায়, মেকআপে, তাদের অভিনয়ের মাত্রা নির্দেশ করায়, বহিঃপ্রকৃতির ডিটেলে এবং অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার ডিটেলে সমানভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর দিয়ে, ক্যামেরা ব্যবহারের নতুনত্বে, একসঙ্গে এক-শোটা দিকে নজর

দিয়ে, আস্তে, আলতো হাতে, পুরোনো খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে চলচ্চিত্রের এক নতুন রূপকে তিনি সাবধানে, ভালোবাসার সঙ্গে বের করে এনেছেন একের পর একটা ছবিতে।

ভাঙায় নয়, গড়ার দিকেই তাঁর নজর। গড়তে গিয়ে আপনা-আপনিই ভেঙে গেছে অনেক কিছু, যার দিন ফুরিয়েছে। ঝড়ের রাত্রে মৃত্যুদৃশ্যে প্রদীপ নিবু নিবু হয়েও নিবে যায় না, শোকের কান্নার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে করুণ বেহালা বাজে না। বরং মানুষের কান্নার পরিবর্তে শোনা যায় আর্ত তারসানাইয়ের তীব্র সুর। বিনা মেকআপে অভিনেতা অভিনেত্রীরা ক্যামেরার সামনে আসেন, ক্যামেরাতে চুনিবালার প্রতিটি বলিরেখা যেন কথা কয়ে ওঠে। পুকুরে জলফড়িঙের সেই প্রসিদ্ধ লাফ থেকে শুরু করে বনের মধ্যে ঢাকের ওপর একফোঁটা জল পড়ার সুরেলা শব্দ— প্রত্যেকটি নিখুঁত পরিকল্পনার মধ্যে তিনি আস্তে আস্তে বদলে দিয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুখচ্ছবি। কিন্তু তাঁর স্টাইলটা চীৎকৃত নয়, বুক চাপড়ে চ্যালেঞ্জ জানানো নয়, নাকাড়া বাজিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা নয়।

তুলিতে, মলাট আঁকার জগতেও তিনি এমনই শান্তভাবেই রুচির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। আর কলমেও তিনি যে অভিনবত্ব এনেছেন, তা এমনই নিঃশব্দে যে, খেয়ালই হয় না যে তিনি কোনো ঐতিহ্যকে ভেঙে গড়ছেন। হোমস-ওয়াটসন, বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ-অজিত, সর্বত্রই সমবয়সি যুবক-জুটির দেখা পাই। কিন্তু সহকারীটি বয়সে যুবক হলেও কার্যত বালকপ্রায়। কিন্তু তোপসের বেলায় সে ঠিক যা, তাই-ই। যুবক গোয়েন্দার এই প্রথম হল কিশোর সহকারী আর পুরো ঘটনাটা দেখা হতে লাগল সেই স্কুলপড়ুয়া চোদ্দো বছরের ছেলের চোখে। তাদের সঙ্গে জুটে গেলেন চল্লিশ বছরের লালমোহন গাঙ্গুলি। এমন অসমবয়সি তিনজনের দল আগে আমরা দেখিনি। বালক, যুবক, প্রৌঢ়। মানবজীবনের প্রায় সবটা জুড়েই বিছিয়ে আছে তিনজনে। (আছেন এক বৃদ্ধ, এনসাইক্লোপিডিয়াও, অন্তরালে।) নেই শুধু কোনো নারী। ফেলুদা এবং অধ্যাপক শঙ্কুর জগৎ নারীবিবর্জিত। আমার কাছে এটা একটা মস্ত ধাঁধা। সত্যজিতের চলচ্চিত্র প্রায়ই নারীকেন্দ্রিক (দৃষ্টিটা যদিও নিতান্তই পুরুষের) অথচ তাঁর সাহিত্যে কোনো নারীকে তিনি সৃষ্টি করেননি। কেন এমন? যাই হোক, গোয়েন্দা গল্পের তিনবয়সি তিনজনের মধ্যেই সত্যজিৎ কিছুটা করে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন।

'জটায়ু' পেশায় গোয়েন্দাকাহিনি রচয়িতা, যদিও ফেলুদার গল্প শোনায় তোপসে। 'জটায়ু'র মধ্যে কি সত্যজিৎ নিজেকে নিয়েই একটু হাসিঠাট্টা করেননি? 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' কি 'ভ্যাঙ্কুভারের ভ্যাম্পায়ার'-এর চেয়ে কম? তোপসের লেখকের চোখ তো তাঁরই কাছে ধার করা। আর ফেলুদার (ভালো ছবিও আঁকে ফেলুদা, আর ইনডোর গেমস খেলতে ভালোবাসে, ঠিক সত্যজিতের মতো, আর গান-বাজনাও খুব ভালো বোঝে।) মধ্যেও তো ঢুকে বসে আছেন খানিকটা। তোপসের মধ্যে যেমন সব ছোটো ছেলেই নিজেকে দেখতে পায়, লালমোহনের মধ্যে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত মাঝবয়সি বাঙালিরা আমাদের ভিতরের মুখের ছায়াটি দেখি। একটু ভীতু, একটু লোভী, একটু টেকো, মোটামুটি হার্মলেস। ফেলুদার মতো অলরাউন্ডার 'হিরোয়িক হিরো'কেও দু-পাশে জটায়ু আর তোপসেকে দিয়ে স্যান্ডুউইচ বানিয়ে অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য ঘরোয়া করে ফেলেছেন সত্যজিৎ। এখন জটায়ু-তোপসেকে বাদ দিলে ফেলুদাকে আর চেনা যাবে না। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনিকে এই নতুন 'ত্রিমাত্রিক' ছাঁচে ফেলার কৃতিত্ব সত্যজিতের।

তাঁর সমস্ত কাজেই নিশ্ছিদ্র মনোযোগ, ত্রুটিহীন অনুপুঙ্খের দিকে নজর, জ্ঞান, বুদ্ধি, পরিশ্রম

ও কল্পনার সুসমঞ্জস মিশ্রণের স্পষ্ট ছাপ। ক্ষেত্রটা যাই হোক, বিজ্ঞাপন বা মলাট, চিত্রনাট্য বা সংগীত পরিচালনা, গোয়েন্দা গল্প বা চলচ্চিত্র নির্দেশনা। অতিরিক্ত আত্মসচেতন শিল্পী সত্যজিতের কাজের ধরনই অমনি নিখুঁত। দান্তের মতো 'জীবনের মধ্যপথে' পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'পথের পাঁচালী' উপস্থিত করেছিলেন। এখন তো এমন অবস্থা, স্বদেশ আর বিদেশ থেকে যেখানে যার যা কিছু দেবার বস্তু ছিল, পুরস্কার-তকমা-ডিগ্রি ডিপ্লোমা-মেডেল অ্যাওয়ার্ড সবাই সব কিছু নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে কলকাতাতে এসে সত্যজিৎ-এর যোগ্য হাতে তা তুলে দিয়ে তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে নিজেরা উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরে যান। ফিল্মের দৌলতে তিনি ভারতের দোরে হাতি না হোক সোনারুপোর ভল্লুক বেঁধেছেন। কলকাতার দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে (বিদেশিদের তালিকায়) মাদার টেরিজা, আর সত্যজিৎ রায়কে গোনা হচ্ছে অনেকদিনই।

অবাক লাগে এত যশ আর দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি পাবার পরেও সত্যজিতের সহজ আত্মস্থতা দেখে। স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধ, যা তাঁর শিল্পীসত্তাকে অসামান্য করেছে, তাই-ই তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্বকেও অসামান্য করে তুলেছে। সারা পৃথিবীর এই প্রশ্রয়ে প্রশংসায় একটুও আত্মহারা হননি। এখনও টেলিফোন ডিরেক্টরিতে এনলিস্টেড নয় সত্যজিৎ রায়ের নাম। অথচ সিনেমা লাইনে চুনোপুঁটিরাও চটপট এনলিস্টেড হতে পছন্দ করেন। নিজের কাজের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার জন্য নিজেকে লোকোত্তর প্রাণী বলে মনে করতে শুরু করেননি সত্যজিৎ। চেষ্টাকৃত কৃত্রিম দূরত্বের বেড়াজালে বন্দিও করেননি নিজেকে।

এবার সম্পাদক সত্যজিৎ রায়কে দেখি। এত বিখ্যাত এবং এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লেও তিনি 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যেভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, এটা সত্যিই পরম আশ্চর্য। মাত্র দু-চার বছর আগেও পুজোর আগে এবং বৈশাখ সংখ্যার আগে, নিজে ফোন তুলে লেখকদের অনুরোধ জানাতেন, 'লেখা দিতে হবে কিন্তু!' এত অসুস্থতার পরেও তিনি প্রতিটি লেখা নিজে পড়তেন এবং সঙ্গের ছবি এঁকে দিতেন, যেগুলোতে ওঁর ইচ্ছে করত। সম্পাদকীয় সৌজন্যে তাঁর তুলনা হয় না।

একবার একটা রুশ রূপকথা অবলম্বনে গল্প দিয়েছিলাম 'সন্দেশ'-এ। সম্পাদকের ফোন এল 'বাবা য়াগা শব্দটা উচ্চারণ করতে ছোটোদের হয়তো অসুবিধা হবে, "বাবা ইয়াগা" লিখলে আপত্তি আছে?' এই সামান্য ই-কার যোগ করার জন্যও কষ্ট করে লেখকের অনুমতি নেওয়ার যে সৌজন্যবোধ, এই সত্যজিৎ রায়ের বৈশিষ্ট্য। ওই মাসেই অন্য একটি ছোটোদের কাগজে আমার একটি রূপকথার শিরোনাম পালটে দেওয়া হয়েছিল, আমাকে কিছুই না জানিয়ে। তাতে আমার গল্পের রসভঙ্গও হয়েছিল। ওই পরিবর্তনের প্রয়োজনটাও ঠিক বোঝা যায়নি। সম্পাদনার খেয়ালখুশি।

তরুণ কবিশিল্পীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে সত্যজিতের। যখন হাতে সময় থাকে তখন তাদের সময় দেন, উৎসাহ দেন। উন্নাসিক, অহংকারী, অমিশুক বলে তাঁর সম্পর্কে ধারণা আছে, যেহেতু তাঁর শিল্পকর্ম উন্নাসিক, শিল্পের অহংকারে ভরা। অথচ জয়ন্ত, শিশির, গৌতম ইত্যাদি অনেক ছেলেকেই আমি চিনি যাঁরা একপাতার লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবেই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্য কোনো পরিচয়ে নয়।

তুচ্ছ মেয়ে আমাকেই তো কত সহজে সস্নেহে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ওঁরা

দুজনে। মংকুদির আর আমার বিকট হাঁপানি আমাদের একটা মুখ্য যোগসূত্র অবশ্য। এত রকম-বেরকমের অসুখ শরীরে পুষেও আমি কেমন করে এত লম্ফঝম্প করে বেড়াই এ নিয়ে ওঁদের দুজনের যেমন বিস্ময় তেমনি আহ্লাদ। আমার, একা একা কুম্ভমেলায় যাওয়া, র‍্যাশনট্রাকে হিচ হাইক করে তাওয়াং যাওয়া, তেল কোম্পানির এরোপ্লেনে ফ্রি রাইড (হিচহাইকিং?) নিয়ে উত্তর মেরু ভ্রমণ, এইসব পাগলামির গল্প প্রত্যেকবার ঘুরে আসার পরে যখন বলি, ধৈর্য ধরে বসে মন দিয়ে প্রশ্ন করে শুনেছেন সত্যজিৎ, আর হাসতে হাসতে বলেছেন : 'এই মেয়েটাকে আমার হিংসে হয়।' ওই কথাটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো কমপ্লিমেন্ট। বিশ্বসুদ্ধ লোক যে-মানুষটাকে অনাবিল হিংসে করে থাকে, সেই মানুষটি স্বয়ং ঠাট্টা করে হলেও আমাতে তো হিংসে করেছেন বাপু? হলেই-বা তা স্রেফ উড়নচণ্ডেপনার 'গুণ'-এ?

মজা হয়েছিল আমার বাবার এক-শো বছরের জন্মদিনে, যখন সত্যজিৎ নত হয়ে আমার মাকে নমস্কার জানালেন। মায়ের বয়স তখন পঁচাশি, দুই চোখে ছানি পড়ছে। মা বললেন, 'এই ছেলেটি কে খুকু? চিনতে পারলুম না তো?' ১৯৮৮তে কলকাতা শহরে সত্যজিৎ রায়কে কেউ 'এই ছেলেটি' বলে উল্লেখ করবে এবং মোটে চিনতেই পারবে না, এই দুটি ঘটনাই বাস্তবে প্রায় অবিশ্বাস্য। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। নামটা বলতেই মা একগাল হেসে সত্যজিতের হাতদুটি সস্নেহে ছোটোছেলের মতো করেই নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওহো, তুমি অমুকদির ছেলে? তোমার মা অতি মহৎ মানুষ ছিলেন, তাঁর মতো গুণী, আর সাহসী মহিলা খুব কমই দেখেছি। জানো, আমরা ছেলেবেলায় তাঁর কাছে এমব্রয়ডারি শিখতে যেতুম?' তারপরে, হঠাৎই বোধ হয় বর্তমান ব্যক্তিটির আরেকটি পরিচয় মনে পড়ে গেল মা-র তখন— 'আর, তুমি তো বাবা আমাদের দেশে গৌরব'— ইত্যাদি। সেই মুহূর্তে, যখন 'তরুণ' সত্যজিৎ সযত্নে কান পেতে হেঁট হয়ে আমার শুভ্রকেশী মায়ের মুখে, নিজের পরলোকগতা মায়ের অল্প বয়সের গল্প শুনছিলেন, তখন তাঁর চোখ-মুখের নরম ভাবটিতে তাঁকে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন, ছেলেটি। আজকে মা নেই। থাকলে দেখতেন, সেই ছেলেটিরও সত্তর হল।

১ মে ১৯৯০

একাই এক-শো

'এমন সুযোগ আর পাবি না, এক-শো বছর বয়স্ক একজন মানুষের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাবি তো চল!'

ঘর ভরতি টুম্পার বন্ধুবান্ধব— রব উঠল, 'খবরদার না। খেপেছিস! ওই পোশাক পরে গেলে তোকে খেয়েই ফেলবেন। বাঙালি মেয়েদের সালোয়ার পরা নিয়েই খুব খারাপ কথা লিখেছিলেন।'

'তখন তোমরা কেউই জন্মাওনি—' আমি মাভৈঃ দিই, 'সে অনেক আগের কথা। চল চল— যেমন আছিস, কিছু হবে না।'

'হবে হবে। ওইরকম জিন্‌স পরে, ওই ট্যাঙ্ক-টপ পরে যাও না, দেখবে বুড়ো কী বলে।'

'থাক, মা, তুমি যাও— আমার আর গিয়ে কাজ নেই!' টুম্পার চোখে অস্বস্তি।

'কী পাগলামি করছিস! এমন একটা জীবন্ত কিংবদন্তিকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ ছেড়ে দিতে আছে?'

'সে তো সাহেবরা, আর আনন্দবাজার ওঁকে কিংবদন্তি বানিয়েছে।'

'মোটেই কাজটা অত সোজা নয়। ওঁর এলেম আছে বলেই না? চল চল বাজে কথায় কান দিস না।'

'থাক বাবা— গিয়ে কাজ নেই—' টুম্পার মুখে সেই ভদ্দরলোকের এক কথা।

'কী পরে যাব? আর তো অন্য কোনো পোশাক নেই— উনি যদি অফেনডেড হন—'

'এই তো, আমার শালটা ভালো করে জড়িয়ে নে না।'

'শোন টুম্পা, যদি-বা যাস— খবরদার যেন ওঁকে বলিস না তুই ফিল্মে কাজ করছিস! তায় আবার হিন্দি ফিল্মে— বেজায় কনজারভেটিভ কিন্তু, যা-তা বলে অপমান করে দেবেন।'

'ওরে বাবা! আজ থাক, মা?'

আর এক বন্ধু বুদ্ধি দেয়— 'ওসব বলবি কেন? তুই বলবি তুই স্টুডেন্ট। সেটাই তো তোর প্রকৃত পরিচয়! বলবি তুই আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি অব সদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিল্ম স্টাডিজ পড়ছিস, হার্ভার্ডের ম্যাগনা-কুম-লাউডে, ফাই-বিটা-কাপ্পা, এইসব ঝাড়বি, দেখবি খুব ইমপ্রেসড হয়ে গেছেন।'

আমি হাঁ হাঁ করে উঠি, 'ওরে টুম্পা তোকে ওসব কিচ্ছু বলতে হবে না, ওঁকে ইমপ্রেস করবার জন্যে তোকে নিয়ে যাচ্ছি না, তুই নিজে একটা ইমপ্রেশন পাবি, সেইজন্যে।'

কিন্তু বন্ধুরা ছাড়ে না, 'আর ভুলেও যেন বলে ফেলিস না তুই সাহেব বিয়ে করেছিস। উনি কিন্তু এসব মিক্সড ম্যারেজ একদম পছন্দ করেন না! বিয়ের প্রসঙ্গটা স্রেফ চেপে যাবি।'

টুম্পার অবস্থা করুণ! আমিও হাল ছাড়ি না।

'দেখ যেকোনো একজন এক-শো বছর বয়সি চিন্তাশীল মানুষই দর্শনীয়। আর নীরদচন্দ্র চৌধুরী যেকোনো বয়সেই দর্শনীয়। ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স। টুম্পা, এই শালটা জড়িয়ে নিয়ে চলে আয় আমার সঙ্গে— এ চান্সটা ছাড়িস না। পরে সবাইকে বলতে পারবি তুই নীরদবাবুকে মিট করেছিস।'

'আমি কি যাব না বলছি? সবাই মিলে যে ভয় দেখাচ্ছে! গিয়ে অপমানিত হতে চাই না, সে এক-শো বছরই হোক আর দেড়শো বছরই হোক। আমি যা করি, তা বলা যাবে না; যা পরি, তা পরা যাবে না; বরের কথাও লুকিয়ে রাখতে হবে; এসব ভীষণ কষ্টকর, স্ট্রেনুয়াস— যদি তিক্ততা নিয়ে ফিরে আসতে হয়, তার চেয়ে না দেখা ভালো।'

আমি মরিয়া, অথচ তর্কের খাতিরেও মেয়েকে অভয় দিতে পারছি না। নীরদবাবুকে 'নিরীহ প্রাণী, ভয় নেই' বলতে পারছি না। একদিক থেকে বড়োই আনপ্রেডিকটেবল, যদিও আর একদিক থেকে খুবই প্রেডিকটেবল। দুর্বল তর্ক জুড়ি।

'আচ্ছা— যদি তোকে কিছু বলেনই! তোর কি তাতে গায়ে ফোসকা পড়বে? মান-অপমানের প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখা যায় না? চোখে তো দেখতে পাবি মানুষটা কেমন? ভালো লাগুক আর মন্দ লাগুক দুটোই তো জরুরি এক্সপিরিয়েন্স।'

মেয়ে গোঁজ হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না। তাহলে আমার এত ইচ্ছে সত্ত্বেও টুম্পা যাবে না! নিজেই ঠকবে।

'ঠিক আছে, ছেড়ে দে। তোরা যা কচ্ছিস কর, আমি চলি।'

বোধ হয় গলাটা অভিমানে ধরে এসেছিল। আমার মমতাময়ী কন্যার কী হল, দৌড়ে এল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও। কই, শালটা দেবে বলছিলে? দাও?'

অবশেষে মা-র মন ভালো রাখতে, জিন্‌সের ওপরেই লম্বা-চওড়া শালটা জড়িয়ে টুম্পা চলল আমার সঙ্গে লাথবেরি রোডের দিকে। পথে মহানন্দে ওকে জ্ঞান দিতে থাকি।

'চুপচাপ শুনে যাবি। হ্যাঁ-না কিছু বলতে হবে না। কোনো কথার ভুলেও প্রতিবাদ করবি না, সে যতই আপত্তিকর কথা বলুন। এই গ্রহে এক-শো বছর বসবাস করলে মানুষের যা-খুশি বলবার অধিকার জন্মে যায়, বুঝলি?' যদিও নীরদবাবু পঞ্চাশ বছর ধরেই সেই অধিকার প্রয়োগ করেছেন। সেকথা টুম্পাকে বলার দরকার নেই।

'মন্দ লাগার চান্স আছে। উনি রেখে-ঢেকে কথা বলেন না, কার কী মনে হবে, মনে কষ্ট হবে কি না, এসব ভাবেন না। আবার ভালোও যে লাগবেই সেটা জোর দিয়ে বলতে পারি। ভালো না লেগে উপায় নেই। তোর সারাজীবনের স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে এই বিকেলটা।'

'কিন্তু ফিল্ম বলা বারণ, বিয়ে বলা বারণ, শাল খোলা বারণ।'

'শালটা খুলিস না। কিন্তু ফিল্ম-টিল্ম বলিস। দেখাই যাক না, ওঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়। তোর বিয়ের কথাও আমি বলব। লুকোছাপার কী আছে? ওঁর ছেলের তো শ্যামদেশের বউ।'

আমি ভেবেছি কয়েকটা প্রশ্ন করব ওঁকে। এক-শো বছর বয়সি আর কোনো মানুষকে তো চিনি না। ১৯৮৮-তে আমার বাবার জন্মশতবার্ষিকী হল, মনে হচ্ছিল বাবা অলরেডি কত দূরের মানুষ। আর নীরদবাবুর ছেলেদের কী সৌভাগ্য, তাঁর জীবিত পিতার শতবার্ষিকী করতে পারছেন। বিশ নম্বর লাথবেরি রোডের বাগানটা দেখে বুঝতে পারলুম নীরদবাবুর এক-শো বছর বয়স

হয়েছে। বাগান জংলি হয়ে উঠেছে। এই বাগানেরই অন্য চেহারা দেখেছি তিন বছর আগেও। আর একচল্লিশ নম্বর হেয়ার ফিল্ডের বাড়িতে তো অপূর্ব বাগান করেছিলেন নীরদবাবু। ওঁর আঙুলে জাদু আছে, ফুল ফোটাতে উনি জানেন। এই অযত্ন-লালিত বাগানটি দেখলে ওঁর বাড়ি বলে মনে হয় না। আগাছায় আর ফুল গাছে নির্লজ্জ জড়াজড়ি এখানে। একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখে ইজিচেয়ার পেতে বই হাতে করে বসে আছেন, নীরদবাবুর ছোটোভাই ডা. ক্ষীরোদ চৌধুরী। নাঃ ওটি বুঝি ওঁর দাদা চারুচন্দ্র চৌধুরী? দুজনেই অবশ্য বহুকাল স্বর্গে গেছেন। আমার বাবা-মার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁরা দুজনেই। নীরদবাবুর সঙ্গে আমার বাবা-মায়ের বন্ধুত্ব ছিল বলে জানি না।

'আমি ধ্রুব—' এগিয়ে এসে বললেন চারুচন্দ্র-ক্ষীরোদচন্দ্রের আদলমাখা নীরদচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। মেজোছেলে কীর্তিনারায়ণকেও দেখেছি। তাঁকে অন্য ধরনের দেখতে। ধ্রুব পিতৃবংশের ছাপটি পেয়েছেন। ইনিই বাবার ইংরিজি কাগজপত্র গুছিয়ে, গ্রন্থাকারে বের করেছেন দুটি বই।

'আমি নবনীতা। আর এটি আমার মেয়ে নন্দনা।'

'আসুন, বাবা নীচেই।'

ফোন করে আসিনি। শুনেছিলুম উনি ইদানীং কানে ভালো শোনেন না, ফোনে কথা বলতে অসুবিধে হয়, পাঁচটা নাগাদ এলে ওঁকে পাওয়া যায়। ওই সময়ে উনি অতিথিদের সঙ্গে দেখা করেন। ধ্রুবনারায়ণ এখন আছেন জানলে ফোন করেই আসা যেত। আর একটু আগে।

দরজা খোলাই ছিল। ভিতর থেকে গানের সুর ভেসে লাগছে। রবীন্দ্রসংগীত। এর আগেও এই লাথবেরি রোডের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে এমনিভাবেই সংগীতের দ্বারা প্রথমে আপ্যায়িত হয়েছি। সেদিন ছিল পাশ্চাত্য সংগীত। আজ বাজছে— 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।' টুম্পা আর আমি আপনা থেকেই পরস্পরের দিকে তাকাই। এই গানটি কি কোনো ইঙ্গিত দিল আমাদের?

ধুতির ওপরে নেভিব্লু হাত পুরো পোলোকলার সোয়েটার— পায়ে জুতো মোজা পরে নীরদবাবু বৈঠকখানা ঘরে গান শুনছিলেন। আমরা ঢুকতে মুখ উজ্জ্বল হল, গান বন্ধ করে দিলেন।

প্রণাম করে বললুম, 'আমি নবনীতা।'

'আমি শুনেছি আপনি অক্সফোর্ডে এসেছেন।'

'এ কী, মেসোমশাই। আমাকে আপনি বলছেন কেন?'

প্রথম পরিচয়েও উনি আমাকে 'আপনি' বলেননি, ভাববাচ্যে কথা বলেছিলেন। মাসিমা সোজা 'তুমি' বলতে উনিও সহজ হয়ে 'তুমি' বললেন। এত বছর, প্রায় পঁচিশ বছর 'তুমি' বলেছেন। আজ হঠাৎ 'আপনি'।

'প্রথমে "আপনি" বলাই ভালো, যতক্ষণ-না কেউ নিজে থেকে "তুমি" বলতে বলছে।' তবু স্বীকার করলেন না— ভুল করে আপনি বলে ফেলেছি। পাশে দাঁড়ানো "শাল মুড়ি দিয়ে হ-ক্ষ"-র মতন টুম্পার দিকে তাকাতে, সে নত হল প্রণামে। প্রণাম সেরে উঠতে, তাকে বললেন, 'প্যান্ট পরে প্রণাম মানায় না।'

মেয়ে তাকাল আমার দিকে। দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করল বলাই ঠিক। আমি নিজের মান রাখতে তাড়াতাড়ি বলি, 'বাঃ! তাহলে ছেলেরা যখন আপনাকে প্রণাম করে, তারা কী পরে আসে?'

নীরদবাবু শুনলেন কি না জানি না। উত্তর না দিয়ে আমাদের বললেন, 'বোসো।' তারপর জানলার দিকে একটি সোফা দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এখানে বোসো।' টুম্পা আমার পাশেই বসতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিলেন। বেচারি ঘাবড়ে গেল।

'ওখানে না,' বলে বইয়ের শেল্‌ফের কাছে অন্য একটি সোফায় হাত দিয়ে, সস্নেহে ডেকে টুম্পাকে বললেন, 'তুমি এইখানে এসে বোসো।' নিজে বসলেন দুজনের মাঝখানে একটি সোফাতে। এতে তাঁর কী সুবিধে হল জানি না। অনবরত একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলতে হল। উনি অবশ্য পাখির মতন টুক টুক করে চলেন ফেরেন মাথা ঘোরান এদিক-ওদিক। হয়তো ওঁর কোনো অসুবিধে হয় না। এত হালকা-পলকা বলেই এত সচল, চঞ্চল। এবার আমি বলতে গেলুম, 'এটি আমার ছোটো—' কিন্তু আমার বাক্য শেষ হবার আগেই উনি মাথা নেড়ে হাত নেড়ে আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'জানি, জানি, জানি!' এতে রীতিমতো বিচলিত হয়ে আমরা মা-মেয়ে আবার চোখাচোখি করি। কী জানেন, কে জানে?

'আমার জীবনে ইচ্ছে ছিল একটি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ লিখবার, কালচারাল হিস্ট্রি— সেটা যখন বুঝলাম আর হবে না, তখন আমার বয়স পঞ্চাশ। নাইনটিন ফর্টি সেভেন—। তখন আমি আত্মজীবনী লেখায় হাত দিলাম।' এতদূর বলে তিনি একবার টুম্পার দিকে একবার আমার দিকে তাকালেন। আমি যেসব প্রশ্ন করব ভেবে এসেছিলুম, সব আটকে গেল। দুম করে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে বিনা ভূমিকায় উনি আজকের বিকেলের সভায় বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

টুম্পার বন্ধুদের উদ্‌বেগ, দুর্ভাবনা, সবই বৃথা। উনি টুম্পার নামটা পর্যন্ত জানতে চাইলেন না। সে কী যে করে, কোথায় থাকে— সেসব দূরে থাক, আমি এবারে কেন এসেছি, কবে এলুম, কতদিন আছি, কোথায় আছি এসব অতি সাধারণ প্রশ্নও নয়। বর্তমান অতিথিদের বিষয়ে তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। আমাদের প্রতি আচরণে তাঁর স্নেহের অভাব ছিল না, সৌজন্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু কোনো জিজ্ঞাসাও ছিল না তাঁর মনে আমাদের সম্পর্কে।

'পঞ্চাশ বছর বয়সে লিখতে শুরু করেছি। যদি বেঁচে থাকি, তবে তেইশে নভেম্বর নাইনটিন নাইনটি সেভেনে আমার বয়েস এক-শো বছর পূর্ণ হবে। যদি বেঁচে থাকি।' পুনরাবৃত্তি করলেন।

'নিশ্চয়ই থাকবেন।' বলে আমি ওঁর জন্যে যে উপহারটি নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটি দিই। উনি ধন্যবাদ দিয়ে বান্ডিলসুদ্ধু টেবিলে রেখে দেন। খোলেন না। জন্মদিনে খুলবেন সম্ভবত। এই সুযোগে আমার প্রশ্নগুলি যদি— কিন্তু পুনরায় :

'লিখে রুজিরোজগার করা, এ কর্ম খুব কম লোকই করতে পারে। আমি গত চল্লিশ বছর শুধু লিখেই জীবনধারণ, সংসারচালনা করেছি।' নীরদবাবু আবার কথা শুরু করেন। আমার আর প্রশ্ন করা হয় না। টুম্পাকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই শেল্‌ফ থেকে ওই ছবিটি পেড়ে আনো দেখি।'

রঙিন ফোটোগ্রাফটি মাসিমার।

'তুমি এঁকে দেখতে পাবে না। তোমার মা এঁকে দেখেছেন।' মাসিমা অমিয়া চৌধুরানির মধ্যে যে 'রানি'টি ঢুকে আছে, সেই রাজসম্মান তাঁকে দিয়েছেন তাঁর অবিচল ভক্ত, নিরবচ্ছিন্ন প্রজা নীরদচন্দ্র। নীরদবাবুর সমস্ত রচনায় তাঁর পত্নীপ্রেম, পত্নীশ্রদ্ধা ফুটে আছে। এদিন টুম্পার সঙ্গে

কথাবার্তার মধ্যে আবার দেখলুম সেই উজ্জ্বল সঘন ভালোবাসা। গতবারে মাসিমাকে দেখতে এসে দেখে গিয়েছিলুম সাতানব্বই বছর বয়সের স্বামীটি কীভাবে তরুণ স্বামীর মতো পত্নীর সেবা, রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এবারে ওপরে যাবার প্রশ্ন নেই। কিন্তু মাসিমা ছেয়ে আছেন আলোবাতাসের মতো নীরদবাবুর অস্তিত্বকে।

ছবিটি পার্কের মধ্যে তোলা, ঘাসের ওপরে কিছু হাঁস, মাসিমা তাদের খাওয়াচ্ছেন। ছবিটি টুম্পার হাতে আমার হাতে ঘুরল।

'উনি সকালে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, ভোরবেলায়, অন্ধকার থাকতে। এটি অবশ্য বেলার দিকে তোলা। এখন আর ওই সময়ে নদীর ধারে মেয়েরা যেতেই পারে না, অক্সফোর্ড আর সেফ জায়গা নেই। অথচ উনি নির্ভয়ে— অন্ধকারে—'

আমার খেয়াল হল তখন মাসিমার বয়সটা প্রায় আশি বছর। সেটা নীরদবাবুর কাছে কোনো 'কারণ' বলে গ্রাহ্য নয়। বয়স যাই হোক, উনি একটি মেয়ে।

'এবার ওই ছবিটা দাও।'

এই ছবিটা আর একটু ছোটো। সিপিয়া রঙের। এখানে মাসিমাও অনেক ছোটো।

'এটা দিল্লিতে তোলা। পুরোনো দিনের ছবি। আমার ছেলের তোলা।'

ছেলে, ধ্রুবনারায়ণ, এখনও বাবার ছবি তোলেন। ওঁর বইয়ের মলাটে যত ছবি দেখেছি সবই প্রায় ধ্রুবনারায়ণের তোলা। ছবিগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার পরে নীরদবাবু টুম্পার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলো দেখি বাঙালি মেয়েদের জীবনে প্রেম আর পাতিব্রত্য এই দুটো ব্যাপার এক কি না?'

আমরা কিছু ভেবে ওঠার আগেই আবার নিজেই উত্তর দিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি এক নয়। দুটি ভিন্ন উপলব্ধি, ভিন্ন অনুভূতি। জীবনে দুটো একসঙ্গে পাওয়া শক্ত, এমনকী সাহিত্যেও দুটোকে এক করে দেখা হয়নি বিশেষ। বাংলা সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বঙ্কিম এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই নিয়ে লিখে গেছেন। নারীর জীবনে প্রেম ও পাতিব্রত্য এক নয়। ইংরাজি সাহিত্য থেকে প্রেম এল সাহিত্যে। তার আগে প্রেম ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের দশটি উপন্যাস প্রেমের কাহিনি, একটি শুধুই পাতিব্রত্য ও সতীত্বের, তিনটিতে আছে প্রেম ও পাতিব্রত্যের সংঘাত। ''বিষবৃক্ষ''-র সূর্যমুখীকে মনে আছে?'

এই লেকচারে আগ্রহী হলেও কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল টুম্পা— এবার 'সূর্যমুখী' শুনে ঘাড় নাড়ল। মনে আছে।

'রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পে প্রেম ও পাতিব্রত্যের সুষ্ঠু সমাহার হয়েছে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আমি মনে করি ওটিই একটিমাত্র গল্প, যেখানে এই সমাহার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোথাও এর কোনো আলোচনা দেখিনি। কী সেই গল্প? বলতে পার?'

তাঁর আশানুরূপ অজ্ঞতায় আমাদের যুগল ঘাড় নাড়ে। বলতে পারি না। যদিও—

'দৃষ্টিদান। পড়েছ?'

টুম্পা পড়েনি। আবার ঘাড় নাড়ে।

'তোমার মা পড়েছেন।' যাক বাবা। তবু ভালো। এক্ষুনি যদি ঘোষণা করতেন— 'তোমার মাও পড়েননি—' তাহলে একটু থোড়াবহুত অসুবিধে হত। টুম্পাও গল্পটা পড়েছে। মা-র

বাঁধানো প্রথম সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছ'-র খণ্ডগুলি দুই মেয়ে নিয়ে সারাক্ষণ এঘরে ওঘরে ফেলে রাখত। আমি কুড়িয়ে এনে তুলতুম। গল্পটা বললে মনে পড়বে ওরও।

'দৃষ্টিদান বাংলা সাহিত্যে একমাত্র গল্প যেখানে হিন্দু পাতিব্রত্য, সতীত্ব আর রোমান্টিক প্রেমের মিলন ঘটেছে।'

দৃষ্টিদান গল্পটি নিয়ে ওঁর পক্ষপাতিত্বের কথা আমি জানি। দৃষ্টিদান বিষয়ে ওঁর দীর্ঘ আলোচনা 'বাঙালি জীবনে রমণী' বইতে পড়েছিলুম। আজ তিরিশ বছর বাদে আবার সেই প্রসঙ্গ। সেই প্রিয় উদাহরণ। হঠাৎই নীরদবাবু গড়গড় করে মুখস্থ বলতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্র। তারপর থেমে গিয়ে একটি বই আঙুল দিয়ে টুম্পাকে দেখান। ঘরের মেঝেয় ও টেবিলের ওপর-নীচে প্রচুর বই। থাকে-থাকে সাজানো আছে। একটি থাক থেকে একটি বই উনি আনতে অঙ্গুলিনির্দেশ দিলেন। কিন্তু টুম্পা দু-বার ভুল বইতে হাত দিল। নীরদবাবু অধীর হয়ে উঠলেন। এবার ঠিক বইটিতে হাত পড়েছে। বই আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'অমুক পৃষ্ঠা'। কৃষ্ণকান্তের উইল। খুললুম। তারপর একটি দীর্ঘ গদ্যাংশ স্মৃতি থেকে আবৃত্তি— ভ্রমরের কথা। হুবহু। তার পাতিব্রতের অহংকার। আর একটা বই তুলে দিতে বললেন এবারে টুম্পাকে।

'ওই তো দ্বিতীয় থাকে, মাঝের দিকের লাল বইটা'— 'গোরা'। সুচরিতা, আনন্দময়ী, ললিতা। গোরা থেকেও খানিক অংশ মুখস্থ বললেন। পাতার সংখ্যা বললেন, তাতে ওই প্যারাগ্রাফটি আছে। 'বিষবৃক্ষ' নিয়েও আলোচনা করলেন। হঠাৎ টুম্পা বলে ফেলল— 'কিন্তু ''বিষবৃক্ষ'র সঙ্গে ''গোরা''র এটা কী ধরনের তুলনা?' অধৈর্য হয়ে ভুরু কুঁচকে হাত তুলে উনি বললেন, 'বলছি, বলছি'— অর্থাৎ টুম্পার প্রশ্নটা শুনতে পেলেন। কিন্তু উত্তরটা জানা গেল না। নীরদবাবু কথা বলতে ভালোবাসেন, ওঁর কথার স্রোতে আমাদের যাবতীয় কথা— প্রশ্ন, উত্তর, মন্তব্য— সবই খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। ওঁর চিন্তায় ব্যাঘাত করতে চাই না বলে আমরাও চট করে কিছু বলছি না। ওঁর মধ্যে এই না-শোনা-বাণীর ঘন যামিনী কেন হয়েছে? কবে চালু হল এই একতরফা গাড়ি? আগে এমন ছিল না। উনি দিব্যি বাক্যালাপ করতেন। কথোপকথন হত। তর্কাতর্কিও হত। এখন সেসবের কোনো সুযোগই নেই। এ কি একশত বৎসরের যোগফল? না মাসিমার বিয়োগফল? শূন্য বাড়িতে থাকেন, কথা বলার মানুষ থাকে না, তাই কি? কিন্তু আমার সবসময়ে মনে হয়েছে নীরদবাবু জীবিত মানুষের তোয়াক্কা করেন না। তাঁর যা কিছু বল-সংগ্রহ সবই বই থেকে। আর বই যাঁরা লিখে গেছেন, সেই মৃত মানুষদের কাছ থেকে।

কিন্তু আধুনিক যুগের অধ্যাপককুলের জ্ঞানবুদ্ধিতে ওঁর ঘোরতর সন্দেহ। (যারা ওঁর কাছে আসে, তাদের চেয়ে যে উনি সবই বেশি জানেন, তাতে ওঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, তারা তো শিখতেই আসে শতবর্ষের প্রজ্ঞার কাছে।)

সেদিন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বলতে বলতে হঠাৎই বাংলার অধ্যাপকদের নিন্দে শুরু করে দিলেন নীরদবাবু। তাঁরা কিছুই জানেন না। কিছুই পড়াতে পারেন না। সাধারণ ব্যাকরণ পর্যন্ত জানেন না। বাংলা ভাষাতে কতগুলো টেন্স আছে, তা পর্যন্ত জানেন না।

'তুমি জান? বাংলাতে কতগুলো পাস্ট টেন্স আছে?' টুম্পাকে প্রশ্ন করলেন নীরদবাবু। টুম্পা ঘাড় নেড়ে ফেলল— এটা 'হ্যাঁ'বাচক ঘাড় নাড়া।

সঙ্গেসঙ্গে আঙুল খুলে দেখাল— পাঁচ। কিন্তু নীরদবাবু লক্ষ করলেন না।

'জান না তো? লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমার প্রফেসররাও জানেন না।'

তারপর তুষ্ট মুখে হেসে বললেন, 'পাঁচ। বাংলা ব্যাকরণে মোট পাঁচটি টেন্স আছে। কিন্তু কোনো বাংলার মাস্টার তা জানে না। এই বিদ্যে নিয়েই তো পড়ায়।'

টুম্পার বিচলিত চোখ, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। আমি বেচারি মাস্টারি করে খাই, আর যতবারই আসি, ওঁর কাছে মাস্টারদের নিন্দে শুনে যাই। আর এও তো এক জ্বালা— সেই কোন ১৯৩২-এ কলকাতা ছেড়েছেন, এতদিন দিল্লিতে আর অক্সফোর্ডে বাস করে, এত সব অজ্ঞান বাংলার মাস্টারমশাইদের দেখা পেলেন কোথায়।

এইদিন যতটুকু দেখলুম, মাসিমাতে আর রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র, আর বাকি সময়টা রবীন্দ্রনাথ। একটু বাদেই তার কারণটা বোঝা গেল। রবীন্দ্রনাথে নিমগ্ন তিনি সারাজীবনই, কিন্তু এখন একটু বেশি, কেননা বক্তৃতা তৈরি করছেন।

'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে "দেশিকোত্তম" উপাধি দেওয়া হবে, সেই উপলক্ষে লন্ডনের নেহরু সেন্টারে আমার বক্তৃতা রয়েছে। ওরা লন্ডনে এসেই আমাকে উপাধিটা দেবে, ওদের ভাইসচ্যান্সেলর এসেছিলেন। দু-মাস পরে আমার বক্তৃতা। এখন সেটা প্রস্তুত করছি।'

বলতে বলতেই নীরদবাবুর চোখ ঝলমল করে উঠল। উনি সোজা হয়ে বসে ফরাসিতে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলেন। যাকে বলে উদাত্ত কণ্ঠে, তাই। সঙ্গেসঙ্গে সতর্ক হয়ে কান পাতি। ওঁর পরীক্ষা নেওয়া স্বভাব। কবিতা আবৃত্তিতেই তো শেষ নয়, এর পরে আসবে প্রশ্ন করার পালা। এখুনি জিজ্ঞাসা করবেন, 'কার কবিতা, বল দেখি?'

প্রথম যখন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তখন থেকেই এটা জেনেছি। সারাক্ষণ অন্যকে পরীক্ষা করছেন।

'কী করা হয়?'

'অধ্যাপনা।'

'কোনখানে?'

'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'যাদবপুরটা একটা ধাপ্পা। তা কোন বিষয়টি পড়ানো হয়?'

'কম্প্যারেটিভ লিটারেচার।'

'সেটা আরেকটা ধাপ্পা। বুদ্ধদেব বসুর ধাপ্পা।' বলেই নীরদবাবু একটা ফরাসি কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে দেন। এক স্ট্যানজা আবৃত্তি করে আমাকে ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন ভাষা? কার কবিতা?'

নীরদবাবুর বয়স তখন সত্তরের ওপরে, ১৯৭৩ কি ১৯৭৪ হবে। এই বয়সে এই তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি এবং পরিচ্ছন্ন, নির্ভুল ফরাসি উচ্চারণে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছি। বোদলেয়ারের প্রসিদ্ধ কবিতা, বুদ্ধদেবের অনুবাদও আছে। অবাক এবং বিমোহিত হলেও বিরক্তও হয়েছিলুম যথেষ্ট। অধ্যাপনা করছি, পরীক্ষকের ভূমিকায় চলে এসেছি, এখন 'পরীক্ষিত' হতে ভালো লাগে না।

বিশেষত, যখন এসেছি সামাজিকতার জন্যে, নেহাত সৌজন্যবশত। এই পরীক্ষা করার প্রবৃত্তিটা ওঁর চিরকালের। অন্যকে বোকা বানিয়ে উনি মজা পান। এখন খেলাটা বুঝেছি। কিন্তু সেদিনই প্রথম। বিরক্তি হজম করে কবিতা ও কবির নাম উল্লেখ করি। তারপর জোড় হস্তে ওঁকে বললুম, 'আজ্ঞে সবদিক থেকেই আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়ো, আপনার এই অসামান্য জ্ঞান, এই অতুলনীয় স্মৃতির ভাণ্ডার, এবং তা থেকে ইচ্ছেমতো রত্ন তুলে আনার শক্তি, এ সবই আমার কাছে বিপুল বিস্ময়। আপনার পায়ের ধুলোর যোগ্য আমি নই— কিন্তু এই যে একটি বিষয়, যাকে আপনি ধাপ্পা বলছেন, সেটাই আমার জীবিকা। এবং সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকে এই বিষয়টির চর্চা করে আসছি, এই একটা বিষয় নিঃসন্দেহে আপনার চেয়ে আমি বেশি ভালো জানি। কম্প্যারেটিভ লিটারেচার ধাপ্পা কি না, এই নিয়ে আপনার সঙ্গে বৃথা তর্কে নামতে চাই না। আপনিও এ নিয়ে মন্তব্য করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

এই আলোচনার বিব্রত সাক্ষী ছিলেন অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী। তিনি চেষ্টা করছিলেন ইশারায় আমাকে চুপ করাতে। কেননা আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে গেছেন তিনিই। শুনেছি নীরদবাবু নাকি প্রতিবাদ সইতে পারেন না, প্রতিবাদীর ওপর চটে যান। অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেদিন সেসব কিছুই হল না। নীরদবাবু অন্য কথা পাড়লেন। উনি শুরু করলেন জার্মানির ওয়াইনকান্ট্রি নিয়ে আলোচনা। হবি তো হ আমি ঠিক কিছুকাল আগেই জার্মানির ওয়াইনকান্ট্রি ঘুরে এসেছি। যাবে কোথায়, রাইনভ্যালি আর মোজেলভ্যালি নিয়ে ওঁর তুলনামূলক তত্ত্ব আলোচনায় আমিও দিব্যি জানিয়ে-শুনিয়ের মতোই যোগ দিলুম। এইটে ওঁর 'বাঙালি মেয়ে'র ধারণার মধ্যে নীরদবাবু একেবারেই আশা করেননি মনে হয়— চট করে উঠে একটি সোফায় কুশনের তলা থেকে চমৎকার একটা ম্যাপ টেনে বের করে ফেললেন। জার্মানির রঙিন ম্যাপ। তপনদারও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু নীরদবাবু আমাকে ম্যাপে দেখিয়ে দিতে বললেন মোজেলভ্যালি কোথায়। ব্যাপারটা কিছুই না। দেখিয়ে দিতে অসুবিধে হল না। কিন্তু ওই আবার পরীক্ষা! এই যে ওঁর স্বভাব অনবরত অন্যের জ্ঞানের পরিধির হিসেব নেওয়া, এইটে সেদিন আমার ভালো লাগেনি। পঁচিশ বছর হয়ে গেছে প্রায়— অনেক বদল হয়েছে আমাদের দুজনেরই। এই একটা জায়গাতে দেখা গেল উনিও বদলাননি, আমিও না। উনি এখনও পরীক্ষা নিয়ে চলেছেন, আমি এখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌজন্যবশত সেই পরীক্ষা দিয়ে চলেছি।

'না— উত্তর দেব না—' এ-রকম একটা সোজাসুজি অসভ্য জবাব দিতে তখনও পারিনি, এখন এই শততম বর্ষের বালককে তো আরওই অমন কথা বলা যাবে না। আমার ছোটোবেলায় এক দাদা আমাদের নানারকম ধাঁধার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। আমাদের খুবই ভালো লাগত। কিন্তু উনি যখন কঠিন কঠিন বিজ্ঞানের ধাঁধা জিজ্ঞেস করতেন এবং অঙ্কের ধাঁধা দিতেন— আমার ওঁকে তখন একটুও ভালো লাগত না। নীরদবাবুর প্রশ্নগুলি অঙ্কের ধাঁধা পর্যায়ে যায় না বলেই বোধ হয় এত বছর ধরে ওঁর খেলাতে খেলুড়ি হয়ে রয়েছি। উনিও ঠকাবেন, আমিও ঠকাব না।

উদাত্ত কণ্ঠে নীরদবাবুর ফরাসি কবিতা আবৃত্তি সাঙ্গ হল। উনি টুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন ভাষা?'

'ফ্রেঞ্চ।' টুম্পা পাশ!

এবার আমার দিকে তাকিয়ে— 'কার কবিতা?' ওঁকে হতাশ করে দিতে, আমি বলি, 'সোনার

তরী।' আমাকে অবাক করে নীরদবাবুর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই আলোয় আলোয় আমি বলে ফেলি— 'এটি কার অনুবাদ?'

'কেমন লাগল আগে বল।'

'ভালো লাগল। চমৎকার, স্বচ্ছ অনুবাদ— আমি এটা দেখিনি। ছন্দটাও খুব সুন্দর।'

'দেখবে কী করে? এ অনুবাদ তো আমার করা। আমিই অনুবাদ করেছি,' বলেই বাংলায় আবৃত্তি শুরু করলেন— 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো এ তরী'— তারপর পুনরাবৃত্তি করলেন, সাবলীল ফরাসিতে।

টুম্পাও বলে ফেলল,

—'বাঃ!' উনি নজর করলেন।

'কী? ভালো লাগল তো? আমি তো জানি তোমার ভালো লেগেছে!'

'কেমন করে জানলেন?'

'তোমার চোখ দেখে। চাউনি দেখে। আমার দিকে তুমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে, যখন আমি আবৃত্তি করছিলাম। অনেকেই মুখে বলে, "বাঃ", "খুব ভালো লাগছে" ইত্যাদি। কিন্তু আমি তাদের মুখ দেখেই টের পেয়ে যাই তারা মিছে কথা বলছে। তাদের আসলে ভালো লাগছে না। তোমার মুখ দেখেই টের পেলাম তোমার ভালো লাগছে।'

নেহাত একশো বছর বয়েস, তাই। পঞ্চাশ বছর কম হলে, এসব কথার অন্যরকম অর্থ করা যেত। ফ্লার্ট করতে নীরদবাবু এক্সপার্ট। কিন্তু সবই এত দেরিতে হল যে আমরা তার সুযোগ নিতে পারলুম না।

১৯৯৪-তে এসেছিলুম যখন অসুস্থ মাসিমাকে দেখতে, তখন নীরদবাবুর যত্নআত্তি ভোলবার নয়। নীচের সদর দরজা খোলা ছিল সেদিনও। সেদিনও গ্রামোফোনে লংপ্লেয়িং রেকর্ড বাজছিল এই আজকের মতোই। শুধু তফাত, আজকে উনি আমাকে পরীক্ষা করেননি, 'কার গান? কী গান?' প্রশ্ন করে। সেদিন রেকর্ডে পাশ্চাত্যসংগীত বাজছিল। নীরদবাবু বাজনাটি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'বলো দেখি কী বাজাচ্ছিলাম?'

আমি বলতে পারলাম না। বিজয় গর্বে বুক ফুলিয়ে নীরদবাবু দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'পারলে না তো? জানতাম তুমি পারবে না। ওটা রুল ব্রিটানিয়া।'

আমি আর রুল ব্রিটানিয়া এত শুনলুম কবে, যে চিনতে পারব?

এই যে ওঁর পরীক্ষা নেওয়ার স্বভাব— অন্যকে বোকা বানিয়ে মজা পাওয়া, এই ছেলেমানুষী ওঁর আর গেল না।

যত্ন করার স্বভাবও যায়নি।

সেদিন আমাকে ওপরে নিয়ে গেলেন মাসিমার কাছে। আজও সেদিনকার মতোই পোশাক, ধুতির ওপরে গলাবন্ধ সোয়েটার পরা, পায়ে জুতো মোজা। আগে দেখেছি সিল্কের চাবিতে সোনার বোতাম, পায়ে মোজার চটি। এখন উষ্ণতার প্রয়োজন বেড়েছে, সোয়েটার লাগে। জুতো চাই। প্রথম প্রথম দেখে, ওঁর লম্ফঝম্প, ছুটোছুটি, চঞ্চলতা দেখে আমার নিজেকে সুইফটের ব্রবডিঙন্যাগের দেশের বিশালবপু মেয়ে বলে মনে হত। আর উনি যেন খুদে গালিভার। ওঁর যে ইগলপাখির মতো স্বভাব, সেটা তো চট করে বোঝা যায় না। দেখলে চড়ুইপাখির কথাই মনে

পড়ে। ওঁর মধ্যে কৈশোর চিরজাগ্রত। ওঁকে দেখে আমার ইচ্ছে করত কোলে তুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলি। কী সর্বনেশে ইচ্ছে! উনি কি সোজা মানুষটি? ৪১ নম্বর হেয়ার ফিল্ডের বাড়িতে আমি ওঁর একটা ফোটো দেখেছিলাম। নীরদবাবু বসার ঘরের সোফায় উপবিষ্ট, তাঁর পটভূমিতে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ছবিটি তাঁর প্রথম পুত্র, ধ্রুবনারায়ণের তোলা। এবারে ছবিটির খোঁজ নিতে ধ্রুববাবু বললেন অন্য ঘরে আছে। ওই ছবির সামনে সত্যি নীরদবাবুকে খুব মানায়।

তা বলে ওই দিনে তোলা আমার অন্য ছবিটিও খারাপ নয়। (তখন ওঁর বয়স ৯২) হাঁটু গেড়ে বাগানে বসে— 'ও আমার গোলাপবালা'— স্টাইলে চমৎকার একটি গোলাপ ফুলের শুশ্রূষা করছেন। দুটিতেই নীরদবাবুর অন্তঃপ্রকৃতির সৎ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে।

বাংলাকে গভীর ভালোবাসেন। বাংলার সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে নিজেকে মনে করেন— বাঙালি বিষয়ে গর্বিত। (যদিও মন্দ লোকে বলে, উনি নাকি দুই বাংলা মিলিয়ে ষোলো কোটি বাঙালির প্রত্যেককে ইনডিভিজুয়ালি এবং অ্যাকটিভলি ঘৃণা করেন! একথা যারা বলে তারা ওঁর হৃদয় দেখেনি।) বাঙালির প্রতি নিন্দেমন্দ প্রধানত ওঁর অভিমানের কথা। উনি বাঙালির কাছে স্বীকৃতি পাননি এটা ওঁর এককালে দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু এখন তো সেটা বদলানো উচিত। আনন্দবাজার, মিত্র ঘোষ, বিশ্বভারতী এবং শতসহস্র রাগী-সংরাগী পাঠক-পাঠিকা— এতদিনেও ওঁর সেই অভিমান ভেঙে দিতে না পারলে, দোষ দেব ওঁকেই। আত্মঘাতী নীরদবাবুকেই।

কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলুম যখন, দেখি প্রত্যেকেই বলছেন এটি নীরদ সি চৌধুরীর দেশ, সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদার দেশ ইত্যাদি। কিন্তু প্রথমে নীরদ সি নামটি। 'কিশোরগঞ্জের ইতিহাস' বইটিতেও ওঁর নাম সসম্মানে উল্লিখিত, ওই অঞ্চলের স্বনামধন্য সন্তান হিসেবে। ওঁর নাম করার সঙ্গেসঙ্গে একথাও অনেকেই বলেছিলেন, 'যদিও উনি আমাদের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন'— তবুও কিন্তু তাঁকে ওরা পরিত্যাগ করেননি। বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। ভালোবাসা তিনি গত বিশ বছরে অনেক পেয়েছেন স্বদেশবাসীর কাছে। অভিমান ভঙ্গের দিন বহুকাল এসে গেছে।

সেবারে যত্নের কথা বলছিলুম। আমি আর মাসিমা গল্প করছি ওপরের ঘরে, নীরদবাবু উঠে এলেন, 'কী খাবে? চা, না কফি?'

'কে তৈরি করবে? আমি, না আপনি?' কেননা ওঁদের সংসারে সাহায্যকারিণী মেয়েদের কেউই এই সময়টায় থাকে না।

'আমি, অবশ্যই। তুমি কি ভেবেছ আমি চা-কফি বানাতে পারি না?'

'তাহলে কোনোটাই না।'

নীরদবাবু হেসে উঠলেন, দুষ্টু দুষ্টু চোখে চশমার ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভুলেই গেছি, ছ-টা বেজে গেছে। সন্ধ্যার পর তো চা-কফি দেবার কথাই নয়! কী দেব? ভালো ক্ল্যারেট আছে। দিই?' আমি মোদো টাইপের লোক নই। কিন্তু বাবার মতো টিটোটলারও নই। ভালো ওয়াইন পেলে নিশ্চয় তার সদ্ব্যবহার করতে জানি। আর নীরদবাবুর ওয়াইন সেলার জগদ্‌বিখ্যাত হয়ে গেছে। তাঁর 'ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি' হয়তো নেই, কিন্তু দুর্মূল্য গ্রন্থ, দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড, মহার্ঘ ওয়াইন আর দুর্লভ ছবি আছে।

তাহলে বলেই ফেলা যাক। সেই প্রথমতম দিনে নীরদবাবুর বাড়িতে একটু মনঃকষ্ট হয়েছিল। ওয়াইন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে নীরদবাবু একের পর এক দুর্মূল্য ওয়াইনের বোতল এনে আমাদের দেখিয়ে, তাদের ঠিকুজিকুলুজি বোঝাতে লাগলেন। তারপর অনাঘ্রাত কুসুমের মতোই তারা যথাস্থানে ফিরে যেতে লাগল। দুটো অসামান্য শ্যাপাঁঞ (আমরা লিখি 'শ্যাম্পেন', নীরদবাবু লেখেন 'শ্যাপাঁঞি') দেখালেন। কোনোটাই খোলা হল না। আমি আর তপনদা তার পক্ষে যথেষ্ট খানদানি অতিথি ছিলুম না।

তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল আর এক দিন, উনি যখন বিরাট এক বাক্স চকোলেট এনে আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন বেলজিয়াম থেকে কোনো বিশিষ্ট অতিথি তাঁকে এই বিশেষ চকোলেট উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বাক্সটা খোলেননি।

তাই আজ ক্ল্যারেটের অফার সঙ্গেসঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করে নিই। একটু পরে নীরদবাবু আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন, দু-হাতে সাবধানে ট্রে ধরা। তাতে দুর্মূল্য দুটি স্ফটিকের পাত্রে টলটল করছে গাঢ় লাল ক্ল্যারেট, আর একটি মগে ধোঁয়া ওঠা উষ্ণ স্বাস্থ্যকর পানীয়, মাসিমার জন্যে। প্লেটে কাজুবাদাম, আলুভাজা ইত্যাদি। যত্ন করে মাসিমার খাটে ট্রে রেখে, নিজে একটি চেয়ার টেনে এনে বসলেন। তখন বয়স সাতানব্বই। আমাদের সাতাশ বছরের যুবককেও লজ্জা দিতে পারেন, তিনি তাঁর অতিথিসৎকারের নৈপুণ্যে।

আজও বললেন, 'চা কফি কিছু খাবে?' ধ্রুবনারায়ণ এসে বসেছিলেন ঘরে তখন। 'ধ্রুব করে দেবে।' টুম্পা আর আমি 'না না' করে উঠি। ধ্রুব বললেন, 'ছ-টা তো বাজে, আমি একটু হয়তো ওয়াইন খেতে পারি আপনার সঙ্গে—।' মাসিমার খাটের পাশে বসে ক্রিস্টালের গ্লাসে দুজনের ক্ল্যারেট পান মনে পড়ল। ইচ্ছে হল না সেই স্মৃতিটা ভাঙতে। 'থাক। এখন না।'

নীরদবাবু বললেন, 'অন্য কিছু খাবে? কেক-পেস্ট্রি কিছু?' আবার মা-মেয়েতে— 'না, না।' এবার নীরদ চৌধুরী উবাচ— 'এখন তো বলছ "না না", তারপরে বাড়ি গিয়ে বলবে, "এতই ছোটোলোক, কিছু খেতে দিল না। চা পর্যন্ত অফার করল না।" এটা বাঙালিদের স্বভাব। সামনে একরকম বলবে, পিছনে আরেকরকম।'

টুম্পা বলল, 'অফার তো করেছেন। অতএব "অফার করেননি" এটা আর বলতে পারব না।' উনি শুনলেন কি না বুঝলুম না। ধ্রুব হাসলেন। ধ্রুব বি.বি.সি.-র সঙ্গে নীরদবাবুর ওপরে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করছেন। সত্যি এটা খুব দরকারি কাজ— খুব জরুরি। জানি না এটার শুরু কখন হয়েছে, মাসিমা থাকতে থাকতেই, না তাঁর চলে যাবার পরে, আধখানা নীরদবাবুকে নিয়ে।

মাসিমা আর নীরদবাবু দুজনে মিলে একটা ইউনিট ছিলেন। মাসিমা চলে গেলেন আগে, যদিও তিনি বোধ হয় বারো বছরের ছোটো। নীরদবাবু এতদিনে একক এবং নিঃসঙ্গ পুরুষ হয়েছেন। ১৯৯৫-তে যখন একটা টার্মের জন্য অক্সফোর্ডে গিয়েছিলুম তখন কিছুতেই নীরদবাবুর কাছে যেতে পারিনি। মনোবল সংগ্রহ করতে পারিনি। এখন সেই না-যাওয়ার কথা ভেবে খুব মন খারাপ হয়। তখন মাসিমা সদ্য চলে গেছেন। ওঁকে কেমন দেখব, সেই ভয়ে যাইনি। অথচ বীরত্বই আশা করা উচিত ছিল।

প্রেম ও পাতিব্রত্য নিয়ে নীরদবাবু অনেক ভেবেছেন। অনেক লিখেছেন। 'বাঙালি জীবনে ও সাহিত্যে প্রেম ও পাতিব্রত্য' তাঁর একটি প্রিয় বিষয়বস্তু। আমার তো মনে হয় ওঁর সময় হয়েছে

আর একটি প্রেমের প্রবন্ধ লেখবার। এক পত্নীব্রত পতি, আর এক পতিব্রতা পত্নীর কাহিনি। যার প্রমাণ নীরদবাবুর জীবনে ও সাহিত্যে ছড়ানো। মাসিমার আত্মজীবনীতে তার একটি দিক আর নীরদবাবুর সামগ্রিক রচনায় (যাতে নিজের কথা আছে) তার অন্য দিকটি প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। নীরদবাবুর লেখায় ছত্রে ছত্রে পত্নীপ্রেম। মাসিমার মতো এমন সৌভাগ্যবতী কমই দেখা যায়। স্বামী যেখানে খোলাখুলিভাবে পুনঃ পুনঃ প্রেম নিবেদন করছেন, জগৎসভায়। ওঁর যে থিসিসটি এত প্রিয়, প্রেম ও পাতিব্রত্যের সমাহার এবং বাঙালি নারী— (টুম্পাকে এই বিষয়েই উনি সেদিন অনেক কথা বলছিলেন) মাসিমার প্রসঙ্গটা ছিল সব কিছু ছেয়ে— পটভূমি হয়ে। যদিও মাসিমার প্রেমের বা পাতিব্রত্যের প্রসঙ্গ একবারও ওঠেনি। শুধু মাসিমার প্রসঙ্গ। দৃষ্টিদানের কুমু, বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী, কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর। তার সঙ্গে 'ইতি তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন মৃণাল'— তারই সঙ্গে— 'পার্কের সবুজ ঘাসে তোমার মাসিমা হাঁসদের প্রতিদিন খাওয়াতে যেতেন— এই যে দেখ, হাঁস, আর ওই তোমাদের মাসিমা! আর একটা জিনিস লক্ষ করেছ'— নীরদবাবু এবার টুম্পার দিকে ঘুরলেন, ছবিতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন— 'এই যে ওঁর শাড়ি-পরাটা। এটা একটা দেখবার মতন ব্যাপার। ওঁর মাথার ঘোমটার থেকে আঁচলের পাড়টা, আর গায়ের আঁচলের পাড়টা, দুটি কেমন প্যারালাল হয়ে পড়েছে? একদম এক লাইনে পড়েছে তো? এইটা তুমি আর কোথাও পাবে না। আজকালকার মেয়েরা শাড়ি পরতেই জানে না।' এবার আমার দিকে ফিরে— 'রাস্তায় মেয়েরা হেঁটে যেত, তোমার মাসিমা ওদের দেখিয়ে হাসতেন, আর বলতেন, "দেখ দেখ কেমন করে কাপড় পরেছে! ওরা কাপড়ই পরতে শেখেনি"—' বলে সগর্বে আমাদের দুজনের দিকে তাকালেন। টুম্পা তো প্যান্টের ওপরে শাল জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। আর আমি যে ভালো করে যত্ন নিয়ে শাড়ি পরি না, যেমন-তেমন করে জড়িয়ে নিই, সেটা রাস্তার বেড়ালটাও জানে। কাজেই এই কথায় আমাদের বেশ একটু অস্বস্তি হতে পারত।

কিন্তু হল না। নীরদবাবু তখন অন্যমনস্ক হয়ে মুগ্ধনেত্রে তাঁর হাতে-ধরা ছোটো ছবিটির দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। দুটি পাড়ের ওই সমান্তরাল হয়ে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যের দিকে। আমাদের কথা ওঁর মনে ছিল না। আমার চোখে জল এসে গেল। নীরদবাবু কদাচ অন্যমনস্ক হন না। লড়াকু প্রকৃতির মানুষ, বুদ্ধির লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত। নিজে সর্বদা পূর্ণমনস্ক আত্মসচেতন থাকেন এবং তাঁর কাছে যে-কেউ যতক্ষণ থাকবে, সবটা সময় তাকেও পুরোপুরি সদাসতর্ক হয়ে থাকতে হবে। মন খাড়া করে রাখতে হবে। এলিয়ে পড়লে চলবে না। কখন কী প্রশ্ন করে বোকা বানিয়ে দেবেন? নীরদবাবু একজন 'পারফরমার'। সারাক্ষণই যেন অদৃশ্য মঞ্চে বসে-দাঁড়িয়ে পাবলিকের জন্য একটা অনুষ্ঠান করছেন।

'নীরদবাবু পারফরমিং "নীরদবাবু"।' আমার তো মনে হয় না উনি ঘুমোতে যাবার সময়েও ভুলতে পারেন যে উনি ডক্টর নীরদচন্দ্র চৌধুরী সি.বি.ই.। বই আর সংগীত আর শিল্প— এদের সঙ্গেই উনি সবচেয়ে সহজ। এদের কাছে উনি নির্ভার। এদের সঙ্গে ওঁর প্রতিযোগিতা নেই, ইমপ্রেস করার দায় নেই, অভিযোগ নেই। এদের কাছে উনি পারফরমার নন। এদের ভালোবাসতে ওঁর মনে আশঙ্কা নেই কোনো। দেওয়ালের 'মোনে'টি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বহু কষ্টে, অনেক খরচে সংগ্রহ করেছি।' এদের নিয়ে ওঁর গর্ব। তেমনই গর্ব ওঁর মাসিমাকে নিয়ে। ওঁর কাছে ওঁকে সদাসতর্ক থাকতে হয়নি। যিনি ওঁকেই সতর্ক করে দেবার ভার নিয়েছিলেন।

'তোমার মাসিমা রাত থাকতে উঠে নদীর ধারে, পার্কে বেড়াতে যেতেন। আজকের অক্সফোর্ডে সেটা আর সম্ভব নয়, সন্ধ্যা সাতটার পরে বড়োরাস্তা দিয়েও মেয়েদের চলাফেরা করা নিরাপদ নেই। এই দেশটা আর সভ্য মানুষের বসবাসের যোগ্য থাকছে না। চতুর্দিকে কেবল সেক্স আর ভায়োলেন্স।'

নীরদবাবুর মুখে উদ্‌বেগ ঘনিয়ে এল। 'শুধুই সেক্স আর শুধু ভায়োলেন্স। কোথাও নিরাপত্তা নেই; এতটুকু সুরুচি নেই। আগে আমি যে রাস্তায় হাঁটতে যেতাম, খুব সেজেগুজে (আমি সর্বদা ভালো সাজপোশাক করতে পছন্দ করি), ফিটফাট হয়ে থ্রিপিস সুট পরে ফ্রিলড শার্ট পরে— রাস্তায় যুবতী মেয়েরা আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখত। বুঝতাম তারা আমাকে, আমার রুচিকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে।— এখন সেসবও সম্ভব নয়। রাস্তা দিয়ে যদি কেউ সেজেগুজে হেঁটে যায় মেয়েরা তো এখন ভয় পাবে তার দিকে অমন করে মুগ্ধনয়নে চেয়ে থাকতে— চারিদিকেই যে ভায়োলেন্স, সেক্সুয়াল অ্যান্ড আদারওয়াইজ। আমার এদেশ ছেড়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়, ব্যবহারিক কারণে। কিন্তু নতুন করে কাউকেই আমি বলব না আর এদেশে এসে থাক। আমার নাতনিকে তো এখানে এসে পড়াশুনো করতে বারণই করে দিয়েছি। মেয়েদের পক্ষে এদেশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে— ইংলন্ড আর ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নেই। নাতনিকে বলেছি দেশেই পড়াশুনো করতে।'

আমি আর প্রাণে ধরে এই শতবর্ষবয়স্ক গুরুজনটিকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে খোঁচা মেরে, অন্ধতা ঘুচিয়ে চোখ ফুটিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলুম না। দেশেও যে নারীর আর নিরাপত্তা নেই, দেশেও যে সেক্স আর ভায়োলেন্সের, আর কুরুচির রমরমা, আমাদের যে 'ইদিক-নেই-উদিক-আচে', উন্নয়নের বেলায় নেই অবনয়নের বেলায় আছি— এসব আর বলি না। (বলার ফাঁকও অবশ্য ছিল না!) উনি বরং মনে করুন জন্মের মতো ছেড়ে-আসা ওঁর জন্মভূমিতে আজও নারীরা, শিশুরা নিরাপদেই বেঁচে আছে। 'ভুবনমনোমোহিনী' হয়েই থাকুক না তাঁর স্বদেশ?

বাড়ি ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে টুম্পা বলল, 'কী অসামান্য মেমারি! মা? অনায়াসে প্যারার পর প্যারা কোট করে যাচ্ছেন, ঠিক যেন সামনে বই ধরে পড়ছেন— তাই থেকে আবার লাইন তুলে ব্যাখ্যা করছেন।'

টুম্পা বিমুগ্ধ। সত্যি, একটা অলৌকিক ক্লাসরুমে উনি ক্লাস নিচ্ছেন, আর আমরা যেন ছাত্র! টুম্পার বিস্ময় বোঝা সহজ, বোঝানো সহজ নয়। সেইসব দীর্ঘ উদ্ধৃতি তো আমি নোট করে রাখিনি। এমন এক বিরল প্রতিভার সান্নিধ্যে এলে মনের মধ্যে আলো জ্বলে ওঠে। তারই আশায় টুম্পাকে এত সেধে নিয়ে যাওয়া। সেটা সার্থক হয়েছে। সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের একটা অঙ্গ এইরকম অসামান্য স্মৃতির প্রতিভা। ইংরিজি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে এ গুণটি দেখিনি। তবে অনেক গল্প শুনেছি পুরোনো দিনের।

'না এলে সত্যি জীবনে একটা বড়ো ব্যাপার মিস হয়ে যেত। থ্যাঙ্কিউ, মা।'

'তবে? বলেছিলুম না?'

টুম্পা শুধু বলে, 'উনি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকুন।'

'এবারে মনে হল একটু যেন একা হয়ে গেছেন।'

'একা, মানে টোটালি সেল্‌ফ অ্যাবসর্বড ম্যান কিনা?'

'কেউ সমবয়সি আশেপাশে নেই। এখন উনি যেখানে বেঁচে আছেন, সেটা অন্যদের পৃথিবী।'

'তা ছাড়াও, প্র্যাকটিকালি দ্বীপান্তরে আছেন তো? যতই সেল্‌ফ-এগজাইলড হোন, এগজাইলেই তো? আত্মমগ্ন না হয়ে উপায় কী? এটা তো বিদেশ!'

'উপায় হয়তো আছে। এই যে আমরা দুজনে এলুম, উনি তো নোটিশই নিলেন না, নিজের মধ্যে নিজে বন্ধ রইলেন। আমরা যেন আয়না, যাতে উনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। এ তো আরেক ধাপ স্বেচ্ছানির্বাসন। এটা থেকে বাঁচতে পারাতেন, ইচ্ছে করলে। যদি অন্যদের প্রতি আগ্রহী হতেন। জীবনে এত আসক্ত, অথচ—'

'সেটা বোধ হয় অহংকারী মানুষের স্বভাব, মা। প্রতিভাবান মানুষরা প্রায়ই আত্মকেন্দ্রিক হন। উনি যেমন প্রতিভাবান তেমনই অতিরিক্ত অহংকারী মানুষও। অন্যদের উনি নিজের কৌতূহলের যোগ্য প্রাণী বলেই মনে করেন না হয়তো।'

'না, না, আগে উনি এতটা বেশি আত্মমগ্ন ছিলেন না। এটা নতুন হয়েছে। চিরদিনই নিজেকে ঘিরে বাঁচেন, তবু তারই মধ্যে অন্যদের সঙ্গে লৌকিকতার সম্পর্কটুকু গড়তেন— গল্প করতেন, তর্ক করতেন।'

'তুমি যখন আমার সঙ্গে পরিচয় করাতে গেলে, উনি বললেন, "জানি, জানি, জানি"— অথচ উনি তখনও তোমাকেই চিনতে পারেননি, "আপনি" করে বলছিলেন।— আসলে উনি নতুন মানুষদের আর চিনতে-জানতে আগ্রহী নন। ক্লান্ত।'

'এসবই এক-শো বছরের কারসাজি রে। কিছু খেলা তো দেখাবেই। এটাই বরং ভালো। "কৃষ্ণকান্তের উইলের সাতাশ পৃষ্ঠা দেখো", "গোরার এক-শো সাতাশ পৃষ্ঠা দেখো"— সেটা তো বলতে পারছেন ঠিকঠাক?'

'তা অবশ্য ঠিক।' একটু পরে টুম্পা বলল, 'মা, বাংলাতে পাঁচটা পাস্ট টেন্স হয়— আমরা ইস্কুলে পড়েছি।' তারপরে পর পর পাঁচটা উদাহরণ দিল।

'তখন বললি না কেন?'

'পাগল হয়েছ? ওঁর মন খারাপ হয়ে যেত না? উনি তো চান না ওটা কেউ জানুক। কত উৎসাহ করে ব্যাপারটা জানাচ্ছেন আমাকে।' টুম্পা মমতাময়ী হাসি হাসল, 'বললেও উনি শুনতেন না অবশ্য।'

'ঠিক ঠিক বল তো, কেমন লাগল?'

'অসাধারণ।'

'ব্যস! আর কিছু?'

'অত কমপ্লেক্স একজন মানুষ, তাঁর প্রতি আমার রেসপন্সও তো কমপ্লেক্স হবে? অতি-সরল করে বলতে পারা যাবে না, জটিল এক্সপিরিয়েন্স। তবে ওই, অসাধারণ! তোমার কীরকম লাগল ওঁকে এবার?'

'এবার ওঁকে একটু অন্যরকম দেখছি। বোধ হয় মাসিমা নেই বলেই। আবার এক-শো বছর বয়েস হবে, সেটাও ওঁকে টেনস করে রেখেছে। তিন অঙ্কের বয়েস হওয়া, এটা তো খানিকটা সুর-রিয়ালিস্টিক ব্যাপার। দু-অক্ষরের বয়েস থেকে সরে যাওয়ার একটা মস্ত অভিঘাত পড়ে নিশ্চয় জীবনে-মনে।'

'সত্যি এক-শো বছর বয়েস হওয়া একটা মিথিক্যাল এজে পৌঁছে যাওয়া— আমারও মনে হল উনি এক-শো বছর বয়েস হওয়া নিয়ে বেশ উদ্‌বিগ্ন। খুশি নন। টেনশনে আছেন।'

'আসলে কী জানিস, শরীর-মনে তো ওঁর জরা লাগেনি, বার্ধক্য যা এসেছে তা বড়োজোর সত্তর বছরের। অথচ পাঁজির বয়সটা এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে জরাগ্রস্তের। নিরানব্বই আর উনসত্তর বরং অনেক কাছাকাছি। কিন্তু এক-শো যেন একেবারে একটা অন্য দেশ।'

'মা, "নিরানব্বই বছর বয়সে আমার আগে জগতে আর কেউই বই লেখেনি" বলে উনি আজ বলছিলেন না? আমার ইচ্ছে উনি এক-শো বছর পার করেও একটা বই লিখুন।'

'একটা কেন, অনেক বইই লিখবেন আশা করি। তবে ওঁর বদল হয়েছে অনেক। বিকেলে এখন তো দরজা খোলা থাকে সবার জন্যে। আগে এ-রকম অবারিত দ্বার ছিল না। বেছে বেছে অতিথিদের কাছে আসতে দিতেন। একবার তো কেতকীকে আসতেই দিলেন না।'

'দিলেন না মানে?'

"আমি আর কেতকী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবে, আমি ফোন করেছিলুম। বছর উনিশ কুড়ি আগেকার কথা হবে। উনি বললেন, "ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, কিন্তু তোমার বন্ধুটি আমার বাড়িতে ওয়েলকাম নয়।" একথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লুম। এমন অভদ্র কথা জীবনে শুনিনি। কেতকী যাবে না বলে সেদিন আমিও আর যাইনি। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হয়!'

কিন্তু কেন? কোনো কারণ ছিল?

'কেতকীর মুখেই শুনলুম সে নাকি ওঁর প্রবন্ধে বাঙালি মেয়েদের সাজপোশাক নিয়ে কিছু কটু মন্তব্যের প্রতিবাদে "দেশ" পত্রিকায় চিঠি দিয়েছিল, সেই থেকেই ওর ওপর নীরদবাবুর রাগ। তখনই প্রায় দশ-বারো বছর পেরিয়ে গেছে, তার পরেও!'

'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যই। আমার তখন মনে হয়েছিল এত বড়ো একজন মানুষ, তাঁর মনে এত ক্ষুদ্রতা? সন্তানের বয়সি একজনের প্রতি রাগ পুষে রেখেছেন এতকাল ধরে? ক্ষমা নেই শরীরে?'

'সত্যি! তবে উলটো দিকটাও ভেবে দেখো। ওঁর মধ্যে হিপক্রিসি নেই। যাকে ওঁর শত্রু বলে মনে হয়, তাকে উনি বাড়িতে ঢুকতেই দেন না। সোজা হিসেব। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ব্যবহার।'

মেয়ের কথায় যেন অকস্মাৎ জ্ঞানচক্ষু মেলে গেল আমার। এত বছর ধরে যেটাকে নীরদবাবুর দুর্বলতা বলে মনে হয়েছিল, অক্ষমতা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ সেটাকেই মনে হল ওঁর বলিষ্ঠতা, সৎসাহসের ক্ষমতা। ভেবে আনন্দ হল। বুঝতে পারলুম, এমন সৎসাহস আমার নেই। তুলনীয় পরিস্থিতিতে পড়লে, আমি সৌজন্যের দায়ে সামাজিক প্রথানুগ আচরণই করব। মনের ভাব গোপন করব। সে-কুকর্মটি নীরদবাবু করেননি। খোলাখুলি মনোভাব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তখন ওঁর বয়স সত্তরের ঘরে, পঁচাত্তর-টর হবে আমিও হয়তো পঁচাত্তরে ওইরকম সৎসাহসী হয়ে যাব।

এখন ওঁর ঘরের দরজা খোলা থাকে। কেননা ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মনের মধ্যে নিরন্তর কথা জমে উঠছে, বলার মানুষ তো চাই! তা সে যে-ই হোক। তাঁর কাছে আসতে চেয়েছে, এসেছে, এইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট পরিচয়। নীরদবাবুর সঙ্গে আর ঝগড়া করা যাবে না। অন্যের

মতামত দূরে থাক প্রশ্ন শোনবারও তাঁর সময় নেই আর। নীরদবাবুর তাড়া আছে। অনেক কাজ করা বাকি, অনেক কথা কওয়া বাকি। 'সময় কমে আসছে' এমন একটা তাগাদা জেগেছে হয়তো তাঁর ভেতরে। তাই তিনি আর অন্যের প্রশ্ন শোনেন না, শুধু উত্তরগুলো সাজান।

আজ যা-কিছু বললেন, তার সবই আগে শুনেছি, ওঁরই বিভিন্ন লেখায় পড়েছি। টুম্পা ওঁর কোনো লেখা পড়েনি, ওর কাছে সবই নতুন। উনি নিজে থেকেই নিজের কথা বলে গেলেন আমাদের কাছে— যতক্ষণ ছিলাম। নিজের ধ্যানধারণা, পড়াশুনো, জীবনযাপন, সাহিত্যভাবনা, বাঙালিতত্ত্ব, সাহেবতত্ত্ব— এর মধ্যে নতুনত্ব কেবল সাহেবতত্ত্বে।

পশ্চিমি দুনিয়া সম্পর্কে ওঁর মনে তীব্র উদ্‌বেগ আশঙ্কা জন্মেছে। কিছুকালের মধ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে— ইদানীং এমন ধারণা হয়েছে ওঁর মনে। এত দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে ওদেশে, এত খাড়াই অবনতি, যে দেশটা আর তাঁর স্বপ্নের দেশ নেই। শেষজীবন যেখানে কাটছে সেই দেশকে যদি অভিশপ্ত দেশ মনে হয়, জীবনে কি শান্তি থাকে? বার বার বলছিলেন, 'এদেশে মেয়েদের নিরাপত্তা নেই, এদেশ সভ্য মানবের বাসযোগ্য নেই।'

টুম্পা বলল, 'অনেক জানা যায়, অনেক শেখা যায়, মুগ্ধ হওয়া যায় ওঁর কাছে এলে। কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক শ্রদ্ধা, অনেক স্বীকৃতি তো পেলেন, তবু এত রাগ। এত পাণ্ডিত্য, এমন স্মৃতিশক্তি, এত তীক্ষ্ণ মেধা, সচল শরীর— তবু তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই।'

একটু থেমে, টুম্পা বলল, 'আসলে, এগজাইলে বোধ হয় শান্তি থাকে না।'

টুম্পাদের প্রজন্ম চট করে অবাক হয় না। ওরা এতই জেনে গেছে বিজ্ঞানের দৌলতে, যে বিস্ময়ের যেন কিছু বাকি নেই। সকল অভিজ্ঞতাকেই বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে, ওরা সহজভাবে গ্রহণ করে মননে এবং হৃদয়ে। ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া এযুগের ধর্ম নয়। শতবর্ষীয় কিশোরটিকেও টুম্পা সেইভাবেই নিয়েছে। কত সহজেই বলল, দ্বীপান্তরে বোধ হয় শান্তি থাকে না।

ওঁর লেখাতেই পড়েছি উনি অক্সফোর্ডের চারওয়েল নদীর ধারের ঘাসবনে কিশোরগঞ্জের কলমিলতার জঙ্গল দেখতে পান। বিলেতের বিবর্ণ আকাশে আকাশগঙ্গার ঢেউও কি আর দেখতে পাবেন না?

: নভেম্বর ১৯৯৭

শ্রীচরণেষু লীলা মাসিমা

আমাদের জীবনে এক অত্যাশ্চর্য মুহূর্ত সমাগত, আপনার এক-শো বছরের জন্মদিনে আপনি সশরীরে আমাদের মাঝখানে বিদ্যমান। এ যেন ভানুমতীর খেল! এমনও হয়? একজন জীবিত বিশিষ্ট কথাশিল্পীকে তাঁর শততম জন্মদিনে আমরা কলকাতা শহরের বুকে পাচ্ছি। কিন্তু এতে খুশি হব, না হব না বুঝতে পারছি না। যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে আমি আর দেখব কি না জানি না। সেই যে তীক্ষ্ণ ধীমতী, কৌতুকরসে উজ্জ্বল, হাসিখুশি, সর্বদা বুদ্ধি ঝলমলে লীলা মাসিমা, যাঁর মুখে সবসময়ে সব কথার চটপটে জবাব তৈরি থাকত, তাঁকে আমরা কাছে পাচ্ছি কোথায়? এ তাঁর কেমনতরো বেঁচে থাকা? দীর্ঘ আয়ুর বাধ্যবাধকতায়, নশ্বরতার নিয়মে কোনোদিন যদি আমাদের দেহ আর মনের মধ্যে লড়াই বাধেই, তাহলে তুমি লীলা মাসিমার দেহকে না জিতিয়ে, মনকেই কেন জয়ী করে দিলে না, ঈশ্বর? এ তোমার কেমন করুণা?

জানি না এই লেখাটি আপনার চোখে পড়বে কি না, বা দৃষ্টিগোচর হলেও মননগোচর হবে কি না। আমি নবনীতা, আমাকে মনে পড়ে কি? ভালো-বাসা বাড়িতে থাকতে সেই যে দুজন কবি, আপনার নরেনদা আর রাধারানিদি, আমি তাঁদের মেয়ে। এককালে তাঁরা আপনার বন্ধু ছিলেন, সেইসূত্রেই আমার কমলা আর রঞ্জনকে চেনা। তাদের সঙ্গেও দেখা নেই বহুযুগ। আপনি একাই শুধু নিজের মধ্যে একা হয়ে যাননি লীলা মাসিমা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই খানিক খানিক একলা হয়ে পড়ছি, খানিকটা বিচ্ছিন্ন, খানিকটা অচেনা। নিজেরই কাছে। এ এক অন্যরকম দূরত্ব, যার হিসেব বাইরে থেকে কষা যায় না। আপনার এই দূরত্ব তো অন্যের সঙ্গে নয়, নিজেরই সঙ্গে। বিস্মৃতির কোপ কার ওপরেই-বা না পড়ে? যত দিন যায় তত দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ি আমরা। আপনার বেলায় বিস্মৃতি যেমন প্রবল আকার নিয়ে গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, আমাদের তেমন নয়, ততটা নয়, এই তফাত।

মাঝে মাঝে এইরকম কোনো বৃষ্টিঝরা হাওয়ার রাতে আমাদের হঠাৎ হঠাৎ নিজেদের কথা মনে পড়ে যায়, আর মন কেমন করে ওঠে। আপনার শুভ শতবার্ষিকী জন্মদিনে আমি নবনীতা আপনাকে আপনার সব ভক্ত, পাঠকদের হয়ে আন্তরিক ভালোবাসা, গভীর কৃতজ্ঞতা এবং প্রণতি জানাতে এসেছি। দয়া করে গ্রহণ করুন। আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আপনার জন্মদিনের শতবর্ষ নিয়ে কেমন দিব্যি আমরা আনন্দ করছি, কিন্তু আপনি কোথায়? নিঃশব্দ নজরুলের কাছে তবু যাওয়া যেত, ফুলের মালা পরিয়ে আসা যেত, তাঁরও তো বিস্মরণের গোধূলিক্ষণেই আমাদের সঙ্গে দেখা। কিন্তু আপনাকে তো চোখের দেখাও দেখতে পাই না আমরা, অন্তঃপুরচারিণী হয়ে আছেন কত বছর হয়ে গেল। শুনেছি, আপনি আর জনসমক্ষে বেরোনো পছন্দ করেন না। মনে পড়ে গেল, আমরা সই লেখিকা গোষ্ঠী শুরু করি ২০০০ সালের

শেষে, ২০০১-এর গোড়ায় সকলের আগে আপনাকে একটি সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, আর সই-এর উপদেষ্টামণ্ডলীতে আপনাকে রাখব বলে আবদার জানাতে, আমাদের কয়েকজন সইকে পাঠিয়েছিলুম। তাদের প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি, আপনার শরীর ভালো ছিল না। তবে, কখন এলে দেখা হতে পারে? উত্তরে তারা শুনে এসেছিল, উনি আর বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না। অর্থাৎ চেষ্টা করে লাভ নেই।

পরে শুনেছিলুম, তার কারণটা। বিস্মৃতির প্রলয় ঝঞ্ঝা স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে আপনার অতীত ও বর্তমান। আপনার কাছে এখন লীলা মজুমদার আমাদের এই প্রিয় নামটিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। এহ বাহ্য। কিছুতেই কিছু এসে যায় না আর। মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না। কিচ্ছুই না। সবটুকু ফাঁকা। শূন্য। শুনে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল। আলজাইমার রোগের নিষ্ঠুর ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে গিয়েছেন লীলা মজুমদার। রয়েছেন শুধু একটি সম্মান, জীবিত কায়া। লীলার ছায়ামূর্তি। সেই চিলেকোঠার ঘরে বন্দিনী নারীদের কথা মনে পড়ল। তাদের তো স্মৃতি সঙ্গী ছিল। আর স্মৃতির সঙ্গী বেদনা। হয়তো আপনিই ভালো আছেন লীলা মাসিমা, স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলাচলে আর কষ্ট পান না। শান্তি অ-শান্তি, সুখ অ-সুখও কি আপনার মননকে স্পর্শ করে?

আমাকে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে আমার প্রিয় লেখিকাদের নাম, আমার প্রথমেই মনে পড়ে আশাপূর্ণা পিসিমার মুখখানা আর আপনাকে। দুজনের লেখার ধরন যেমন আলাদা, জীবনযাপনেও তেমনি অমিল, মিল শুধু এক জায়গায়। কৌতুকরসের ভাঁড়ারে দুজনেরই প্রচুর রসদ। উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত, সুস্থ, স্বতঃস্ফূর্ত রসিকতার ক্ষমতা সবার থাকে না। বাংলা সাহিত্যে আপাতত এর স্বাদ অত্যন্ত অল্প পাই। এই মহার্ঘ শক্তি আপনাদের দুজনেরই ছিল। আপনারা আমাকে মুগ্ধ করতেন। হকচকিয়ে দিতেন।

আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমার লেখার স্টাইলের ওপরে কোনো প্রিয় লেখকের প্রভাব আছে কি না, আমি বলব সোজাসুজি প্রভাব হয়তো নয় কিন্তু গভীর অনুপ্রেরণা আছে। আমার নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা মজার গল্পের মধ্যে আপনার, আর কৌতুকের সঙ্গে পুরাণের পুনঃকথনের মধ্যে পরশুরামের, একজন একনিষ্ঠ পাঠকের ছায়া আমি দেখতে পাই।

বছরের পর বছর বড়োদের জন্য স্মৃতিচারণে আর ছোটোদের জন্য গল্প লিখে আপনি যে অকৃপণ আনন্দ আমাদের দিয়েছেন, তারপরে প্রকৃতির এই নির্দয় কার্পণ্য আপনার মোটেও প্রাপ্য ছিল না, লীলা মাসিমা।

প্রতি জন্মদিনে বন্ধুদের কাছে আপনার লেখা একাধিক বই উপহার পেতুম। আহ্লাদের সীমা থাকত না।

এখনও বাচ্চারা কত আপন করে পায় আপনাকে, তাদের কাছে তো আপনি জলজ্যান্ত। বইগুলো তো থেকে যাবে, তাদেরই মধ্যে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন আসল লীলা মজুমদার।

এত পেয়েছি, পরিবর্তে আমরা তো ভালোবাসা ছাড়া আপনাকে কিছুই দিতে পারিনি। এখন সেটুকুও কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রাখেননি ঈশ্বর।

বাংলা সাহিত্যের অসীম ঋণ আপনার কাছে। কালের প্রান্তসীমার বাইরে গিয়ে আপনি যে নিজস্ব জগতে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে আমাদের ভাষা পৌঁছোক বা না-ই পৌঁছোক, আমি

আপনার কাছে এই ঋণ স্বীকার করে খুশি হতে চাই। কিন্তু এ কীরকম এক-শো বছর পূর্ণ হল আমাদের প্রিয় লেখিকার?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগে ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. এবং এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া মেয়েটির মস্তিষ্কের প্রতি মায়া হল না ঈশ্বরের? লীলা মাসিমা, আজ আপনার জন্মদিনে আপনার সন্তানরা, আপনার সংসার আপনাকে ঘিরে রয়েছে কিন্তু আপনি তো সেখানে নেই। সন্ন্যাসীদের মতো আপনি এখন স্মৃতিভার মুক্ত, না অতীত, না বর্তমান, কিছুই আর আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। এতেই কি শান্তি? না কি শান্তি, অশান্তি, সুখ, দুঃখ, ভালো মন্দ এসব শব্দগুলি আপনার কাছে অর্থ হারিয়ে ফেলেছে? ভয় করে, বড়ো ভয় করে। আমরা প্রিয়জনদের শতায়ু কামনা করি, সে কি এইজন্য?

একে কি বলব জীবনের জয়? আপনি আমাদের আবার নতুন করে ভাবালেন, লীলা মাসিমা। নতুন করে মন খারাপ করে দিলেন। নশ্বরতা বড়ো কঠোর শব্দ, বড়ো ভারী, দাঁড়িপাল্লার যেদিকেই তাকে রাখ। প্রণাম আর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা, আরও একবার।

ইতি—

একদা আপনার স্নেহধন্য

নবনীতা

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

জ্ঞানপীঠের জ্ঞানোন্মেষ

বড়ো শুভ সময় চলেছে এ বছরে আমাদের। কী গদ্যে, কী পদ্যে, গোটা দেশে বাংলার আর জুড়ি কই? নিজের পিঠ নিজে চাপড়াতে ইচ্ছে করছে আমাদের, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে— 'দেখো দেখো হে জগজ্জন, আমরা জহরত চিনেছিলুম। বাঙালি পাঠককুল ভুল করে ভালোবাসেনি?' অকাদমি এবং নরসিংহদাস পুরস্কার দুটিই পেয়েছেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ, তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা'র জন্য। জ্ঞানপীঠের শিকেটিও এবছর আমাদের ভাগ্যেই ছিঁড়েছে, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী শ্রেষ্ঠ জীবিত ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন। জ্ঞানপীঠ পাওয়া-না-পাওয়ার ওপরে সেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল নয়। তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ তাঁর শিল্পে। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল, শ্রীমতী আশাপূর্ণাকে 'ঘরকন্নার মেয়েলিপাঁচালি'র লেখক বানিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে একটু কোণ ঠেসে দেবার একটা হাওয়া উঠেছিল। জ্ঞানপীঠ প্রাপ্তিতে আমাদের একটু হয়তো উপকার হল যে, আমরা সেই বোধহীন বুদ্ধিজীবীরা, এবার তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বসব।

আশাপূর্ণা দেবীর দোষ, তাঁর লেখায় কোনো ছলচাতুরি নেই। না আছে বাগাড়ম্বর, না ভাবের আড়ম্বর। কিন্তু তাঁর কলমে রয়েছে শিল্পসাধনার মূল গুণ— সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্য এবং শক্তি। কিছু 'গুণিন' মানুষ আছে না, যারা হাতে লোহার লাঠি নিয়ে মাটিতে ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়ায়; আর, কোথায় খুঁড়লে কুয়োতে জল মিলবে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। ভূতাত্ত্বিকেরা দলবল নিয়ে গিয়ে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে যখন বিপুল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালান তখন ঠিক সেই সেই জায়গা থেকেই জল উঠে আসে। আশাপূর্ণা দেবীর শিল্পে সত্যসন্ধানের ধরনটা অনেকটা ওই গুণিনদের মতো। ভূতাত্ত্বিকের 'বৈজ্ঞানিক' যন্ত্রপাতি বিনাই, অর্থাৎ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে চোখধাঁধানোর 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' না চালিয়েও তিনি একান্ত সহজভাবে চট করে সত্যের মর্মে গিয়ে বিদ্ধ হতে পারেন। সেই অন্তর্ভেদী আবিষ্কারের শিল্পদৃষ্টিটি তাঁর সহজাত।

মানুষের মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধির যে অসহায় বিরোধ চলে, সামাজিক প্রাণী আর প্রাকৃতিক প্রাণীটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে দ্বিধাবিভক্ত, যে যন্ত্রণা আধুনিকতম সাহিত্যের অন্যতম মূল আধেয়, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীও সেই বিচ্ছিন্নতাকে, রক্ত ও মেধার সেই জৈব বিরোধকে বারংবার শিল্পায়িত করেছেন। কিন্তু সেই শিল্পায়নের ঢং এতই সহজ, এতই স্বচ্ছন্দ যে মনেই হয়নি এর মধ্যে কোনো গভীর শিল্পচাতুর্য আছে। হাঁপানি না হলে যেমন বোঝাই যায় না যে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াটাও শরীরের একটা কৃত্য। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রায়ই হাঁপানি হবার মতন করে শ্বাস টানি। এমনই সচেতন ঘোরালো আঙ্গিক, এমনই অ-সহজ জোরালো দাবি বানিয়ে তুলি যে পাঠকেরা হাড়ে মজ্জায় টের পেয়ে যান— হ্যাঁ, এই একজন 'শক্তিশালী' সাহিত্যিক বটে।

আত্মসচেতন পশ্চিমি পাণ্ডিত্যের স্বাদ গন্ধ না থাকলে আমাদের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক সত্তাটি সহজে সত্যের কাছে নত হতে চায় না। দেখেও যে ভয় হয়— আমরা কি তবে সত্যি জাত ভিখারি হয়ে গিয়েছি?

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা যদিও বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিতে, কিন্তু ওই পটভূমিটি অতি সহজেই প্রসারিত হয়ে পড়তে পারে, সর্বভারতের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো অংশ জুড়েই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ভারতীয় মনের প্রধান সমস্যা, গ্রাম বনাম শহরের দ্বন্দ্ব। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই জগতের মধ্যে যে টানাপোড়েন, এই দুই যুগের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মাঝখানে পড়ে ব্যক্তি মানুষের যে স্ববিরোধ, তার সূক্ষ্মতম যন্ত্রণাও আশাপূর্ণার নজর এড়ায় না। এবং সেই কঠিন বিষয়বস্তুগুলি তিনি খুব ঝরঝরে ঘরোয়া ভাষায় লিখে ফেলতে পারেন। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার এবং নিত্য পরিবর্তনশীল সেই দ্রুতগতির জগতে মানিয়ে নেওয়ার যে অশেষ যুগ-যন্ত্রণা, সামন্ততান্ত্রিক ভুবন থেকে শহুরে ধনতন্ত্রের সমাজে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেসকল আত্মিক পরিবর্তন ঘটে, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের জোড়গুলো কীভাবে খুলে খুলে যায়, প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি গুঁড়ো হয়ে গিয়ে কেমনভাবে জায়গা করে দেয় নবীনকে— আর তাতে প্রাচীন ও নবীন উভয়েই কেমন করে পায় অমৃতবিষের দ্বন্দ্ব-মেশানো স্বাদ— অর্থনৈতিক মানুষ আর নৈতিক মানুষ কীভাবে এক একটা জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে মাটির মধ্যে মিশে মিশে যায়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর গল্প উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের এই প্রত্যেকটি দিকই খুব যত্নের সঙ্গে উদ্ঘাটিত। এবং এই দিক দিয়ে তিনি সর্বভারতীয় আধুনিক সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক বলে আমি মনে করি তাঁর উপন্যাস এবং গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি প্রায়ই নারী। নারী, কিন্তু 'নায়িকা' বলতে যা বোঝায়, তা তারা নয়। তারা নারী-নায়ক। গল্প তাদেরই। আধুনিক নায়কের যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্যভাবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাদের চরিত্রে উপস্থিত। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়লে মনে হয় মেয়েদের জীবনে দ্বন্দ্ব কেবল তিন জাতের : পিতা বনাম প্রেমিক, অথবা দারিদ্র্য বনাম সুখস্বপ্ন, অথবা নিষ্ঠুর জটিল সংসার বনাম কোমল সরল হৃদয়। আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় দেখা যায় মেয়েদের জীবনে আরও বহু বিচিত্র, সূক্ষ্ম, জটিল, তত্ত্ব আছে। আছে নানান মানবিক দ্বন্দ্ব— মানবিক যন্ত্রণার অসহায় পীড়ন। তাঁর নারীরা শুধুমাত্র নারীই নয়, তারা মানুষ। দুর্ভাগ্যবশত আমরা পাঠকরা সবসময়ে ঠিক বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করি না, চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে অন্যের মতামত ধার করে ফেলি।

আশাপূর্ণা দেবী কেবল মধ্যবিত্ত ঘর সংসারের কথাই লেখেন বলে তাঁর শিল্প মহৎশিল্পের স্তরে উন্নীত হয়নি— এমন সমালোচনা কানে আসে না বললে মিথ্যাচরণ করা হবে। অথচ অভিযোগটি নেহাতই অর্থহীন।

পুরুষ এবং নারী উভয়কে নিয়েই তো 'সংসারজীবন'। লেখকের চোখটা যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের ওপরই নিবদ্ধ তখন সেই সাহিত্যের উপজীব্য হয় সংসার নয়, 'জীবন'— যেমন চাকরি থাকা-না-থাকা, প্রেম ঘটা-না-ঘটা, বা রুচিকর জীবন জোটা-না-জোটার প্রশ্ন। এগুলো 'যুগযন্ত্রণা'। কিন্তু লেখকের নজর যেই নিবদ্ধ হয় নারীর দিকে, তখনই সেই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে যায় জীবনের বদলে 'সংসার'! মূল প্রশ্ন হয়তো সেখানেও সেই একই : যথা

(স্বামীর) চাকরি থাকা-না-থাকা, প্রেম ঘটা-না-ঘটা, রুচিকর জীবন জোটা-না-জোটা। তবু, সেটা আর 'যুগযন্ত্রণা' হয়ে ওঠে না, সেটা যত সব মেয়েলি যন্তন্না হয়ে যায়। বিচারের এই ভারসাম্যহীনতায় যে অন্ধ জ্ঞানের অভাবটি পরিলক্ষিত হয়, দুর্জনে তাকেই বলে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টি (আর মেমসায়েবরা বলেন male chauvinism)।

অধুনা যে 'এলিয়েনেশন' নিয়ে এত বাক্ বিস্তার করি আমরা, আশাপূর্ণা দেবীর গল্প উপন্যাসে বহুদিন থেকেই অদ্ভুত এক 'এলিয়েনেশন'-এর চরিত্রচিহ্ন দেখা যায়। সংসারের পটভূমি ব্যবহার করে তিনি সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, 'বিচ্ছিন্ন' ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা বারংবার সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। এবং 'বিচ্ছিন্নতা' বোঝানোর জন্য সংসারের চেয়ে শ্রেয়তর পটভূমি আর কোথায়? কোনো চায়ের স্টল, পথের মোড়, মদের দোকান, মাঠ ময়দান অথবা কোনো মেসের কামরাই 'বিচ্ছিন্নতা'র ঘর-গৃহস্থালির চেয়ে যোগ্যতর নিষ্ঠুরতর যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

আশাপূর্ণার নারী-নায়করা পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ। বাংলা সাহিত্যে যে ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না— নারীরা 'মেয়েমানুষ'-এর ভূমিকা ছেড়ে শুদ্ধ 'মানুষ'-এর দিকে খুব একটা নড়তে পারে না! পুরস্কৃত উপন্যাসটি একটি ট্রিলজির প্রথম খণ্ড। নারীর লেখা ত্রিধারাবিভক্ত এপিক উপন্যাস, ভারতীয় সাহিত্যে, যতদূর জানি, এই সর্বপ্রথম। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বইতে দেখতে পাই উনিশ শতকের বাংলার গ্রামীণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি যুক্তিবাদী মেয়ের একক লড়াই— সৎসাহস ভিন্ন যার আর কোনো হাতিয়ার নেই। তার স্বপ্ন তার আদর্শ ছিল নিছক নারীত্বের মধ্যে শৃঙ্খলিত, সীমায়িক হয়ে না থেকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া নিজের জীবনে যা ঘটেনি সেই স্বাধীনতার ভিত্তি যুক্তিবাদ ও শিক্ষার সাহায্যে গড়ে দিতে চায় সে তার সন্তানের জীবনে। মেয়েমানুষকে শুধু মানুষ করে তোলার আদর্শের জন্য যেকোনো যুদ্ধে রাজি সেই মেয়ে। যাবতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে পা বাড়াতে তার দ্বিধা নেই। স্বামী, সংসার, সমাজব্যবস্থা— সব কিছু প্রতিকূল হলেও সে তার আদর্শে স্থির, তার সংগ্রামে অটল। তবুও, সমষ্টি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে পরাজিত করে, প্রতারণার মাধ্যমে। কিন্তু এই নকল পরাজয় মেনে নেয় না আশাপূর্ণার নারী-নায়ক— অন্যায় যেখানে জিতে যায়, সেই সংসারকে সে সর্পদষ্ট আঙুলের মতো পরিত্যাগ করে যায়। শেষ পর্যন্ত সত্যের জন্য তার একক জেহাদে সে স্থিত থাকে।

বলা বাহুল্য কলমের এই প্রচণ্ড প্রহারপরায়ণ বলিষ্ঠতা 'ঘরকন্না'-প্রসূত নয়, এই দার্ঢ্য একমাত্র মেধা থেকেই উত্থিত হতে পারে। এই অসামান্য কবজির জোর ঋজু ও সৎ মননশক্তির ফসল। উনিশ শতকের নবজাগরণ কীভাবে দূর গ্রামের বুকে পৌঁছে একটি সমাজবিঘ্নিত মানুষকে বিঘ্ন অতিক্রম করে পূর্ণতার দিকে যাবার মানসিক প্রস্তুতি জুগিয়েছিল— 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তারই মহান কাহিনি। বিষয়বস্তুর গভীরতা, চমৎকারিত্ব এবং গুরুত্ব, সব দিক থেকেই পুরস্কৃত বইটি এই নারীমুক্তির দশকের যোগ্য বাছাই হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী কেবলমাত্র দর্পণের কাজ করেই ফুরিয়ে যান না, লেখার মধ্যে একটা ব্যঞ্জনাময় পথনির্দেশও নিহিত থাকে। তাঁর রচনায় সর্বাঙ্গীণ যে সরসতা তাতে wit, humour ও irony সবই আছে, কিন্তু তিক্ততা নেই— তাঁর বুদ্ধির তীব্র প্রাখর্য আলো দেয় কিন্তু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় না। মনুষ্যত্বকে হার মানিয়ে তিনি যে গল্প শেষ করেন না এজন্য ভবিষ্যৎ একদিন তাঁর কাছে নিশ্চয় কৃতজ্ঞ হবে। সাহিত্যে, শিল্পে অস্তিবাচক জীবনদর্শনের নাগাল পাওয়া, ইদানীং খুবই জরুরি বলে মনে হয়।

কাকাবাবুকে বিদায় প্রণাম

বর্ষশেষ। বিদায়ী সত্তরের দশকের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশের দশকের একটি উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত হল। 'প্রগতি' 'কল্লোল' 'কবিতা'র যুগের অন্যতম প্রধান 'মালতী'-র কবি অজিত দত্ত মহাপ্রয়াণ করলেন গতকাল ৩০ ডিসেম্বর। জীবনের প্রথম থেকেই যাঁর কবিতায় ছিল 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', 'সুশীতল মধুর বিষাদ' আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে যিনি লিখেছিলেন 'মার কোলে মাথা রাখি নিরুদ্বেগ রাজশিশু-প্রায়/যদি মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়ি ধীরে ধীরে'— নিরুদ্‌বেগ রাজশিশুর মতোই শুভ্রশয্যায় তিনি শুয়েছিলেন। ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের সেই পুরাণ-প্রায় বাড়িটির তিনতলায়, তাঁর শোবার ঘরে। বছর দশেক ধরেই শরীর ভেঙেছে, গত চার পাঁচ বছর এই ঘরটিতেই তাঁর জীবনযাপন, এক বছর তো শয্যাবন্দি ছিলেন। চলৎ শক্তি গিয়েছিল, দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। বয়েস হয়েছিল বাহাত্তর। ১৯০৭-এর ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরে জন্ম। রাজপুত্রের মতোই রূপ নিয়ে জন্মেছিলেন অভিজাত বংশে, পিতামহ রায়বাহাদুর চন্দ্রকুমার দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় দফার গ্রাজুয়েট।

যে তীক্ষ্ণ সমতা ছিল তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে, তাঁর নাতিকৃশ দীর্ঘ গৌর শরীরে, সেই ক্ষুরধার সমতার ছাপ ছিল তাঁর মননেও। ছাত্র হিসেবে অসামান্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. এবং এম.এ. দুয়েতেই সংস্কৃত ও বাংলার প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে কলকাতাতে এলেন অধ্যাপনার কাজে। রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে শুরু, চন্দননগর কলেজ, বারাসাত, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ানোর পরে যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০-এ অবসর নেবার সময়ে তিনি ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান।

জীবিকায় পণ্ডিত হলেও, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণেই কবি। পণ্ডিতি প্রবন্ধ লেখার ঝোঁক ছিল না তাঁর। তবুও তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস' (১৯৬০) সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কীর্তি। এককালে রোমান্টিক কবিতার তুলনাহীন অজিত দত্ত। ছাত্ররা যে, ঢাকাতে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে কবিতার পত্রিকা প্রকাশের অভিনব প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন। সেই বন্ধুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, পরিমল রায় ও অমলেন্দু বসু। এবং অবশ্যই ছিল প্রভু গুহঠাকুরতার উৎসাহ। বুদ্ধদেব ও অজিতের গভীর বন্ধুতা ছাত্রজীবন থেকে গড়িয়ে এসেছিল প্রাত্যহিকতায় ও কর্মজীবনেও। একসঙ্গে 'প্রগতি' পত্রিকার শুরু করেন দুজনে। তার পরে যোগ দেন কল্লোল দলে। প্রগতি পত্রিকাকে এক অর্থে কবিতা পত্রিকার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। কলকাতাতে এসে কবিতা পত্রিকা যখন শুরু হয়, সেখানে গোড়া থেকেই অজিত দত্ত ছিলেন অন্যতম প্রধান লেখক। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' কবি অজিত দত্ত-কে উৎসর্গিত, আবার তেমনিই, অজিত দত্তের প্রথম বই 'কুসুমের মাস' তিনি উৎসর্গ করেছেন বুদ্ধদেব বসুকে। দুজনে বসবাস করেন একই গৃহে, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে, দুটি ফ্ল্যাটে।

অজিত দত্তর 'কুসুমের মাস' (১৯৩০) 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮) এখনও সমবয়সিদের স্মৃতিতে অঢেল পঙ্‌ক্তির জোগান দিয়ে চলে। কিন্তু অজিত দত্ত শুধুই যে প্রেমের কবিতা লিখতেন তা নয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবিতা, এবং ছড়াতেও তাঁর হাত ছিল অসামান্য। এমনও বলা যাবে না যে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরনে লিখেছেন— কেননা যে বছরে 'মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম/মালতী সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম' (১৯৩৪) লেখা হয়েছে, সেই বছরেই লিখেছেন 'তুমিও বিখ্যাত হলে, সেই দুঃখে লিখি না কবিতা'! (১৯৩৪) সনেট রচনায় তাঁর দক্ষতা সর্বজনগ্রাহ্য। সংস্কৃত শিক্ষার ধ্রুপদি পটভূমির জন্যই হয়তো তাঁর রচনার মধ্যে একটা শ্লোকের মতো ঘনসংবদ্ধ হিসেবিয়ানা ছিল। মনে-প্রাণে কবি তিনি মনে-প্রাণে বাঙালিও। চল্লিশ বছর ধরে যিনি একই বাড়িতে, একই ঘরে, তিনি ঘরকুনো ছিলেন নিশ্চয়ই। ভ্রমণের বিষয়ে, তাঁর রম্যরচনাগ্রন্থ জনান্তিকে-তে তাঁর অসামান্য মন্তব্য— ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে, আর নিশ্চিন্ত আরামে হাত-পা ছড়িয়ে না শুলে আমার ঘোরাই হয় না! ১৯৩৩-এ তাঁর বিবাহ হয় দিল্লি প্রবাসী মেয়ের সঙ্গে, সেই সূত্রে দিল্লিটায় তাঁর যাওয়া হত। বাইরে থেকে দেখলে তাঁর জীবন তরঙ্গহীন। কিন্তু কবিতা পড়লে বোঝা যায়, তাঁর অন্তর্লোক তরঙ্গহীন ছিল না, বরং ছিল নিত্য উপদ্রুত এলাকা। যুদ্ধের সময়ে লেখা 'নষ্ট চাঁদ'-এ তার প্রমাণ অনেক। মূলত অজিত দত্ত ছিলেন অভিমানী, নিঃসঙ্গ, একক পুরুষ। প্রথম জীবনের কয়েকটি বন্ধুত্বের বাইরে বড়ো একটা পা বাড়াননি। কল্লোলের প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী, এদের সঙ্গে এককালে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। পুনর্জবা (১৯৪৬) অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে উৎসর্গিত। জনান্তিকে (১৯৪৯) দিয়েছেন ভূপতি চৌধুরীকে। মনপবনের নাও রম্যরচনাগুলি 'রৈবত' এই ছদ্মনামে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৫০-এ বই আকারে বেরোয়। উৎসর্গিত প্রগতিযুগের বন্ধু পরিমল রায়কে।

পুস্তক প্রকাশনাতেও অজিত দত্তের প্রবল উৎসাহ ছিল একসময়ে। 'দিগন্ত' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা গড়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার অনেক নবীন লেখকের প্রথম বই। যেমন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অন্যনগর, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ইরাবতী। দিগন্ত নামে যে সাহিত্য বার্ষিকীটি তিনি সম্পাদনা করতেন তাতে সেযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকরা প্রত্যেকেই লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই বিখ্যাত স্টোভ গলা একরাত্রে প্রস্তুত হয়েছিল এই দিগন্তের জন্যই। কবিতা পড়া কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর নেশার মধ্যে প্রধান ছিল চা। বৈঠকি গল্পে তাঁর জুড়ি ছিল না, কথক হিসেবে তিনি প্রিয় ছিলেন আবালবৃদ্ধের। আর ভালোবাসতেন আগাথা-ক্রিস্টির বই। অনেকের হয়তো জানা নেই যে আমাদের দেশের প্রচার-বিষয়ক কাজের পথিকৃৎদের মধ্যে কবি অজিত দত্তের অনেক মূল্যবান অবদান আছে।

চা ছাড়া ছিল গড়গড়ার নেশা। আরও একটি জিনিস তিনি ভালোবাসতেন, মাছ ধরা। কিন্তু মৎস্যশিকারের যোগ্য ধৈর্য ছিল না তাঁর। ছিপে মাছ না পড়লে ছিপ ছুড়ে দিয়ে উঠে আসতেন। স্ত্রী, চার পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা ও ছয় নাতিনাতনির বাইরে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছিল। শেষ জীবনের এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে ছিপ ছুড়ে ফেলবার মতো একটা নিঃশব্দ অভিমান কাজ করে যেত। এককালে ছিল দাবার নেশা আর তাসের।

শেষজীবনে একা একা বসে পেশেন্স খেলতেন। আর করতেন কবিতা আবৃত্তি। দৃষ্টি চলে যাবার পরে মুখে কবিতা তৈরি করতেন, গতবছরেও পুজোয় তাঁর তিনটি লেখা বেরিয়েছে।

যদিও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটি ও সাহিত্য আকাদমি উপদেষ্টা সংসদের সদস্য, উল্টোরথ পুরস্কার ভিন্ন নিজের জীবনে তিনি কোনো পুরস্কার পাননি। ১৯২৮-এ তিনি লিখেছিলেন 'আমি সেই ব্যর্থ কবি যারে শুধু শুনেছে দেবতা'। কিন্তু তিনিই অন্যথা এর উত্তর দিয়েছেন 'প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির? ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির? নইলে রইলে—'

কবি অজিত দত্ত কুস্তির প্যাঁচও জানতেন না।

সুদূরের পিয়াসী বিভূতিভূষণ এবং আজকের আমরা

আমার ছেলেবেলায় আমাদের 'ভালো-বাসা' বাড়িতে নানান ক্ষেত্রের গুণী মানুষের আসাযাওয়া ছিল। তাঁদের মধ্যে আমার প্রিয় ছোটোদের লেখকও অনেক ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার র য়, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাদুকর পি সি সরকার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ছোটোবেলায়, সাদা হাফহাতা শার্ট, ধুতি পরে আমার মা বাবার সঙ্গে গল্প করতে তিনি বাড়িতে আসতেন। খুব ছেলেবেলায় একবার তাঁদের ঘাটশিলার বাড়িতেও বেড়াতে গিয়েছি। স্বল্পভাষী, গম্ভীর, কিন্তু স্নেহময় মানুষ মনে হয়েছিল তাঁকে। পথের পাঁচালির লেখক বলেই তখন তাঁকে চিনি। ১৯৫০এ ইয়োরোপে গিয়েছিলুম আমরা। তখন লন্ডনে আছি, একদিন ডাক এলে, একটি চিঠি মায়ের হাত দিয়ে বাবা কিছু বললেন। মা চোখে কাপড় দিলেন। সেই বাবাকে সর্বপ্রথম চোখের জল মুছতে দেখি। পরে জেনেছিলুম, সেই চিঠিতে বিভূতিভূষণের মৃত্যুসংবাদ ছিল। তখন তো বুঝিনি কত বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল বাংলা সাহিত্যের! তখনো কিন্তু চাঁদের পাহাড় পড়িনি আমি, হীরামানিক জ্বলে-ও না। যখন পড়লুম, তখন চোখে-দেখা মানুষটির সঙ্গে মেলাতে পারলুম না। আমি আঁটির ভেঁপু সেই লেখকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ ছিলো। পরে আরণ্যক-এর সঙ্গেও চেনা মানুষটির মিল পেয়েছি। কিন্তু চাঁদের পাহাড়, আর হীরামাণিক জ্বলে-র বেলায়? সেই নিরীহ ভদ্রলোককে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমিতে, ঘোর শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের বন্দুক হাতে ঘুরতে কল্পনা করতে পারিনি। অথচ চাঁদের পাহাড় ছিল আমাদের কৈশোরের স্বপ্নখনি। শুধুই বই পড়ে আর মানচিত্র দেখে যে এমন নিখুঁত লেখা সম্ভব, তা সহজে সমালোচকদেরও বিশ্বাস হয় না। বালি জাভা সুমাত্রায় না গিয়ে, পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ ভ্রমণ না করেও তিনি 'হীরামাণিক জ্বলে'-তে পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়ে ভাষাচিত্রে এঁকেছেন কোনো এক দ্বীপের পর্বত কন্দরে লুপ্ত হিন্দু সাম্রাজ্যের সভ্যতার কাহিনি। কোনো দ্বীপেই না গিয়ে, পূর্বপ্রাচ্যে পদপাত না করে' আংকোর ভাটের ধরনের এক সুপ্রাচীন, হিন্দু মন্দিরের সুসংরক্ষিত গোপন বিপুল রত্নভাণ্ডারের অকল্পনীয় জাদুজাল ভাষায় সৃষ্টি করা একমাত্র অসামান্য প্রতিভা ভিন্ন সম্ভব নয়। আমি আবাল্য মোহগ্রস্ত ছিলুম এই দুটো বই নিয়ে। বুভুক্ষু সিংহ, বিষাক্ত কাল সাপ, আর বুনিপ, এক ভয়াবহ হিংস্র রহস্যময় শক্তির আতংকের সঙ্গে লড়াই করে' দক্ষিণ আফ্রিকার অরণ্যকন্দরে শংকরের হীরের খনি আবিষ্কার, আশ্চর্য মানুষ দিয়েগো আলভারেজ, আর ওদিকে সুদূর প্রাচ্যের অচেনা দ্বীপে পড়ে থাকা লুপ্ত হিন্দু সভ্যতার গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার, এবং পেয়ে হারাবার রহস্যঘন কাহিনি নিয়ে তো আমি একা মুগ্ধ ছিলুম না, আমাদের গোটা প্রজন্মকে জাদু করে রেখেছিল এই দুটি বই। কল্পনার আকাশে পাখা মেলে দিয়েছিল আমাদের। তার পরে দেখি আমার মেয়েরাও বড়ো হবার সময়ে, ইশকুলে থাকতে, বিমুগ্ধ চিত্তে পড়ছে আমার ছোটোবেলার প্রিয় বই দুটি।

বইগুলি বাংলা কিশোর সাহিত্যের ক্লাসিক বলে বহুদিন আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি তো 'চাঁদের পাহাড়' বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে শুনেছি। আশা করি 'হীরা মানিক জ্বলে'-ও কোনোদিন বাংলার ছোটোদের জন্য চলচ্চিত্রায়িত হবে। বই দুটিতেই রহস্য রোমাঞ্চের সঙ্গে, তীব্র দমবন্ধ নাটকীয়তার সঙ্গে আছে ইতিহাস-ভূগোলের, পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিশাও। আশ্চর্য একজন মানুষের লেখা অত্যাশ্চর্য দুটি বই, বলতে দ্বিধা নেই। সব চেয়ে ভালো লাগে, বই দুটির মধ্যে যে চির তরুণ আর চির উৎসুক মন আছে, তার কোনোদিনই বয়েস হবার নয়। এই বই দুটিও কোনোদিনই বাতিল হয়ে যাবার নয়। যে একবার পড়েছে তার শিরায় শিরায় বয়ে গিয়েছে এর শিহরণ। আমি যখন প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই, আমার শুধু যে নেলসন ম্যানডেলার নাম মনে পড়েছিল আর গান্ধীজীর মুখ মনে পড়েছিল তা নয়। নির্ভীক অভিযাত্রী দিয়েগো আলভারেজের কথা, বাঙ্গালি ছেলে শংকর, আর চাঁদের পাহাড়ের কথাও মনে পড়েছিল বৈকি। আবার দ্বীপময় ভারতের নিজস্ব ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির চিহ্ন ধরে রাখা দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলোতে, বালি জাভা মালয়েশিয়ায় ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সুশীল আর সনৎকে, হীরামানিক যদিও খুঁজে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন সর্বত্র যান আমার সঙ্গে, ততটা না হলেও, অন্তত এই দুই দেশে বিভূতিভূষণও পৌঁছে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

কে বলে বাঙ্গালি ঘুরকুনো ছিল? এখনও কেউ যদি বলে, তার পড়া উচিত বিভূতিভূষণের এই বইগুলি। আমরা এখন তো দেখতেই পাচ্ছি, বাঙ্গালি ছেলেমেয়েদের অ্যাডভেনচারের আগ্রহ সীমাহীন। এভারেস্টে চড়তে, দক্ষিণ মেরু-অভিযানে বেরুতে, সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করতে, বাঙ্গালি ছেলে কেন, মেয়েরাও পিছিয়ে থাকছে না। বাঙ্গালি ছেলেমেয়েদের মধ্যে অজানাকে জানবার, দূরের রহস্যকে মুঠোয় এনে জীবনকে বশ করবার নির্ভীক, ব্যগ্র কৌতূহল রয়েছে। এই দুটি বইতেই সুদূরের পিপাসা প্রবল। ইতিহাস-ভূগোলের খুঁটিনাটিতে লেখক একেবারে নির্ভুল। বইগুলি যৌক্তিকতায়, দুঃসাহসে আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, এবং মানবিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল।

এই দুখানি বই আমি জ্বরে পড়ে আছি বলে আর একবার পড়বার সুযোগ পেলুম। বিভূতি ভূষণ নিজে তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন 'চাঁদের পাহাড়' কোনো ইংরিজি বই-এর অনুবাদ নয়। কেননা, আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে, তিনি জানতেন, বাংলায় এরকম কোনো বই লেখা হয়নি। বইটির গল্প, আর তার গল্প বলার চাল, কোনোটা দেখলেই মনে হবে না, এই বই কোনো ঘরকুনো বঙ্গসন্তানের অধ্যয়ন আর কল্পনার ফসল হতে পারে। তিনি সব সোর্স উল্লেখ করে দিয়েছিলেন, সৎ গবেষকের মতো। কিন্তু 'হীরামানিক জ্বলে'-র গরিব হয়ে পড়া জমিদারবাড়ি, আর গুপ্তধন খুঁজতে বেরোবার বিষয়বস্তুটি অন্তরে অন্তরে এতই বাঙ্গালি, যে তাঁকে ও নিয়ে ভণিতা করতে হয়নি। অনাস্বাদিত চমক রয়েছে প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জের ব্যবহারে। বইগুলি অনেক দিন আগে লেখা, কিন্তু পুরোনো হবার নয়।

সারা বিশ্ব জুড়ে কতো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কতো বই লেখা হচ্ছে, প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে মানবজাতির। আমাদের সামনে সীমাহীন সম্ভাবনা।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা ইন্টারনেটের যুগে বাস করছি। কিন্তু বিভূতিভূষণের ম্যাজিক কলমের স্পর্শে 'চাঁদের পাহাড়', আর 'হীরামাণিক জ্বলে', চিরদিনের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এ বই

পুরোনো হয়ে যাবার নয়। এই তো বই দুটো এত বয়েসে আরও একবার পড়লুম। অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে পদে পদে পাতা উলটে অবাক হওয়া জরুরী, আর এক্ষেত্রে তো গল্প জানি, অভিয়ানের পরিসমাপ্তি কেমন হবে, কীভাবে হবে, সে খবর দুটো বই-এর বেলাতেই আমার জানা। মজা এই, জেনেও প্রথমবার পড়ার মতই টান টান কৌতূহল বজায় রইল। পছন্দসই সিনেমা বারবার দেখার মতন এ বইগুলো বারবার পড়লেও কোনোদিন পুরোনো হবে না। এ সব চিরকেলে বই, কি বড়োদের, কি ছেটোদের মন টানবেই। এর পরের বারে পড়তে হবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বই। বিমল-কুমার, কিম্বা জয়ন্ত-মানিক। সুন্দরবাবু, রামহরি, বাঘার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন।

ট্রান্স ক্রিয়েটর

প্রফেসর লাল চলে গেলেন।

পি.লাল নিজেই ছিলেন কলকাতার একটি ঝলমলে প্রতিষ্ঠান, তিনি একাই এক-শো। আজকের ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ-এর এমন সচ্ছল অবস্থায় অল্পবয়সিরা হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না, এককালে কলকাতা শহরে বসে ইংরিজি ভাষাতে সাহিত্যরচনায় উৎসাহ দান কতটা কঠিন ও কতটা দুঃসাহসের কাজ ছিল। একের পর এক ডাকসাইটে বাঙালি কবি সেখানে ইংরিজির ছাত্র/অধ্যাপক ছিলেন এবং আমরা, নতুনরা মনে করি বিদেশি শাসকের মুখের ভাষা ধার করে আমার মনের কথা উচ্চারণ করার মধ্যে অপমান আছে। কবিতার ভাষা হবে আদরের ভাষা, শাসনের ভাষা নয়। বাংলায় কবিতা না লিখে ইংরিজিতে লিখব কেন? লজ্জা করবে না?

প্রফেসর লাল তাঁর একান্ত, একক প্রচেষ্টায়, আমাদের মনের জড়তা ঘোচাতে চেষ্টা করছিলেন। ইংরিজিতে সাহিত্যচর্চা মানেই যে ইংরেজের পদলেহন নয়, দেশমাতৃকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও নয়, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতাতে, তিনি একক প্রচেষ্টায় ভারতীয় ইংরিজি সাহিত্যের একটি আঁতুড়ঘর গড়ে তুলেছিলেন। সেই আঁতুড়ঘরের নাম 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ'। আমাদের মতো কিছু লোক বাংলা ভাষার কাছে নাড়া বেঁধে ফেলেছি, তাই প্রফেসর লালকে শ্রদ্ধা করলেও লালের ওয়ার্কশপ আমাদের জন্য ছিল না। আমাদের ছিল 'কবিতা ভবন'।

কিন্তু ষাট সত্তরের দশকে, আশির দশকেও ভারতের নানা জায়গা থেকে আমার বন্ধুবান্ধব, নিজেদের রচনা প্রকাশে আগ্রহী ইংরিজি ভাষার হবু লেখকেরা কোনো কাজে কলকাতায় এলে, কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বদলে একবার প্রোফেসর পি লালকে দেখতে যেতে চাইতেন। কলকাতার লোকের কাছেও মানুষটি বেশ রহস্যময়। ওই স্থিতপ্রজ্ঞ মুখচ্ছবি, মুনি ঋষির মতো নির্মেদ, দীর্ঘদেহ, তার ওপরে কখনো পাদরিদের মতো সাদা আলখাল্লা, বুকের ওপরে ওটা কী? যিশুর ক্রস দুলছে? না অন্য কিছু? সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ান, উনি কি নিজেও পাদরি? বেশ রহস্যময়! তবে যে শুনি কালিদাস নাগের জামাই? বাইরের দর্শকদের কাছে শুধু তো তিনি নিজেই নন, তাঁর স্টাডি, তাঁর প্রেস, সবই ছিল দ্রষ্টব্য, অতিথিদের কাছে পরম কৌতূহলের বিষয়। লেখক, অধ্যাপক তো কত আছেন। কিন্তু নিজেই নিজের মুদ্রক, প্রকাশক কতজন? এবং অচেনা লেখকদেরও লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে তুলে জনসমক্ষে বের করে আনার, চিনিয়ে দেবার কাজ ক-জনে করেন? (হ্যাঁ বুদ্ধদেব বসু করেছেন, 'কবিতা ভবন' থেকে।) নবীন প্রবীণ উভয় শ্রেণির নতুন লেখকরাই নিজেদের বই-এর সম্ভাবনা নিয়ে প্রফেসর লালের সঙ্গে কথা বলতে যেতেন, বুক দুরুদুরু। শুনেছেন প্রফেসর লাল স্বল্পভাষী, এবং স্পষ্টভাষীও, যেটা বলেন, তাতে স্থির থাকেন, কিন্তু তিনি মিষ্টভাষীও বটে। ভয়ের কিছু নেই, নতুন বই-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে দেখা করুন। পাঠকের পাতে দেবার মতো বস্তু থাকলে বই হবে। অখাদ্য লেখা না হলে

তিনি নতুন লেখকদের হতাশ করবেন না। আমার চেনা, অল্প চেনা কত জনের যে প্রথম বইটি প্রফেসর লাল-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রকাশ পেয়েছে! তার পরে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং পাঠকসংখ্যাও। পরবর্তীকালে তাঁরা বড়ো প্রকাশকও পেয়ে গেছেন বাণিজ্যিক সংস্থায়। এই প্রথম প্রকাশিতদের মধ্যে একটি ভুবনবিখ্যাত নাম, বিক্রম শেঠ। ইংরিজি ভাষার বড়ো প্রকাশকরা সহজে কবিতা ছাপেন না। বাজার নেই কবিতার। নতুন কবি, পুরোনো কবি, সব সমান। আর অনুবাদ? কীসের? দেশি ভাষার লেখকদের কবিতার, উপন্যাসের? রক্ষে করো! ও জিনিস কোথাও চলে না। বিদেশি ভাষার থেকে হলেও-বা কথা ছিল।

এই অমিত্রসুলভ মনোভাবের মোকাবিলা করেছিলেন প্রফেসর লাল, 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ' সৃষ্টি করে। তিনি নিজের এই সযত্ন প্রয়াসে হাতে করে বই তৈরির কাজটির নাম দিয়েছিলেন, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। সবটাই তাঁর বাড়ির গ্যারাজে তৈরি হচ্ছে। (প্রীতীশ নন্দীর এ নিয়ে সুন্দর মন্তব্য আছে। তিনিও রাইটার্স ওয়ার্কশপের আবিষ্কার।) কাগজ কেনা, ছাপা, বাঁধাই সবই তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। হাতে করে প্রতিটি অক্ষর বসিয়ে ছাপা, হাতে সেলাই করা, হাতে বাঁধাই। এই বই তৈরির, বই সাজানোয় রুচি ভাবনায় নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী শ্যামশ্রীর প্রচুর অবদান ছিল। ওঁদের তিন বোনের সাজসজ্জায় এবং সাজিয়ে তোলার ক্ষমতায় এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনও আছে। সিঁদুরেলাল, সমুদ্রনীল, বেগুনি, গেরুয়া নানা উজ্জ্বল রঙের গ্রামীণ তাঁতের শাড়ি, আর তার কারুকাজ করা পাড় দিয়ে তৈরি হত দারুণ সুন্দর চোখ ধাঁধানো এথনিক মলাট। রুচিসুন্দর বইগুলি হাতে নিলেই মন ভরে যেত, সর্বত্র চেনা যায় রাইটার্স ওয়ার্কশপের বই। প্রতিটি আলাদা করে সুশ্রী! 'এথনিক' হুজুগ ষাটের দশকে ওঠেনি, কিন্তু রাইটার্স ওয়ার্কশপে ভাবনাটি এসে গিয়েছিল। ইংরিজি ভাষায় লেখা, কিন্তু বিদেশি বই নয়। ইংরিজি ভাষাটাকেও এখন ভারতেরই একটি অল্পবয়সি ভাষা বলে মেনে নিতে হবে, তাকে বিদেশি বলে দূরে রাখা চলবে না। এ আমাদের দেশের ইংরিজি, এর হৃদয়মন, গড়নপেটন, চিন্তাধারা, সবই আমূল দিশি, তাই এই সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য। একে বলে ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ। শুধু মলাটে নয়, প্রফেসর লালের মতে 'রাইটার্স ওয়র্কশপ'-এর বইয়ের ভিতরে-বাইরে, অন্তরাত্মায় কোথাও কোনো বিদেশিয়ানা নেই।

আপনি ইংরিজিতে লেখেন? কবিতার বই ছাপাতে চান? প্রকাশক নেই? আপনাকে শুধু পরিচ্ছন্ন টাইপড পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে দিতে হবে। যদি মনোনীত করেন, তার পরে সবটুকু দায়িত্ব প্রফেসর লাল-এর। প্রুফ দেখা থেকে লে আউট, মলাটের ডিজাইন, নামের লিপি, নিজের হাতে সব। বইয়ের নামাঙ্কনও স্বহস্তে। এই চমৎকার কাজের জন্যে তিনি ব্যবহার করতেন ক্যালিগ্রাফির জন্য তৈরি, শেফার্সের বিশেষ নিবের কলম। এক সময়ে তিনি বইয়ের পরিচয়পত্রে এসব কথাও লিখতেন, তাই জেনেছি। হ্যাঁ, ছাপা বাঁধাই, কাগজ কেনার খরচ আপনাকে কিছুটা দিতে হবে, তার বদলে কিছু বই আপনি পাবেন। বাকি ভার তাঁর। পরিবেশনা, প্রচার, অর্থাৎ বইয়ের দোকানে, ও দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগারে সরবরাহ, সব তাঁর। বিজ্ঞাপনও যেতে দেখেছি আমি রাইটার্স ওয়ার্কশপের বইয়ের। ইংরিজি কবিতার বইয়ের প্রকাশক কোথাও মিলত না বলে, একদা প্রফেসর লালের কল্যাণে বহু তরুণ ভারতীয় কবির কবিতার বই এই কলকাতা শহর থেকে বেরিয়েছে, পরে তাঁরা বিশ্বসভায় স্থান পেয়েছেন। 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ'-এর প্রকাশনা

বিষয়ে সগৌরবে প্রফেসর লাল লিখেছিলেন, 'It does not print well-known names, it makes names known, and well-known, then leaves them in the loving clutches of the so-called "free" market.' সেকথার সত্যতা প্রমাণিত। তাঁর প্রকাশিত লেখকদের মধ্যে বিক্রম শেঠ ছাড়াও ছিলেন, নিসিম ইজিকিয়েল, কমলা দাস, এ.কে. রামানুজন, অরুণ কোলাটকর, জয়ন্ত মহাপাত্র, জীভ প্যাটেল, আদিল জাসাওয়ালা, ডম মোরেজ, শশী দেশপান্ডে, অনিতা দেশাই, কেকি দারুওয়ালা, আরও অনেকে। এঁরা প্রত্যেকে এখন ইংরিজি পাঠকদের বিশাল ভুবনে অতি পরিচিত, প্রিয় নাম। লেখক তৈরির কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়, খুব বেশি লোকে করেনওনি।

ট্রান্স ক্রিয়েশন : আজকাল অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদের কেন্দ্র খোলা হয়েছে, খুব ভালো কথা, অবশেষে সচেতন অনুবাদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সেদিকে নজর দিচ্ছেন সরকার এবং শিক্ষাবিদেরা। প্রায়ই সভাসমিতি সেমিনার হয়, সেসব জায়গায় ছাত্রদের মুখে 'ট্রান্স ক্রিয়েশন' বলে একটা শব্দ সর্বত্র শুনতে পাই। কিন্তু সেই পালিশ চকচকে গভীর ব্যঞ্জনাময় শব্দটির জনক যে প্রফেসর লাল, সেই কথাটি কি আজকের ছেলে-মেয়েরা জানে? শব্দটি চালু রয়েছে অর্ধ শতাব্দী ধরে। ভারতীয় শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ ইংরিজিতে পাওয়া যায় না, তার সবদিকের সম্ভাব্য ব্যঞ্জনা ধরতে গেলে একটা শব্দে কুলোয় না, তাই অন্যভাবে বলতে হয় অনেক সময়ে। 'ট্রানস্লেশন' শব্দে তাঁর তৃপ্তি নেই, তাই 'ট্রান্স ক্রিয়েশন'। সংস্কৃত মহাভারত ইংরিজিতে অনুবাদ করার মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন, সেই বিশাল কাজকে তিনি বললেন 'ট্রান্স ক্রিয়েশন'।

'ট্রানস্লেশন' করা সম্ভব নয়। আমার নিজেরও ব্যক্তিগতভাবে, অনুবাদ করার সময়ে 'ট্রান্স ক্রিয়েশন' শব্দটি বেশ মনের মতো লাগে। সম্ভবত পিতার সান্নিধ্যের অনুপ্রেরণায় তাঁর পুত্র অধ্যাপক আনন্দ লালও দক্ষ অনুবাদক। পরিবারের ঐতিহ্য মেনে কন্যা শ্রীমতী লাল হয়েছেন কবি ও শিল্পী।

প্রফেসর লাল সেন্ট জেভিয়ার্সের নক্ষত্র অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন তিনি আমাদের মাস্টারমশাই ফাদার আন্তোয়ানের সহকর্মী ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্সে। ফাদারের রামায়ণের ওপরে কাজটি (Rama and the Bards) তাঁর ওখান থেকেই প্রকাশিত। একদিন তারই কোনো এক প্রসঙ্গে প্রফেসর লালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সুবীর রায়চৌধুরী দেখে এসেছিলেন লাল তাঁর স্টাডিতে বসে কাজ করছেন, দু-দিকে টেবিলে দুটো বিশাল অভিধান খোলা। ব্যাসদেবের মহাভারত অনুবাদ করছেন ইংরিজিতে, তাঁর সেই মহান কর্মকাণ্ডের যোগ্য আবহাওয়া ঘরটিতে ভরে আছে। আজ সুবীর, ফাদার, লাল, তিনজনের কেউই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আছে প্রফেসর লালের সুগঠিত, সুললিত ইংরিজিতে 'ট্রান্সক্রিয়েটেড' মহাভারত। সপ্তদশটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। বাকি শুধু অনুশাসনপর্ব। অনেক বছরের ঐকান্তিক মনোনিয়োগের ফসল, অনেক প্রেমের, অনেক শ্রমের, অনেক সাধনার এই কাজ আশা করি আগামী দিনের সারা পৃথিবীর পাঠকের সহায় হবে। বিশ্বায়নের চাপে মূল থেকে বিচ্যুত, এই বিরাট বিশ্বে মায়ের ভাষা হারিয়ে ফেলা পরদেশি ভারতীয় মানুষগুলির মূল খোঁজার কাজে লাগবে।

প্রফেসর লালের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, আধুনিক ভারতবর্ষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ছড়ানো, জীবনে মননে জড়ানো মহাভারতের আজও অবধি জীবন্ত ঐতিহ্যটি ধরে রাখা। আধুনিক ভারতীয়

[illegible] মহাভারতের অনুপ্রেরণায় রচিত গদ্যপদ্য সংকলনের সময়ে তিনি এমন কথা বলেছিলেন।

[illegible] মানুষেরই সারাজীবনের স্বপ্ন সফল হয়। মহাভারত অনুবাদ ছিল তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন। অনেক বছরের ঐকান্তিক মনোনিয়োগের ফলে, গভীর প্রেমের, সুদীর্ঘ শ্রমের, একনিষ্ঠ [illegible] এই কাজ আশা করি সারা পৃথিবীর মহাকাব্য পাঠকের সহায় হবে। বিশেষ করে বিস্থাপনের চাপে মূল থেকে বিচ্যুত, ভাষা হারিয়ে ফেলা দেশি ও পরদেশি ভারতীয় মানুষগুলির [illegible] খোঁজার কাজে লাগবে। সতেরো পর্ব শেষ করে, অনুশাসন পর্ব কি তিনি শুরু করে রেখে [illegible]?

[illegible] জেনে কিশাদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলুম। শ্যামশ্রীর ডাকনাম কিশা, তিনি বিখ্যাত [illegible] মেয়ে, ড. কালিদাস নাগ শান্তা দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা। আমার বাবা মায়ের বন্ধু তাঁরা। [illegible] থেকে দেখেছি আমার মায়ের অতি স্নেহের মানুষ ছিলেন, ওঁরা তিন বোন, মঞ্জুদি, [illegible] পারুদি। আমিও তাঁদের কাছে অনেক স্নেহ পেয়েছি। তাঁদের রূপ, রুচি, গুণের পরম [illegible] ওবাড়িতে অনেক দিন যাইনি বলে বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না, আগে যেতুম রেল লাইন [illegible] সোজাসুজি। এখন ফ্লাইওভার হয়ে পথঘাট সব ওলটপালট, এসেছি সেই নাক ঘুরিয়ে। [illegible] রকম হয়ে গিয়েছে। ঠিকানা জানি না। আর কি খুঁজে পাই? লেক গার্ডেন্সের [illegible] অন্য চেহারা। পথে যত লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করি, প্রফেসর পি.লালের [illegible] প্রফেসর আনন্দ লালের কথা, কেউ বলতে পারে না। পথচারী, দোকানদার, [illegible] কেউ না। আশ্চর্য! এত বিখ্যাত মানুষটা! মাত্র তিনদিন আগে এই রাস্তায় একজন [illegible] মানুষ মারা গেছেন, কেউ চেনেন না কোন বাড়ি। এ কোন কলকাতা শহর?

[illegible] রাস্তায় সবাই ছোটে ছোটো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে গভীর আলোচনা করতে [illegible], কিন্তু রহস্যের সুরাহা হল না। হার মেনে ফিরে যাচ্ছি, আরেক দিন ঠিকানা জেনে [illegible] হঠাৎ এক সবজিওলা আমাকে ডেকে বললেন, 'দো চারদিন পহলে এক বহো-ৎ [illegible] বড়া রাইটার গুজর গয়া থা, উনকা ঘর তো নহি? সামনেওয়ালা গলিমে...'

[illegible] পুরুষোত্তম লালের ঠিক ঠিকানা মিলে গেল।

পুনশ্চ : এন.বিশ্বনাথন

[illegible] দেবার আগে একটু চা খাচ্ছি, সকালের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে দেখি, [illegible] এন.বিশ্বনাথন আর নেই। প্রফেসর লাল আর প্রফেসর বিশ্বনাথন দুজনেই ছিলেন সেন্ট [illegible] দুটি রত্ন, দুজন নক্ষত্র অধ্যাপক। দুজনেরই বয়স হয়েছিল ৮১। আর দুজনেই [illegible] নাগ আর শান্তা দেবীর, প্রকৃত অর্থে সভা-উজ্জ্বল দুই জামাই।

[illegible] এন.বিশ্বনাথন ছিলেন তাঁদের কনিষ্ঠা কন্যা, পারমিতার স্বামী। কিশাদির, পারুদির [illegible] রূপ বাদ দিলেও পারমিতা বিশ্বনাথনের নাম আমরা সবাই মনে রাখব কলকাতার [illegible] প্রাত্যহিক জীবনে এক অজানা রোমান্টিক আধুনিকতার স্পর্শ এনে দেবার জন্যে। [illegible] মেয়েদের কেশবিন্যাস ও কনে সাজানোর প্রথম পার্লার তৈরি করলেন পারুদি এবং [illegible] মধ্যে তিনিই প্রথম মেয়েদের ছাপা শাড়ির বুটিকও খুললেন, ওই 'কবরী'-তেই।

কলকাতার মেয়েদের জীবনে নানা দিক থেকেই ঘটনা দুটি আমি মনে করি খুব জরুরি। মেয়েদের নিজেদের সাজানোর দিকে খোলাখুলি নজর দেওয়া, ও নিজস্ব উপার্জনের দিকে মন দেওয়া। পারুদির কাজে তাঁর স্বামীর উৎসাহের অভাব দেখিনি। আমার ছাত্রকাল থেকেই দেখেছি প্রফেসর এন.বিশ্বনাথন ছিলেন কলকাতার ডাকসাইটে ডিবেটর, অক্সফোর্ডের উচ্চারণ, আর তীক্ষ্ণ শ্লেষ বিদ্রূপ দিয়ে তিনি ছিলেন তর্কচূড়ামণি, আমরা তাঁর ডিবেট শুনতে যেতুম। শুধু তর্কবাগীশ নন, তিনি ছিলেন সুদর্শন, স্মার্ট, স্টাইলিশ অভিনেতাও। ইংরিজি থিয়েটর থেকে বাংলা সিনেমা, সর্বত্র তাঁর সহজ বিচরণ, কি পুনশ্চ-তে, কি কাঞ্চনজঙ্ঘায়, আমাদের হার্টথ্রব। শেষবার সম্ভবত তাঁকে দেখলুম এই সেদিন 'গানের ওপারে' নামের একটি টেলি-সিরিয়ালের প্রোমো-তে। সেই অসাধারণ উচ্চারণ, সেই স্টাইলিশ ব্যক্তিত্ব, ওই কয়েক মুহূর্তেও ধরা পড়েছিল। কিন্তু মূল ছবিতে তাঁকে দেখা যায়নি। ততদিনে বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুত্র অশোক বিশ্বনাথনও জাতীয় স্তরের খ্যাতিমান ফিল্ম মেকার, অভিনেতা ও লেখক। পুত্রবধূ মধুমন্তীও নিজের বহুমুখী প্রতিভায় সকলের পরিচিত।

কার্তিকের শেষ হিমের ছোঁয়ায় এক সপ্তাহের মধ্যে চলে গেলেন কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবীর দুই গুণবান জামাই, এক বিশেষ যুগের স্মৃতির বিভা মেখে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা, অন্য এক সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ধারক হয়ে। দিশি ও বিদেশি দুই ভাবধারার অসামান্য মিলন ছিল এই দুটি মেধাবী মানুষের মধ্যে, যদিও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দুটি পুরুষ ছিলেন যেন দুই ধরনের মানুষ। একজন ধীর স্থির, চির প্রাজ্ঞ, আরেকজন প্রাণোচ্ছল, চিরতরুণ। কলকাতার সংস্কৃতির আকাশে দুটি উজ্জ্বল তারকার নিবে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই শহরে নির্বাপিত হল প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যকে জড়িয়ে, শান্তিনিকেতন আর সেন্ট জেভিয়ার্সকে জড়িয়ে গড়ে ওঠা এক আদর্শনির্ভর সম্ভ্রান্ত সময়, যার শিখা পুনরুদ্দীপিত হবার নয়।

দুজনের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় একটি মিল অতি বিলম্বে, এতক্ষণে আমার খেয়াল হল, কলকাতার সংস্কৃতি জগতের এই দুটি অহংকার কিন্তু বাঙালি ছিলেন না, এঁরা এই শহরের সর্বভারতীয়তার নিদর্শন। প্রফেসর পুরুষোত্তম লাল ছিলেন উত্তর ভারতের মানুষ, প্রফেসর এন.বিশ্বনাথন দক্ষিণের। তাঁরা দুজনেই ভালোবেসে কলকাতাকে আপন করে নিয়েছিলেন, আর কলকাতাও তাঁদের নিয়ে গর্বিত।

আমাদের মাসিমা

অনেক বন্ধু ছিল আমার ছেলেবেলায়, পাড়ায়, ইস্কুলে, তাদের মায়েরাও ছিলেন সবাই আমার মাসিমা। দুষ্টুমি করলে বকুনি দিতেন, লক্ষ্মীপুজোয় প্রসাদ দিতেন, কিন্তু রত্নার (যশোধরা সেনগুপ্ত, এখন বাগচী) মা ছিলেন একেবারে অন্যরকমের মাসিমা। তিনি হাসি ঠাট্টা করে গল্প বলে আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। অন্য মাসিমারা সিরিয়াস, স্নেহময়ী গুরুজন। অনেক দূরের। মেসোমশাই আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল, তাঁর গাড়ির ড্রাইভারেরই মাথায় ছিল শিখদের মতো, বিশাল রাজস্থানি পাগড়ি! মেসোমশাই-এর হাবভাবে দূরত্ব, কিন্তু মাসিমা ছিলেন কাছের মানুষ, হাস্যকৌতুকের অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার ছিল মাসিমার। অনেক সময়ে রসিকতার পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজনমতো সামান্য ক্যারিকেচার করেও দেখাতেন মাসিমা। ভালো অভিনয় প্রতিভা ছিল. শুনেছি অল্প বয়েসে রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয়ের সুযোগ এসেছিল তাঁর। মাসিমার হাস্যকৌতুকে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তুম আমরা, আমাদের কারুর মা এ-রকম ছিলেন না, এত সহজ, এত স্বচ্ছন্দ মাসিমার মতো এমন রসিক। আমার খুব প্রিয় ছিল, মাসিমার করে দেখানো একটি রঙ্গচিত্র। সেটা এখানে অনেকেরই পরিচিত। ধরুন, আপনি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছেন, বার দুয়েক হাত দেখিয়েছেন, বাস থামেনি। এবারে তিনবারের বারও বাস যখন থামল না, আপনার পতাকা উঁচোনোর মতো করে শূন্যে আন্দোলিত হাতকে অগ্রাহ্য করে শাঁ করে নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল, ততক্ষণে রাস্তায় আরও লোকজন এসে গিয়েছে। তখন আপনার ওই উত্তোলিত হস্তটিকে কীভাবে নীচে নামানো যাবে, যাতে মনে হয় আপনি মোটেই বাসের জন্য হাত তোলেননি? আছে, উপায় আছে। মাসিমাই দেখিয়ে দেন উপায় : মুখের ভাবখানি হতভম্বের মতো করলে কিন্তু চলবে না, স্মার্ট মুখে ব্যাপারটা সারতে হবে। প্রথমে উঁচানো হাতটা এই এমনি আস্তে করে শূন্য থেকে নামাতে হয়, নিজের মাথায় একটুক্ষণ আলতো করে বুলিয়ে নিতে হয়, তারপরে কানের পাশ দিয়ে স্মার্টলি নীচে নামিয়ে নিতে হয়, আপনি যেন চুল ঠিক করতেই হাত তুলেছিলেন। যতবার দেখাতেন, ততবারই হেসে গড়াতুম, আর অনুপ্রেরণা করে এটা বার বার দেখাতে বলতুম আমি মাসিমাকে। নিজের ভারী শরীরের ওজন নিয়েও রসিকতার অন্ত ছিল না মাসিমার। রত্নার কাছে শুনেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একবার রত্নার বাবা ড. যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত আর জ্যোতি বসুর ভগ্নীপতি ড. স্নেহময় দত্তের একটি মিটিং ছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। মাসিমা ঠিক করলেন ওই গাড়িতে তিনি, আর সুধামাসিমাও (মিসেস দত্ত) চৌরঙ্গিতে চলে গিয়ে ওপাড়ার দোকানে বাজারে উইন্ডোশপিং করবেন। সুধা মাসিমা বললেন, 'না না টম, আমাদের গিয়ে কাজ নেই, ওখানে গোরা সৈন্যেরা ঘোরে শুনেছি, অমরা একা একা ঘুরছি দেখলে যদি আমাদের তুলে নিয়ে যায়?' আমাদের মাসিমা উত্তরে তাঁর বন্ধুকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে? ওরা আমাকে ধরে বেঁধে গাড়িতে তুলতে তুলতে তুই তো পুলিশ ডেকে আনবি!'

প্রসঙ্গত মনে পড়ল আমার জীবনে এইরকমই প্রাণরসে উচ্ছলিত, কৌতুকে টইটুম্বুর, আরও একজন ফুল্লকুসুমিত স্পেশাল মাসিমা ছিলেন, আমার তিন বয়েসের তিন বন্ধুর মা, প্রতিভা বসু। যেমন স্নেহ ভরে চেপে ধরে আমার অযত্নে পিঠে লুটোপুটি এলো চুল টেনে তুলে বেঁধে দিতেন (মাসিমার নিজেরও খুব চুল ছিল), আদর করে হাতে তুলে খাওয়াতেন এটা ওটা, তেমনি কথায় কথায় ইয়ার্কি ঠাট্টা করে হাসাতেও পারতেন খুব। মোটা হাতখোঁপা জড়িয়ে নিয়ে ঢাকাই শাড়ি পরে আমাদের সঙ্গে তিনটের শোয়ে একটাকা চার আনার সিটে ছবিও দেখতে গিয়েছেন মাসিমা। তাঁর কাছেই প্রথম শুনেছিলুম ঢাকাই কুট্টিদের গল্প। দুই মাসিমাই পূর্ববঙ্গের মেয়ে। দুই মাসিমার আরও এক মিল, দুজনেরই গলায় ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত সপ্তসুর। কিন্তু কেন জানি না নিজের গানকে সেই প্রোফেশনাল গুরুত্ব তাঁরা দেননি, সেটা দিতেই পারতেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়িকা কুমারী রানু সোম কলকাতাতে এসে অনায়াসে বিশিষ্ট গদ্যলেখিকা শ্রীমতী প্রতিভা বসু হয়ে উঠলেন।

আর নীলিমা সেনগুপ্ত, রেনুকা দাশগুপ্তের বোনঝি, প্রতিমা দাশগুপ্তের দিদি, তিনি কমলা গার্লস স্কুলের সর্বজনপ্রিয় সংগীত শিক্ষিকা হয়েই খুশি রইলেন। নিজের হাতখরচটুকু উপার্জনেই তিনি তৃপ্ত, নামি হবার তাগিদ ছিল না তাঁর। নিজের পরিবারের জন্য একটি সুন্দর গোছানো সংসার রচনায় তাঁর মন বেশি, স্বামী-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে সর্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত থেকে, নিজের দিকে আলাদা করে আর তাকাননি। নিজের গানের রেকর্ড করানো, গানের জন্যে কিংবা অভিনয়ের জন্য মঞ্চে অবতরণ, এসব দিকে মাসিমা আর গেলেন না। অবিশ্যি রেণুকা, কিংবা প্রতিমা, এঁরাও কেউই নিজেদের গুণের যথার্থ সম্মান পেয়ে যাননি, বাণিজ্যিকভাবে তাঁদের নিজেদের অসামান্য সংগীত প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকশিত করবার সুযোগ তাঁরা কেউই গ্রহণ করেননি। এর ফলে আমরাই বঞ্চিত হয়েছি। মাসিমার বেলাতেও তাই বলব। তবু সান্ত্বনা একটাই, তিনি যে বছরের পরে বছর ধরে অগুনতি মেয়েকে গানে দীক্ষিত করেছেন, সেটা সমাজের একটা বিরাট প্রাপ্তি। গান ওঁদের রক্তে, সুর ওঁদের ধমনিতে বইছে, রত্নাও তার মাতৃকুলের অসামান্য সংগীত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু তা কাজে লাগায়নি, তার বহুমুখী মেধার একটি দিকেই সে সমস্তটা মনোযোগ দিয়ে ফেলেছিল। গানের দিকেও কিছুটা সময় ব্যয় করলে গানপ্রিয় মানুষদের খুব ভালো হত। ওদের পারিবারিক গায়কিতে একটি বিশেষ চলন, গানের কথাগুলির উচ্চারণে একটি অসামান্যতা আছে, যেটি অননুকরণীয়। মাসিমারও সেটি ছিল, আমাদের রত্নার মধ্যেও তা বিরাজমান। আমি তো মনে করি এখনও তার উচিত অন্য কাজে ছুটি নিয়ে গানে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। রত্নার মতো করে গান গাইতে কেবল একা রত্না-ই পারে।

মাসিমার কাছে রত্নার গানের প্রসঙ্গে একটি গল্প শুনেছিলুম, আপনাদেরও সেটা আগে বলেছি। গল্পটি গানের নয়, প্রাণের। রত্নার স্কুল ফাইনালের ফল ভালো হল যখন, মাসিমা মেসোমশাই বলেছিলেন, 'একটা গান কর, রত্না।' বাবা মাকে রত্না শুনিয়েছিল, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।' মেয়ের সম্পর্কে গল্পটি খুব গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন মাসিমা। এই সেদিন রত্নাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে বললে, 'কই, মনে নেই তো?'

আমার বিয়ের পরে মাসিমা মেসোমশাই আমার শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও আত্মীয় হয়েছিলেন, তাঁরা বরের যতিমামা আর টম মামিমা। রত্না বরের মামাতো বোন। মাসিমা আমার কিন্তু মাসিমাই রইলেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, মাসিমা ঘটকালি করতে ভালোবাসতেন, এতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন,

তাঁর এতে খুব সুনাম ছিল। আমার যাদবপুরের ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার তিনজন সম্ভাব্য পাত্র ও তিনজন সম্ভাব্য পাত্রীকে বাড়িতে ডেকেছিলেন চা খেতে। তাদের মধ্যে ছিলেন তিন বিলেত-ফেরত তরুণ অধ্যাপক, অরুণ দাশগুপ্ত, বরুণ দে আর অমর্ত্য সেন। মেয়েরা সবাই রত্নার ক্লাসমেট, সদ্য বি.এ. পাশ, প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। মাসিমার সেদিনের চায়ের আসরটা কিন্তু, হায়, ফলকরী হয়নি! প্রত্যেকেই অন্যান্য সঙ্গী পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। যা হোক, এর কয়েক বছর পরে আমাদের বিয়ে যখন স্থির হল, সেই সময়ে মাসিমা বলে রেখেছিলেন, আমাদের বাসরে এসে তাঁর প্রিয় একটি গান গাইবেন, গানটি কী তা আগে বলবেন না, কিন্তু আরও কোনো কোনো প্রিয়জনের বাসরে সেটি তিনি গেয়েছেন, তারা সুখে আছে। শুনে তো আমি ধন্য, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। কিন্তু বিয়ে শেষ হতে, নতুন বেয়াইবাড়ি থেকে হঠাৎ নির্দেশ জারি হল 'বাসর ঘর-টর কিন্তু আমাদের চলে না!' ফুল দিয়ে সাজানো বাসরঘরে ফরাশ পাতা, সুগন্ধী ঢালা হয়েছে, হারমোনিয়াম বাগিয়ে বোনেরা, বউদিরা, মামিমা, কাকিমারা রেডি, মাটিতে বসতে কষ্ট হয় বলে এক কোণে মোড়ার ওপরে বসেছিলেন মাসিমা। আমাদের বাসরঘরে আনন্দ উৎসব শুরু হল না, গানটি না গেয়েই উঠে গিয়েছিলেন মাসিমা। অনেক বয়েস অবধি মাসিমার কণ্ঠে সুর ছিল, কিন্তু সেই আশীর্বাদী সংগীত আর কোনোদিনই মাসিমার কাছে বসে শুনে আসা হয়নি।

বাসরের গানটি শোনা হয়নি বটে, কিন্তু বেশি জরুরি একটি কথা হয়েছিল আমার মাসিমার সঙ্গে বিয়ের অনেক বছর পরে।

বাচ্চাদের নিয়ে, চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে আসার পরে আমার সংসার চালাতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। আগে অনেক বেশি টাকাতে সংসার চালিয়েছি দিল্লিতে, এখানে এসে নিজের সামান্য বেতনে সংসার করা শুরু। প্রত্যেক মাসেই মায়ের কাছে ধার করি। যদিও বাড়িভাড়া নেই, নেশা ভাং নেই, লোকজনের বেতন, ফোন, ইলেকট্রিক, গ্যাস, ধোপা, রেশন, সবই মায়ের। তবে? তবু কেন? আরও যে আছে, ভেবে দেখুন, আরও অনে-ক আছে। রত্নার কাছে আমার অবস্থা শুনে মাসিমা ভুরু তুলে বললেন, 'উঁহু, এমন তো হতে পারে না? কোথাও গোলমাল করছিস। দাঁড়া, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে সময় করে কাগজ পেনসিল নিয়ে এসে আমার কাছে বোস, আমি তোকে বাজেট করে দেব, তুই যদি সত্যি সত্যি সেই মতে চলিস, দেখবি মাসের শেষে হাতে টাকা বেঁচে যাবে।'

মাসিমা হিসেব করে বিষয় ভাগ করে চার্টের মতন খোপ কেটে সাজিয়ে, নিজের হাতে লিখে, আমার জন্যে মাসিক খরচের বাজেট তৈরি করে দিয়েছিলেন, আমি সত্যি সেটি অনুযায়ী সংসার করতে শুরু করেছিলুম কলকাতাতে এসে, আমার নতুন একক সংসারে। এবং সেইমতো চলে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যও এসেছিল। সেই ফুলস্ক্যাপ কাগজে মাসিমার হাতের হিসেবের লেখাটি বহুদিন আমি বুকে করে রেখেছিলুম, তারপরে একদিন কোথায় গুঁজে গিয়েছে। অনেক পরে একদিন হয়তো বেরুবে, আমার মেয়েরা ভুরু কুঁচকে ভাবতে বসবে, এটা আবার কী? বাঃ, আমাদের মা এত হিসেবি ছিলেন? গ্রেট! কিন্তু, তথাপি এই দশা!

এখন আমরা নিজেরাই শুরু করে ফেলেছি সত্তরের দৌড়, আমাদের নজর ফিরেছে পিছনের দিকে। আমাদের মা মাসিদের জীবনযাপনও নিছক ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। সংসারে ও সংসারের বাইরে, নানা দায়িত্বে, বহু মানুষের সুখ দুঃখ জড়িয়ে সদাব্যস্ত, কর্মময় ছিল তাঁদের

দিনগুলো। পরকে আপন করার জাদু জানতেন মাসিমা, কালীদি তারই প্রধান সাক্ষী। মাসিমার যত্নে, সম্মানে, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে রত্নার কয়েক মাস বয়েস থেকে তার কন্যা তিস্তার কৈশোর অবধি কালীদি সারাটা কর্মজীবন মাসিমার পরিবারের একজন হয়ে সংসারের, বিশেষত রান্নাঘরের হাল শক্ত হাতে ধরে ছিলেন। আমরাও তাঁর আদর পেয়েছি। ঘরের গিন্নি বাইরে কাজ করতে বেরুলে ঘর সামলানোর জন্যে তো আর একজন ঘরের মানুষ চাই? আজকের ক্রমশ গুটিয়ে আসা পরিবারে আপনজন বাড়ানোর এই শিক্ষা আমাদের আধুনিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, মাসিমার কাছে এটা শিখেছি।

একটা কথা খুব মনে হয় আজকাল। আমাদের প্রজন্মের এই সাহসিকতা, অসুবিধের বসতবাড়ি ভেঙে ফেলে বেশি বয়েসে বসবাসের সুবিধেজনক ফ্ল্যাট বানানোর কথাটা। অনেক শখ করে অনেক ভালোবেসে মাসিমা মেসোমশাই তৈরি করেছিলেন তাঁদের যোধপুর পার্কের ইট রঙের বাড়িটি, তার ফুল ফলের গাছে ভরা বাগান, বাগানের লাগোয়া দক্ষিণের বারান্দা, কালীদির মনের মতো বড়োসড়ো খোলামেলা রান্নাঘর, রান্নাঘরের দেওয়াল ফুটো করে খাবার ঘরে খাদ্য পরিবেশনের অভিনব বিলায়েতি জানলা, দেড়তলার বড়ো বৈঠকখানা, খোলা ছাদে বাতাসে ফুলের গন্ধ।

কিন্তু তাঁদেরই সেই মনকেমন করা পি. ৪২৮ বাড়ির ঠিকানাতে আজ উঠেছে মস্ত এক তুলুনি-যন্তর বসানো বহুতল হর্ম্য। এমন আলো বাতাস খেলা করা, বড়ো বড়ো ঘরে ভরা, হাত-পা ছড়ানো আধুনিক ফ্ল্যাটগুলিতে মাসিমা, মেসোমশাই, কিংবা কালীদি, ওঁদের কারুরই বসবাস করা হল না। অবিশ্যি মাসিমা থাকলে এই বদল কি হতে দিতেন? (আরে, প্রথমটা তো আমারই মন কেমন করছিল! এখন যদিও মুগ্ধ।) ধরে নেওয়া যাক তাঁরা অন্তরীক্ষ থেকে খুশি হয়েই সব দেখছেন।

মাসিমা আমার মাসিমাই ছিলেন। বন্ধুর মা তো বটেই, আবার আমার মায়ের বন্ধুও হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে শেষ জীবনে। দুজনেরই একমাত্র সন্তান কন্যাটি দূরে থাকে, দুজনেই একা থাকেন তখন, ঘর খালি, বুক খালি। কিন্তু স্বীকার করবেন না। দুজনেরই 'সেন্টিমেন্টাল' শব্দটি অপছন্দের, দুজনেরই খুব বীর নারী কিনা। শুধু গোপনে পরস্পরের কাছে শৌর্য বীর্য বিসর্জন দিয়ে দূরবর্তিনী মেয়েদের নিয়ে খোলা মনে দুঃখু করতেন এই দুই এক সন্তানের মা। এসব আলোচনা হত দুপুর বেলায়, টেলিফোনে। মায়ের কাছে মাসিমা টম নন, নীলিমা।

কন্যাদের জন্যে উদ্‌বেগ, তাদের জন্যে স্নেহ, তাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা, তাদের অল্পবয়সজনিত চাপল্যের ফলে গুরুজনদের ইচ্ছেকে কিঞ্চিৎ অবহেলা (আমরা নিজেরা যদিও খুশি হয়ে মনে করি মা বাবার প্রতি প্রচণ্ড মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে), এইসব নিয়ে গভীর গোপন আদানপ্রদান চলত দুজনের মধ্যে। এসব কথা অনেক পরে আমি আর রত্না দুজনেই দুজনের মা, আর মাসিমা, উভয়ের মুখে গল্প শুনে জেনেছি। কিন্তু মাসিমা রত্নার সম্পর্কে একটা কথা বার বার বলতেন, যেটা শুনে আমার বেচারি মায়ের মনোবেদনা বৃদ্ধি পেত। উনি বলতেন, রত্না খুব সুবুদ্ধি, আবাল্যই খুব 'ট্যাক্টফুল,' এমনকী মাসিমা নিজেই কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লে মায়ের অভিভাবক হয়ে রত্না সেই টলোমলো পরিস্থিতি সামলে দিতে পারে। (আমার মা জননীর অবিশ্যি এহেন কন্যাসৌভাগ্য কোনোকালেই হয়নি, তার বরং বিপরীত অভিজ্ঞতা!) রত্না দেশে না থাকায়

শুধু সন্তানের অভাব নয়, সংসারে সেই খুদে অভিভাবকের অভাবটিও মাঝে মাঝেই মাসিমা অনুভব করতেন। কথাটা সত্যি, জীবনভোর রত্না আমাকেও প্রচুর ক্ষেত্রে আগলেছে, সামলেছে, এখনও সামলায়। আগে আমরা বন্ধু ছিলুম, এখন বোন হয়ে গিয়েছি।

আজ আমাদের প্রিয় মাসিমার এক-শো বছরের জন্মদিনে অনেক পুরোনো ছবি মনে আসছে।

বিপিন পাল রোডের বাড়িতে দুই বিনুনি ঝোলানো স্কুল ড্রেস পরা রত্না, কড়েয়া রোডের বাড়িতে শাড়ি পরা রত্না, যোধপুর পার্কের বাড়ি তৈরির সময়ে ওপাশের পুকুরের পাড়ে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে বসে আড্ডা আর রত্নার মুখে গান শোনা, থিয়েটার রোডে রত্নার বিশাল মামাবাড়ি, সুরেন ঠাকুর রোডে দিদিভাইয়ের বাড়ি, আমির আলি অ্যাভিনিউতে মাসিমণির বাড়ি— ওদিকে কাকা কাকিমাদের কথা, রবুকাকার মাংসরান্না, ছোটোবাবুকাকার ছবি তোলা— ফার্ন রোডে ওদের প্রথম সংসার, রত্না অমিয়র বিয়ের দিনে আমি ফ্লোর ক্রস করে বনে গিয়েছিলুম বরের বাড়ির লোক, প্রিয় বন্ধু অমিয়র দেশের পরিবারের উষ্ণ হৃদয় মফস্সলী মানুষগুলির সঙ্গে শহুরে অভিভাবক (লোকাল গার্জেন) হয়ে জুটে গিয়েছিলুম সেদিন। মাসিমা খুশি হয়েছিলেন তাতে। কত যে স্মৃতি। তিন বছর বয়েসে এক কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে দিদিমা হওয়া অবধি কম দিন হল আমি আর রত্না দুঃখে সুখে হাত ধরাধরি করে চলেছি? রত্নার মাসিমা, আমার মা রাধারানিও রত্নাকে পরম স্নেহ করতেন। কত অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, সেসব আর একদিনের জন্য তোলা থাক। আজ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০, আমাদের মাসিমার এক-শো বছরের জন্মদিন, তাঁকে আমাদের প্রণাম ও ভালোবাসা জানানোর দিন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১০

যাত্রী

সুনীল,

কোনো বিষয়ে লেখা যায়। কোনো বিষয়ে লেখা যায় না। আর কোনো বিষয়ে লিখতে বড়ো কষ্ট।

কেয়া বিষয়ে, আমার ধারণা ছিল, লেখা খুব সোজা, এত কিছুই বলবার আছে ওর সম্পর্কে। এত ছটফটে, ঝকঝকে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে, পরমাসুন্দরী মেয়ে কেয়া, পুরুষ-মেয়ে নির্বিশেষে এককথায় জয় করে নেয় সবাইকে। সর্বার্থসাধিকা শাশ্বত নায়িকা হয়েই যেন জন্মেছিল সে। যেমন রূপে, তেমনি গুণে, তার নায়িকাসুলভ চরিত্রটি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কেয়ার কথা, আমার বিশ্বাস, কেউ ফেলতে পারত না। হোক তা আবদার, হোক তা হুকুম। কেয়া এমন করে সেটা বলতে জানত যে না মেনে উপায় থাকত না মানুষের। কেয়ার ভালোবাসা, কেয়ার রাগ, কেয়ার অভিমান, মঞ্চে যেটুকু দেখা গেছে, সেও ছিল কেয়ার নিজের মতোই। কেয়া কেবল কেয়ারই মতো ছিল। আর কারুকে নকল করে কেয়া হয়নি সে। একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে, একটা নিজস্ব মানুষ হয়েই জন্মেছিল কেয়া। হয়তো এজন্যেই সে অত্যন্ত সহজে, বিনা চেষ্টায় সকলকেই তার নিজস্ব মানুষ করে নিতে পারত। আমি তার ঘনিষ্ঠ ছিলুম না, অথচ যতবারই কাছাকাছি হয়েছি কেয়া এমনভাবে কথা কয়েছে এমন হাসি হেসে জোর করে হাতে চায়ের কাপ গুঁজে দিয়েছে যেন সে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথি। যেন আমার ওপরে তার স্বাভাবিক দাবি আছে।

এই সহজ সহৃদয়তার গুণে সত্যিসত্যিই যে কখন তার দাবি জন্মে গিয়েছিল আমার ওপরে, সেটা টের পেলুম এই সেদিন। খবরের কাগজে হঠাৎ।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। নিশ্চয় অন্য কেউ। আবার পড়ি। না। এ কেয়াই। এ তো আমাদের কেয়া বলেই মনে হচ্ছে। কী সর্বনাশ। এ যে আমাদেরই কেয়া! হা ঈশ্বর!

কখন যেন কেয়া 'আমাদের কেয়া' হয়ে উঠেছিল। আমরাও তেমনি কেয়ার হয়ে গিয়েছি। কোন ফাঁকে কেয়া আমাদের অধিকার করে বসেছিল। কেয়ার মৃত্যুতে আমাদের বুকের মধ্যে স্বজন বিয়োগের সর্বনাশ বেজে উঠেছে।

কেয়া যখন ছিল, সুনীল, তখন যদি লিখতে বলত কেয়াকে নিয়ে অনেক কিছু লেখা যেত। কেয়া তেমন একজন মানুষ ছিল যাকে নিয়ে লেখা যায়। কিন্তু এখন কেয়া নেই। এখন কেয়া এমনই একজন মানুষ হয়ে গেছে যাকে নিয়ে লেখা বড়ো কষ্ট।

কেয়ার মধ্যে আমি সবসময়েই দেখতে পেতুম একটি কিশোরী কন্যাকে— সে সদ্য ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে, সদ্য ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, সদ্য বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে শিখেছে। সেই চিরকিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু ভয়ানকরকম ফাঁকা করে যায় বিশ্বভুবনটাকে।

এ নিয়ে লেখা যায় না।

কেয়া ছিল তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান, ভাই বোন নেই বলে তার দুঃখ ছিল। এখানে তার সঙ্গে আমার অন্তরের মিল। কেয়ার সঙ্গে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ছিল না, লৌকিকতার দায় ছিল না আমার। কিন্তু মনের মধ্যে আপনাআপনি কেয়া হয়ে গিয়েছিল খুব চেনা মানুষ, যার প্রতি আমার শেষ করণীয় কিছু আছে। যে কারণে সেদিন ক্লাস শেষ করেই যাদবপুর থেকে ছুটে গিয়েছিলুম নিমতলার ধারে— কেয়ার কাছে যেতে হবে, ভেতরে এমন একটা তাগিদে।

কিন্তু কেন যাওয়া? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই মনে হচ্ছিল।

এ কার কাছে এলুম? এ কীরকম অভ্যর্থনা করতে এসেছি, কেমন ধারা এই প্রত্যুদ্‌গমন? কাকে কী জানাবার জন্যে আমার এক ছুটে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা! আমি তো কেয়ার নিদ্রিত শরীর দেখতে চাই না। আমি চাই তার উজ্জ্বল, উচ্ছল, জাগ্রত মূর্তি, তার দুরন্ত আহ্লাদি চেহারা মনের মধ্যে পুষে রাখতে। বাঁচিয়ে রাখতে। এই গঙ্গা-ফেরত, মর্গ-ফেরত, মঞ্চ-ফেরত শান্তশিষ্ট ঘুমন্ত কেয়াকে আমি দেখতে চাই না। তবে কেন আসা? কীসের এই প্রতীক্ষা? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কার জন্যে পথের ধারে এই নিশ্চল দাঁড়ানো?

সময় ভেদে আমাদের কথাবার্তাও কেমন পালটে যায়। মৃত্যু ঘটে গেলে, অন্য এক আশ্চর্য অমানুষিক সাংকেতিক ভাষায় কথা হয়। নিমতলার কাছাকাছি সেই বিকেলে চেনা মানুষ আরও অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোড়ের মিষ্টির দোকানের সামনে ক্রমে একটা ছোটো ভিড় তৈরি হল। সেই ভিড় কেয়ার। সমবেত একক মানুষের প্রতীক্ষা তারই জন্যে। কিন্তু সেই মানুষরা কেমন ধারা কথা কয়? তারা তো বলছে না, 'হ্যাঁরে, কেয়া এত দেরি করছে কেন, পাঁচটায় বলেছিল এখন আটটা বেজে গেল যে!' তারা বলে, 'কী ব্যাপার! বডি এখনও এল না কেন কোথায় আটকে গেল! অমুক মোড়ে দেখলাম তো পাঁচটার সময় বডি যাচ্ছিল।' আমিও তাই বলছি। বলছি, আর আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। এখনই, কেয়া, এখনই তুমি আর কেয়া নেই। আর কেয়া নও। এই আমরা তো তোমাকে ভালোবাসি, তোমারই জন্যে তিন ঘণ্টা পথে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ আমাদের কাছেও তুমি এরই মধ্যে একটি বিভাষী শব্দ মাত্র। যার আভিধানিক মানে, দেহ। আমার মনে হল বৃথা দাঁড়িয়ে আছি। বডির জন্যে দাঁড়িয়ে কী হয়? বডিকে নমস্কার করে কী হবে? কেয়াকে নমস্কার করতে এসেছি। বলতে এসেছি কেয়া, তোমাকে ভালোবাসি।

সেটা বডিকে বলে কী হবে? একথাটা কেয়াকে ঘরে বসেও বলা যেত।

সময় হল। একটি মৌনমিছিল অন্ধকারে এমন সময়ে এগিয়ে এল। কেয়ার শবযাত্রা।

অজস্র ফুলে, অজস্র তারুণ্যে ছাওয়া অশ্রু মৌন, স্তব্ধ শোকযাত্রা।

কালো গাড়ি নিমতলার দিকে এগিয়ে গেল। চলমান জনস্রোতের মধ্যে একঝলক দেখতে পেলুম গাড়ির অনেকটা পিছনে, একটি রুক্ষ চুলের ঝাঁকড়া মাথা ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকেও বেশ একটু উঁচু, খুব আস্তে হাঁটছে। সেই ধীর পদক্ষেপে সমবেত সকল বন্ধুর নিঃশব্দ হাহাকার। সুনীল, তোমরা যে যাই বল, আমার কেয়াকে হিংসে করা শুরু হল সেই মুহূর্ত থেকে।

যেতে হলে এমনি যাওয়াই ভালো।

যখন অনেকখানি বাকি রেখে যাওয়া যায়। দেওয়ার দিকেও যেমন, বাকি পাওয়ার দিকেও তেমনি বাকি। স্বপ্নপূরণের স্বপ্নে বুক ভরে নিয়ে সে চলে গিয়েছে। অপূর্ণতার দুঃখ ছিটিয়ে রেখে গিয়েছে যারা রইল তাদের জন্যে। অসীম সম্ভাবনার কুশল সংবাদ কানে নিয়ে, ভালোবাসায় আর

সম্মানে বুক ভরে নিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে কেয়া চলে গিয়েছে, পরিপূর্ণ মূল্যে নিজের কাছে দামি হয়ে থেকে। তার দিক থেকে দেখলে, এই যাওয়া পূর্ণতার স্বাদ নিয়ে যাওয়া— যখন তার পূর্ণ যৌবন, পূর্ণ কর্মব্যস্ততা, পূর্ণ ভরসায়, পূর্ণ আনন্দে সে স্বপ্ন বুনছে। মৌনমিছিলের হাতে একটি বাণী ছিল— সাদায় নীলে আঁকা : 'কেয়াদি তুমি কাজ করতে করতে চলে গেলে, আমরা তোমাকে কাজ করতে করতে মনে রাখব।' সেই তো যাবার সময়। সব স্বপ্ন ফুরিয়ে না ফেলে, সব কর্ম হারিয়ে না কিছু পেয়ে, আর কিছু বাকি রেখে যেতে পারাই ভালো।

এখন দুঃখ যা, শোক যত, যন্ত্রণা যা কিছু সব রইল তাদের জন্যে জমা হয়ে, যারা জানত কেয়ার সাধ কী, কেয়ার স্বপ্ন কী, কী কী তাকে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হল না। সে-দুঃখের শেষ নেই।

আর দুঃখ আমাদের, যারা কেয়ার কাছে বুক ভরে কেবলই পেয়েছি। আমাদের আরও আরও পাবার কথা ছিল। আমাদের কেয়ার কাছে অনেক প্রাপ্তি বাকি ছিল, সারাজীবন অর্থাৎ আগামী ত্রিশ বছর ধরে।

আমরাই ঠকে গেলুম, কেয়াকে অসময়ে কেড়ে নিয়ে জীবন আমাদের ঠকিয়েছে।

আজ কেয়ার কথা ভাবতে গিয়ে সমবয়সি আরও একজনের কথা মনে পড়ছে, সুনীল— আরেকজনের জন্যেও মন কেমন করছে। তার সঙ্গেও আমার সামাজিক পরিচয় গভীর ছিল না, তবু তারও মৃত্যুতে আমি স্বজন বিয়োগ অনুভব করেছি। সেও বড়ো গুণী মেয়ে ছিল, বড়ো সুন্দরীও। সেও বড়ো অসময়ে পালিয়েছে। অন্তরে-বাহিরে ভারি মিষ্টি মেয়ে ছিল কাবেরী। কাবেরী বলতেই আগে আমার মনে পড়ত 'রাইকমল'-এর খালি গায়ে এলো-খোঁপায় আঁটসাঁট ঝলমলে মেয়েটাকে, আর 'শ্যামলীর' আশ্চর্য দুটো কথা-বলা চোখ। এখন তার আগে মনে আসে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র সেই ভয়ংকর অলংকৃতা যুবতীর হাসি-কান্নায় মেশা অলৌকিক রূপ। বুঝতে পারি, কাবেরীর কাছে আমাদের পাওয়া এখনও ফুরোতে অনেক বাকি ছিল। তবে তার যাওয়াটা আলাদা। যন্ত্রণায় ছিল সে, তার নিরাময় হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে কাবেরী। শান্তি পেয়েছে।

এক মাসের মধ্যে কাবেরী-কেয়া দুজনকে হারিয়ে বড্ড প্রতারিত বোধ করছি। বড্ড ঠকিয়েছে আমাদের এই জীবন-মৃত্যুর ধাঁধা।

কেয়া কিন্তু জিতেই গেছে। যদিও তুমি তা মানবে না সুনীল, যদিও তুমি রাগ করে বলেছ, সব মৃত্যুই মন্দ, সব মৃত্যুই খারাপ, মৃত্যু মানেই ক্ষতি, হানি, বিনাশ। মৃত্যু অশুভ। মৃত্যুর মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই, কেবল মস্ত ফাঁকি আছে। কেয়ার কত স্বপ্ন ছিল বাঁচবার, কেয়ার কত সাধ ছিল, যা পূর্ণ হল না। অকালে অসম্পূর্ণতায় এহেন যাওয়াতে জিত কোথায়? মৃত্যু মানেই মস্ত হেরে যাওয়া। কত কী পাওয়া তার বাকি থেকে গেল জীবনের কাছে।

কিন্তু আমি তো ওভাবে ভাবি না। পূর্ণতা-অপূর্ণতা, শখ-সাধ, স্বপ্ন, হার-জিত, লাভ-ক্ষতি, শুভ-অশুভ— এসব হিসেবই তো আমাদের দিকের হিসেব। বেঁচে-থাকা মানুষের হিসেব। এসব থেকে ছুটি পেয়ে যাওয়া মানুষের বেলায় তো এসব হিসেব আর খাটে না। কেয়া এখন ছুটি পাওয়া মানুষ। সে এখন হিসেবেনিকেশের বাইরে পালিয়েছে। তাকে এখন পায় কে?

ছোটো মুখ বড়ো দুঃখ নিয়ে বসে বসে পাওয়া-না-পাওয়ার অঙ্ক কষব আমরাই। আর তা

কেবল আমাদেরই জন্যে। সেই অঙ্কটা আমরা আর কোনোদিনই মেলাতে পারব না এই অসময়ে ইস্কুল-পালানো মেয়েটার বেলায়। অঙ্ক মিলবে না বলেই কেয়া এখন কিছুকাল থাকবে। এখনও কলকাতাকে অনেকদিন ধরে মাতোয়ারা রাখবে আধো ফোটা কেয়াফুলের বেনা গন্ধ।

কিন্তু তাতে কেয়ার কী এসে যায়? আমরা তাকে মনে রাখি কি না রাখি, তাতে ফুলের কী এল গেল?

কেয়া কখনো বুড়ো হবে না, কেয়া কখনো ব্যর্থ হবে না, কেয়া কোনোদিন একলা হয়ে যাবে না। কেয়া সম্রাজ্ঞীর মতো ফিরে গেছে। জীবনের কাছে শাহি সেলাম কুড়িয়ে।

কী বল, হিংসে করব না?

এপ্রিল ১৯৭৭

গজুদি

ছোটোবেলায় বাড়িতে গান শুনতেন আমার মা। গান গাইতেও পারতেন তিনি, যদিও লোকসমক্ষে কোনোদিন গাইতে শুনিনি। আমি মায়ের শোনা গানগুলোই প্রথমে শুনতে শুরু করেছিলুম। বাড়ির গানের রেকর্ডগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটা মস্ত বড়ো সাইজের রেকর্ড, তাতে লাল টুকটুকে লেবেল সাঁটা, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু অইখানে থাকো, মুকুর লইয়া নিজ মুখখানি দ্যাখো', সেটা ছিল এক মস্ত বড়ো গায়ক, কানাকেষ্টর গাওয়া গান। 'ওঁর নাম কানাকেষ্ট কেন, মা?' 'লোকে অমন বলে, তুমি যেন বোলো না। উনি যে চোখে দেখতে পান না, ওঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র দে।' তার পরে ভালো লাগত রেনুকা সেনগুপ্তর 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ', তার উলটোপিঠে 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো', কনক দাশের 'এ পথে আমি যে', তার পিঠোপিঠি 'সখি প্রতিদিন হায়', রাজেশ্বরী বাসুদেবের 'বাদলদিনের প্রথম কদমফুল,' তার উলটোপিঠে 'আজি তোমায় আবার চাই শোনাবারে' আর সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' একপিঠে, আর অন্যপিঠে 'আর রেখোনা আঁধারে আমায় দেখতে দাও'। বাড়িতে আরও একটা রেকর্ড ছিল তাঁর, মানে গজুদির, তার একটা পিঠে বাংলা, 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়'। আর একটা পিঠে, আমি তখন ভাবতুম বুঝি হিন্দি, 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' বাংলাটা আমার বেশি ভালো লাগত। গজুদি ছিলেন খুব সুন্দর দেখতে, ফর্সা আর রোগা, আর গম্ভীর মতন। কিন্তু হাসলে ঝলমল করে ওঠে ঘর। ভারি সুন্দর দেখায় তাঁকে। চোখে চশমা, ভিতরে উজ্জ্বল চোখ ঝক ঝক করছে, ঘাড়ের ওপরে বড়ো খোঁপা লুটিয়ে আছে। গজুদিদির দিদি টুকুদিদিও (সুপ্রিয়া) খুব সুন্দর, হাসিখুশি মুখ, আর অনেকখানি লম্বা। একজন ডাকসাইটে আইনজীবী ছিলেন তাঁর বর। বড়ো হয়ে ভালো করে চেনাশুনো হয়েছিল টুকুদিদিদের পরিবারের সঙ্গে। বড়দিদিকে (সুজাতা?) ঠিক মনে নেই। আমার অল্প বয়েসেই তিনি বিলেতে চলে গিয়েছিলেন সাহেব বিয়ে করে। গজুদিদির বাবা মা-ও খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। জেঠিমা সুবর্ণ, সোনার মতোই রং, ছোটোখাটো, দেবীপ্রতিমার মতো, কিংবা রানির মতো দেখতে। মায়ের কাছে শুনেছি তিনি খুব সুন্দর গান গাইতেন, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অনেক আদর পেলেও, জেঠিমার গলায় গান শুনিনি। জ্যাঠামশাই সৌরীন্দ্রমোহন দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণনাসা, স্নেহপ্রবণ, রাজামশাইদের যেমন হওয়ার কথা আর কি। গজুদিদির দাদাটিও ছিলেন অনেকটা জ্যাঠামশাইয়ের মতোই দেখতে, সুপুরুষ। পরের দিকে নাকতলায় তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। আমি জ্যাঠামশাইদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে যাইনি কখনো, যেখান থেকে বাবার সঙ্গে তাঁদের অল্প বয়েসের ভাবসাব। আমি তো অনেক দেরিতে এসেছি, তাই ভবানীপুরের বাড়িতে যেতুম মা বাবার সঙ্গে। ওঁরাও হিন্দুস্থান পার্কে আসতেন। আমার মনে পড়ে, সন্ধেবেলায় গজুদি আমাদের দোতলার বৈঠকখানার লাগোয়া উত্তরের বারান্দায় বসে গান গাইছেন। রেলিঙের জুঁই ফুলের লতায় প্রচুর

ফুল, সুগন্ধে বারান্দা ভরে আছে। আমাদের মা বাবারাও আছেন। আমি অনেকটাই ছোটো, তাই স্নেহ পেয়েছি অনেক। এক সময়ে বুকের ভেতরটাও অমনি খোলামেলা ছিল। আমাদের সেই বারান্দা আর খোলা আকাশের নীচে নেই, মাথায় ছাদ হয়ে, বড়ো জানলাওলা ঘর হয়ে গিয়েছে। সেই জুঁইফুলের লতাও নেই। বুকের ভেতরগুলোও এখন যেমন খড়খড়ি বসানো, বন্ধ। বাবা গজুদিকে একদিন কী যেন একটা গান গাইতে বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না কার গান, বোধ হয় অতুলপ্রসাদ, কিংবা রজনীকান্ত, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল, এই তো চয়েস। গজুদি বললেন, 'কাকাবাবু, কিছু মনে করবেন না, এখন আমি রবীন্দ্রসংগীত, আর আমার বাবার লেখা গান ছাড়া অন্যের গান গাই না।' আমি সেই প্রথম জানলুম যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় গান রচনা করেছিলেন। আমি পরেও অবিশ্যি তাঁর লেখা কোনো গান শুনেছি বলে স্মরণে নেই। যদিও জানি তিনি একাধিক নাটকের গান লিখেছেন, সুচিত্রাও তাঁর বাবার লেখা গান গেয়েছেন অন্ততপক্ষে দুটি। কিন্তু তারপরে অবিশ্যি তিনি অতুলপ্রসাদের গান এবং আই.পি.টি.এ.-র জন্যে লেখা বহু গান গেয়েছেন। সেইসময়েই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মূল্যবান যোগাযোগ। শান্তিনিকেতন থেকে সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতায় এলেন, তাঁর কথা ছিল এইচ.এম.ভি.-তে সৌরীন্দ্রমোহনের গানের রেকর্ডিং করার। কিন্তু তাঁর লেখক পিতা নিজেই মেয়েকে বলেছিলেন, বাবাকে দিয়ে নয়, প্রথম রেকর্ডিং শুরু হোক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে, তাঁর গান দিয়ে। তাই হয়েছিল। সেইগুলোই আমাদের বাড়িতে মায়ের গ্রামোফোনে আমার প্রথম শোনা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের গান, আমি যা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম বছরের পরে বছর। আস্তে আস্তে তাঁর গাওয়া একের পর এক রেকর্ড ঘরে জমা হয়ে চলেছে, কিন্তু ওইগুলোর প্রতি আমার সেই প্রথম প্রেম কেউ কমাতে পারেনি।

অনেক বড়ো একটা জীবন দেখেছেন সুচিত্রা মিত্র। স্বেচ্ছায় নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছিলেন, বাড়ির মত ছিল না। সে-চয়ন সার্থক হয়নি। জীবনে ধাক্কা খেয়েছেন, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। বরং আরও শক্তিমতী হয়ে নিজের জোরে মাথা তুলেছেন সমাজে। আত্মবিশ্বাসের তো অভাব হয়নি কোনোদিনই। কোনো অবস্থাতেই।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বাবার কল্যাণে রবীন্দ্রনাথসহ বাংলার তৎকালীন সাহিত্যসমাজ ও নাট্যসমাজের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল বাল্যকালেই। গানের জরুরি মানুষদেরও তিনি খুব কাছ থেকে চিনতেন। পঙ্কজ মল্লিক, শৈলজারঞ্জন, এঁদের কাছে শিক্ষা এবং স্নেহ তো পেয়েইছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনের প্রথম পরিচিত বান্ধবী এবং চিরদিনের বন্ধু। তাঁদের দুজনের গায়কি ছিল একেবারেই আলাদা আলাদা এবং নিজস্ব ঢং-এ পরস্পরের পরিপূরক। আমি যেটুকু বুঝি, সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে তাঁদের দুজনের ভক্তদল ছিল অভিন্ন, যদিও ছাত্রছাত্রীদল ছিল ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর। সত্যিতে তো গানের জগতে তাঁরা কেউ কারুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না? যদিও তাঁদের সম্পর্কে সেটাই ছিল চালু গল্প। আমি তো দেখেছি দুজনে ছিলেন দুই ধরনের কণ্ঠশিল্পী। একজনের নিবেদন মূলত হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করতে চায়, আরেকজনের আবেদন পৌঁছোতে যায় মেধার কাছেও। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠাঁই কোথায়? দুজনের একত্রে গান বহুবারই শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আবাল্য। শেষ যেবার দুজনকে একসঙ্গে উপবিষ্ট দেখেছিলুম, ঘর যেন চন্দনগন্ধে ভরে উঠেছিল। সেই আমি দুজনের গান এক মঞ্চে শেষবার শুনেছিলুম নন্দনে, মাঝারি মাপের একটি আসরে, মোহরদি

তখনই অসুস্থ। অনেকদিন পরে দুই চিরযৌবনা বান্ধবীর সেই একসঙ্গে গান গাইতে বসা। অসামান্য সেই অভিজ্ঞতা সেদিনকার শ্রোতাদের চোখে কানে ছুঁয়ে রয়েছে। কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল দুজনকে! আর কী প্রাণ ঢেলে গাইলেন! সেই সুর আমার শরীরে মনে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল অনেক দিন ধরে। অন্যান্য শ্রোতাদের অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই একইরকম ছিল। আমি জানি না তার পরে ওঁরা আর কোথাও একসঙ্গে গেয়েছেন কি না।

গণনাট্যসংঘের সদস্য হিসেবে জীবনে সুচিত্রা বহু তরুণ, বিপ্লবমনস্ক নাট্য এবং চিত্রশিল্পীদের সান্নিধ্যে এসেছেন। জীবনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ থাকলেও সুচিত্রা রাজনীতির ক্ষমতালোভের চক্রে জড়িয়ে ফেলেননি নিজেকে কোনোদিন। সবসময়েই মুক্ত, নির্লোভ শিল্পী জীবনযাপন করতে পেরেছেন। ভারত স্বাধীন হবার আগে পরে, কাছাকাছি কোনো একটা সময়ে তিনি কলকাতায় 'রবিতীর্থ' গানের ইস্কুল খুললেন। শুধু তো একাই গাননি, সেই ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব নতুন এক গায়কির রবীন্দ্রসংগীতকে সকলের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন, জনপ্রিয় করে তুলেছেন সুচিত্রা মিত্র। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের পথ চলারও সেই শুরু। তার প্রায় কুড়ি বছর পরে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে সুচিত্রা দেখলেন রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু সেখানে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার কোনো বিভাগ নেই। বছর দশেক সমানে চেষ্টার পরে তিনিই শুরু করলেন রবীন্দ্রভারতীতে রবীন্দ্রসংগীতের বিভাগ। কলকাতা শহরে অ্যাকাডেমিক প্রস্তুতির ও ডিগ্রির সম্মান দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী তৈরি করার এই উদ্যোগ সামান্য ছিল না। আমাদের মতো রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয় সাধারণ মানুষের চোখে এটি তাঁর খুব জরুরি একটি কাজ করে যাওয়া।

কিন্তু গান-জীবনের এসব জরুরি হিসেবের অনুপুঙ্খের কথা বলবার জন্যে আমার চেয়ে ঢের ভালো জানেন, এমন অনেক মানুষ আছেন। গানের মানুষ তো নই আমি। আমার কাছে সুচিত্রা মিত্র নামটি এক অলোকসামান্যা শিল্পীর নাম। একটি শক্তিমতী সুরধারার উৎসের নাম। প্রিয় দিদিরও নাম। যে দিদি ভালোবেসে, খুব যত্ন করে অমর্ত্যর সঙ্গে আমার বৈদিক বিবাহের সভায় সবগুলো গান একা গেয়েছিলেন। মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেওয়া রবীন্দ্রসংগীতগুলি সব, আর প্রারম্ভিক বেদগানও, যন্ত্র সঙ্গত বিনাই একলা গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। গানের বাছাইও তাঁর নিজস্ব ছিল না, গান বেছে দিয়েছিলেন অমর্ত্যর সদ্য তিরোহিত দাদামশাই, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, ওই বিবাহ পদ্ধতিটি যাঁর তৈরি। এখন ভাবলে বড়ো ধন্য মনে হয় নিজেকে। তখন আলাদা করে কিছুই ভাবিনি। বুঝিনি নিজের সৌভাগ্যের ওজনটা। টের পাইনি আমার জীবনটা কত বড়ো বড়ো মানুষদের স্নেহের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।

অনেক বছর পরে, বাবার মৃত্যুতে তাঁকে স্মরণসভায় গাইতে বলেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, 'আমি যাব, কিন্তু গান গাইব না রে। আমি শ্রাদ্ধে গান করি না।' কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা শ্রাদ্ধসভা ছিল না, ত্যাগরাজ হলের মঞ্চে স্মৃতিসভা হয়েছিল। অনুরোধটা সুচিত্রাদি বুঝতে পারেননি। তিনি সভায় এসেছিলেন, তাঁকে গান করতে বলা হয়নি। তিনিও নিজে থেকে এগিয়ে এসে গান শোনাতে চাননি। সেদিন আমার বন্ধু ঋতু (গুহ) এবং তাঁর বোন কৃষ্ণা গান গেয়েছিলেন। ঠিক প্রাসঙ্গিক না হলেও অপ্রাসঙ্গিকও নয়, এমনি একটা ঘটনা এখানে বলতে ইচ্ছে করছে, এমন আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে যায় জীবনে! এই সভার কয়েকদিন আগে, আমার বাবার চতুর্থী যখন চলছে ভালো-বাসা বাড়িতে, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের

পৌরোহিত্যে, হঠাৎ মোহরদি আর রুবিদি (বনানী ঘোষ) উপস্থিত হলেন। তাঁরা দুজনে সেই দুপুর বেলায় ফাঁকা ঘরে স্ব-উদ্যোগে অনেকগুলো গান গেয়ে গিয়েছিলেন, বিনা আমন্ত্রণে এসে। চতুর্থীতে আমাদের বাড়িতে কোনো নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল না। অথচ কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র, একজনকে ডেকেও পাইনি, আর একজনকে না ডাকতেই পেয়েছিলুম। তাঁরা সেদিন অন্য কোনো কাজে শান্তিনিকেতন থেকে এসে, শোকসন্তপ্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে পড়েছিলেন।

এলো খোঁপা ফেলে দিয়ে সুচিত্রাদি যখন চুল কেটে ফেললেন ছোটো করে, ফর্সা মুখে, তীক্ষ্ণ নাকে, তেজি দৃষ্টিতে আকারে প্রকারে তাঁকে অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর মতো দেখালেও, আমার মন খারাপ হয়েছিল। চুলে ফুল গোঁজবার জায়গা রইল না। মোহরদি কী সুন্দর চুলে ফুল গোঁজেন। আমার মনে হত রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ছোটোছাঁটের চুল মানায় না। আস্তে আস্তে চোখে সয়ে গেল। এখন তো দূরদর্শনে দেখি জিন্স টি শার্ট পরে বয়েজ কাট চুলের মেয়েরা নির্ভুল, শুদ্ধ উচ্চারণে অসাধারণ রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। দেখে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ যখন-তখন, যেখানে সেখানে, ভালোবাসার সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, ধ্বনিত হলেই তো ভালো! পোশাকের জেল্লা, চুলের দৈর্ঘ্য, কিংবা ওষ্ঠের প্রসাধনের সঙ্গে তার কোনো যোগই থাকার কথা নয়। এহ বাহ্য। আসলে, আমাদের একটু পুরোনো শান্তিনিকেতনি ঢং-এ রঞ্জিত চোখ তো? নতুন শান্তিনিকেতনের কিন্তু রূপ বদল হয়েছে। খোঁপায় ফুল না থাকতেই পারে, সে আলুথালু কেশে জিন্স কুর্তা পরে রবি-গান গাইছে। চোখ বুজে শুনলে টেরই পাবে না যে সমাহিত গাইয়ের পরনে শাড়ি নয়, বিদেশি পোশাক আছে! বাইরে থেকে দিন বদলেছে। ভিতর থেকে কতটা বদল হল টের পাওয়া যাবে একে একে।

জ্যাঠামশাই জেঠিমা—বাবা মা চলে যাবার পরে সুচিত্রাদির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আসা যাওয়া বিশেষ ছিল না। শেষ বাড়িটিতে যাচ্ছি যাব করে করে আমার কোনোদিন যাওয়াই হয়নি। কিন্তু সত্তরের দশকে কিংবা আশির, ঠিক মনে নেই, সুচিত্রাদির সুইনহো স্ট্রিটের দোতলার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে গিয়েছি। রবিবার দিন সকালে আনন্দবাজারের সম্পাদক, সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ, তাঁর গাড়ি নিয়ে এসে, সুনীল ও স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ কবি প্রতিমা (পরে মণীন্দ্র রায়ের স্ত্রী), তরুণ গল্পকার রাধানাথ মণ্ডল, এঁদের সঙ্গে আমাকেও জুটিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছেন সুচিত্রাদির বাড়িতে আড্ডা দিতে। তাঁদের মধ্যে সুন্দর একটি সহজ বন্ধুত্ব দেখেছি। মোহরদির সঙ্গেও সন্তোষবাবুর বন্ধুতা দেখেছি, হয়তো-বা আরও গভীর সেই বন্ধুত্ব, মান অভিমানে ভরা। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন সন্তোষবাবু। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রসংগীতের গায়িকাদের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা, তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র, এই দুজনের কাছেও তাঁদের মরজীবনের শেষ দিন অবধি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঈশ্বরোপম। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, সুচিত্রাদি, মোহরদি, সন্তোষবাবু, সুনীল, প্রতিমা, রাধানাথ,... এই তো সেদিনকার সেইসব এলোমেলো আড্ডার জরুরি মানুষগুলির মধ্যে অগুনতি জন আজ আমাদের মধ্যে নেই। স্মৃতিভারে অবনত আমরা রয়ে গিয়েছি। তবে আমাদের ঘিরে, আমাদের ছাড়িয়ে, জেগে রয়েছে, জেগে থাকবে অফুরন্ত প্রাণ নিয়ে তাঁদের গান। আর কিছু মুগ্ধবোধ মানুষের বুকের মধ্যে সুরের সুরধনী হয়ে বইতে থাকবে তাঁদের গান শোনার সেই জ্যোতির্ময় স্মৃতি।

২০ নভেম্বর ২০১২

মামণি রাইসম

অনেকদিন যাবৎ তিনি হাসপাতালে বন্দি ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর মুক্তি মিলে গিয়েছে। অত রূপ সচেতন, অত পরের দৃষ্টিতে নিজেকে কেমন দেখায়, তাই নিয়ে ভাবতে পারে বসে বসে। ইন্দিরা গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ অনেক বছরের। আস্তে আস্তে আমাদের বেশ বন্ধুতা হয়েছিল, কলকাতায় এলে তিনি আমাদের 'ভালো-বাসা' বাড়িতে আসতেন, নইলে তিনি যেখানে আছেন, সে কোনো গেস্টহাউসই হোক আর রামকৃষ্ণ মিশনেই হোক, আমি ঠিক গিয়ে ওঁর সঙ্গে আড্ডা মেরে আসতুম। আমি দিল্লিতে গেলে, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আমাদের সাক্ষাৎ হত। ইন্দিরার চমক লাগানো চেহারা সবার আগে মানুষের চোখ কাড়ত।

দীর্ঘ তনু, গৌরবর্ণ, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল, বড়ো বড়ো চোখে তীব্র চাহনি, হাসিমুখ, ইন্দিরা গোস্বামী/মামণি রায়সম। অসমিয়া লেখক, জার্নালিস্ট, ঔপন্যাসিক, রামায়ণের নাটকের গবেষণায় তাঁর পিএইচ.ডি. দিল্লি থেকে। আঠারো বছর বয়সে বিধবা ইন্দিরার পড়াশুনো, সাহিত্যচর্চা, সবই পরে। মা বাবার আহ্লাদি মেয়ে ছিলেন মামণি রাইসম, ধনী পরিবারে জন্ম। কিন্তু বৈধব্যের পরে বাবার ওপরে নির্ভর না করে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। নিঃসন্তান জীবনে অনেকে এসেছে গিয়েছে কিন্তু মূলত তিনি একাই থেকেছেন। দিল্লি তাঁকে স্বাধীনতা দেয়, আসাম স্নেহের নজরদারিতে বেঁধে রাখে। মামণি দিল্লিতেই অধ্যাপনা করেছেন।

আমাদের চেহারাতে যেমন অমিল, স্বভাবেও খুব একটা মিল ছিল না, বরং বলা চলে আমাদের বেজায় অমিল ছিল। ইন্দিরা মামণি রাইসম ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভালোবাসতেন চড়া রং, চড়া মেকআপ, চোখে দীর্ঘ টানের কাজল, কপোলে পদ্মফুলের রক্তিমাভা, ওষ্ঠে ঘন রঙের ওষ্ঠরঞ্জনী, কপালে সযত্নে আঁকা উজ্জ্বল তিলক, উঁচু স্বরের সাজসজ্জা সবটাই তাঁকে মানাত। তাঁর হাবভাবের সঙ্গে মানাত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকমের অলংকার পরতেন, শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে জুতো, ব্যাগ। লেখিকাদের মধ্যে যে মোটামুটি সহজ সাজের রীতি আছে এই পৃথিবীতেই, ইন্দিরা তা থেকে নিজেকে অনায়াসে পৃথক করে ফেলেছিলেন। কলকাতাতে রবীন্দ্রসদনের মাঠে সই-এর প্রথম 'সই-মেলা বই-মেলা' উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অমলাশংকর আর রাজ্যপাল শ্রীগোপাল গান্ধীর সঙ্গে মামণি এসেছিলেন অতিথি হয়ে। টকটকে লাল আসাম সিল্কের ওপরে মুগার সোনালি ফুলদার জমকালো মেখলাচাদরে, নববধূ, কিংবা মহারানির মতো সাজে মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর চোখ ধাঁধানো রূপ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন ততটাই, যতটা সচেতন ছিলেন নিজের সাহিত্যকর্ম এবং জনপ্রিয়তা বিষয়ে।

রূপও তো একদিক থেকে দেখলে, এক ধরনের আদিম ক্ষমতার উৎস?

ইন্দিরা যে অসমের মানুষদের হৃদয়ের কাছে কোন জায়গায় পৌঁছেছেন, সেটা আমাকে

শুনিয়েছিলেন ইন্দিরা নিজেই। একবার দিল্লিতে, সদ্য আসাম থেকে ফেরার পরে গল্প করতে করতে বলেছিলেন, দেশে থাকেন না বলে, দেশের লোক তাঁকে খুব কাছে চায়। তিনি নিজের ছোট শহরে গেলে মোটরের পথের মোড়ে মোড়ে তোরণ বাঁধা হয় তাঁকে সম্মান জানিয়ে অভ্যর্থনা করতে, মানুষ ছুটে আসেন তাঁকে একটুখানি স্পর্শ করতে। শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম। আমার সবটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। এমনও আবার হয়? জ্যান্ত লেখকের জন্যে এত শ্রদ্ধাভক্তি? এত সব কাণ্ডকারখানা? তায় তিনি একজন নারী?

হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলাতেও লেখকের সামাজিক মূল্য অনেকখানি, রাস্তা দিয়ে লেখক হেঁটে গেলে লোকেরা তাঁকে চিনে নেন, ভালোবাসায় ঘিরে ফেলেন, সই চান। বিদেশে যেটা নোবেল-পাওয়া লেখকের পক্ষেও সাধারণত অকল্পনীয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে লেখকদের নিয়ে বাংলার মতো এমন পাগলামি নেই। কিন্তু ইন্দিরার ব্যাপারটা একদম আলাদা। ওটা আসামের পাঠকের স্বভাবগুণ কিনা জানি না। তখনও তো এসব অরকুট আর ফেসবুকের ফ্যানক্লাবের পরস্পর পিঠ চুলকোনোর গোষ্ঠীগুলো জন্মায়নি এদেশে। ভক্তদের মধ্যে এমন উন্মাদনা শুধু ফিল্মের জন্যেই দেখি ছিল, আর কিছুটা সংগীতের বেলায়। কিন্তু গত বিশ পঁচিশ বছরে বাংলা ভাষায় আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখেছি, বইমেলার সময়ে বিশেষ করে, জনপ্রিয় লেখকের প্রতি পাঠকের এই নিবেদিত ভক্তি, এই আকুল শ্রদ্ধা। কিন্তু আমার তো মনে হয় অসমে ইন্দিরার ওই বিশেষ ধরনের জনপ্রিয়তা শুধু সাহিত্যকৃতির জন্যেই নয়, শুধু জ্ঞানপীঠের জন্যেই নয়, এটা তাঁর সামগ্রিক চারিত্রিক ক্যারিশমায় তৈরি হয়েছে। ওটি তাঁর নিজস্ব, ব্যক্তিগত অর্জন।

তবুও, তাঁর নিজের জায়গায় তাঁকে দেখা আর দিল্লিতে অনেকের মাঝখানে তাঁকে দেখা এক নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কলকাতায় দেখা আর দিল্লিতে দেখা যেমন এক নয়। ইন্দিরারও তাই হবে। এটা জানি, কোনো একবার অসমে ইন্দিরার সঙ্গে কয়েকদিন সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আমরা দুজনে কাজের জন্যে বন্দি ছিলুম গৌহাটিতেই, এদিকে সেদিকে, দূরে কোথাও নয়। তাই শহরতলিতে মামণি রাইসমের দাপট দেখার ভাগ্য হয়নি। কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাতেই টের পেয়েছি তিনি আমাকে নিজের বিষয়ে যা কিছু বলেছিলেন তা অভ্রান্ত। সারাদিন যেখানেই যাই তাঁর ভক্তদের সঙ্গে দেখা হয়। দিল্লিতে তিনি জরুরি অনেক জনের মধ্যে একজন। এখানে তিনি একক। এভাবে তাঁকে আগে দেখিনি।

তবুও একজন আছেন জনপ্রিয় অসমিয়া লেখিকা, আরও এক শ্রান্ত, ধীময়ী, রূপ লাবণ্যবতী দীপ্তি নই, যাঁকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্বভাবে আচরণে তিনি মামণির বিপরীত। কিন্তু তাঁর প্রতি সবার পাঠকের মধ্যে মুগ্ধতা প্রবল। তিনি নিরুপমা বরগোহাঁই। ঋজু চরিত্রপ্রভায় তাঁর নিরুপমাদি সর্বজন নমস্য এক মাথা উঁচু ব্যক্তিত্ব। ইন্দিরারও গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী তিনি। পাঠকদের বিনম্র শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন নিজের কাজের জন্য।

ইন্দিরা গোস্বামী সেদিন সকল ভারতের মানুষের চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন, যেদিন অসমে নিরন্তর অশান্তি, ভীতি আর নিরীহের রক্তপাত সহ্য করতে না পেরে, তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে উলফা বিপ্লবীদের কোনোরকম সমঝোতায় আসার জন্য পারস্পরিক আলোচনায় সহায়তা করতে নিজের থেকে ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। উলফার কর্তাব্যক্তিরাও তাঁকে বিশ্বাস করতে রাজি হয়ে ভারত সরকার। তিনি কোনো দলের নন, নির্দল, শান্তিবাদী, ভারতীয় নাগরিক

মাত্র। একটাই উদ্দেশ্য তাঁর : যদি এই অযথা রক্তপাত থামানো যায়, যদি নিষ্ঠুর প্রাণহানিগুলো রুখতে পারা যায়। তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, আলোচনা হয়েছিল, মিটমাট হয়নি। ইন্দিরা বেশ কয়েকবার স্বেচ্ছায় এই বিপজ্জনক দৌত্য করলেও, মাটি নরম হয়েছিল মাত্র, আসল কাজে সফল হননি। কিন্তু তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সাহসী আর দেশপ্রেমী বলে, দূর দূরান্তে।

ইন্দিরার অনেকগুলি লেখাই আত্মজীবনীমূলক, যত্ন করে পড়লে জানা যায় তাঁর সারা জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির নিশানা। কিছু বই অনুবাদ হয়েছে ইংরিজিতে কিন্তু বাংলায় খুবই অল্প। বাংলার মতো হরফগুলো দেখতে বটে কিন্তু অসমিয়া তো বাংলা নয়। ইন্দিরার লেখার সঙ্গে আমাদের বাংলায় তেমন পরিচয় নেই, 'উইয়ে খাওয়া হাওদা' ছাড়া। নানা সভা সমিতিতে দেখা হতে হতে আমাদের বেশ বন্ধুতা গড়ে উঠেছিল। তাঁর একাধিক বইয়ের উদ্‌বোধন করেছি, আলোচনা করেছি, রিভিউ লিখেছি। আমার কোনো বই তিনি পড়েছেন কি না তা অবিশ্যি জানি না। কিন্তু আমাকে যে তিনি পছন্দ করেন সেটা অনুভব করেছি। তাঁর শাড়ির প্রশংসা করায়, একবার আমাকে অতি সুন্দর একটি কারুকার্য করা অসমিয়া সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন জ্ঞানপীঠের কমিটিতে এবং তাঁর নাম মাঝে মাঝেই আসছে, তাই শাড়িটি নিতে পারিনি। ফেরত পাঠিয়েছিলুম। এতে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। (আমিও! অফার আর রিনিউড হয়নি!)

একবার আসামে, এক দীর্ঘ সাহিত্যসভার অন্তে, মামণি আর আমি এক গাড়িতে ফিরছি সন্ধ্যাবেলায়। খুব ক্লান্ত দুজনেই। আমি ফিরব গেস্টহাউসে, মামণি ফিরবেন তাঁর বাড়িতে। ড্রাইভার পথে এক দোকানে গাড়ি থামাল।

'আবার কী?'

'দরকারি জিনিস।'

অন্ধকার নেমেছে। ড্রাইভার ছুটে নেমে কী যেন কিনে দৌড়ে ফিরল। মামণি বাড়িতে নেমে যাবার সময়ে একটি লম্বা প্যাকেট সবিনয়ে তুলে দিল মামণির হাতে। ধন্যবাদ দিয়ে সেটি গ্রহণ করে, শুভরাত্রি জানালেন মামণি। আমার নামার সময়েও ড্রাইভার ঠিক ওইরকম আরেকটি প্যাকেট সসম্ভ্রমে তুলে দিল আমার হাতে।

'এতে কী আছে?'

'হুইস্কি আছে। সন্ধেবেলায় তো লাগবে ম্যাডামের?'

এই ম্যাডাম হুইস্কিপায়ী প্রাণী নন। কিন্তু সেকথা ওকে বলি না। সম্ভ্রম কমে যাক আর কী? ধন্যবাদ দিয়ে হাতে তুলে নিই। থাকুক, কলকাতায় অনেক আছে এর মূল্য বোঝার লোক। শুনলুম, এটা ওখানে ইন্দিরার দস্তুর। ইন্দিরাকে সভায় আহ্বান করলে, তাকে এটা দিতে হয়। বাঃ ভালো তো? আমি তো এক ফ্লাস্ক চা-ও দাবি করিনি কোনোদিন।

অনেকগুলো মাস হাসপাতালে শুয়েছিলেন ইন্দিরা মামণি রায়সম গোস্বামী, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে কোমায় বিবশ হয়ে, সম্প্রতি চলে গেলেন। আজকে কলকাতার অসম ভবনে তাঁর জন্য স্মরণসভা হচ্ছে, আমার যাবার কথা ছিল। পদস্খলনে পা চলছে না, যেতে পারিনি। ইন্দিরা খুব বিশেষ একজন শিল্পী। কর্মঠ, সাহসী, বুদ্ধিমতী, হৃদয়বতী আর একাকী। তাকে যে চিনেছে, সে কোনোদিন ভুলবে না। আমার শ্রদ্ধা জানাতে যাবার ইচ্ছে ছিল, সম্ভব হল না বলে মন খারাপ লাগছে।

১৭ ডিসেম্বর ২০১১

চিনি-তর্পণের বন্ধু

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে!— সুনীলের সঙ্গে পরিচয় কবিতায়। সশরীরে আলাপ কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে। যাদবপুরে এম.এ. পড়তে ঢুকেছি, আঠারো উনিশ বছর বয়স, দীপক মজুমদার আর প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দুই কবি বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলুম প্রথম দিন কফি হাউসে। আমি স্বভাবচঞ্চল, টেবিলে চৌকো চৌকো চিনির কিউব দেখে খুব খুশি হয়ে দুই হাতে মুঠো ভরতি করে চিনিগুলো ধরেছি, এমন সময়ে দুটি ছেলে এসে আমাদের টেবিলে বসল। দীপক আলাপ করিয়ে দিল, সুনীল, শক্তি। তখন আলাপ করলে নমস্কার করার চল ছিল। হাত তো বোঝাই চিনিতে। আমার হাতের চিনিগুলো সামনে বসা সুনীলের অঞ্জলিতে অর্পণ করে, হাত ফাঁকা করে নিয়ে তাদের নমস্কার করলুম। এদিকে সুনীলের দুই হাত তখন চিনিতে ভরতি, সে বেচারি কেমন করে প্রতি-নমস্কার করবে? যথাস্থানে চিনি প্রত্যর্পণ করে আমাদের আলাপসালাপ হল!

সুনীল আর আমাদের কাছে ফিরে আসবেন না, আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, ফোন করলে উল্টো দিকে তাঁর গলার স্বর শুনতে পাব না, এ কঠোর সত্য সহজে সহ্য হবার নয়। একটি মেয়ে আমায় লিখেছে, 'আমি প্রেম করতে শিখেছি সুনীলের কাছে, যদিও কোনোদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তাঁর কবিতাই আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।' আর এক তরুণ কবি মর্মাহত হয়ে ফোনে বললেন, 'আমরা প্রেম করতুম সুনীলের কবিতার লাইন তুলে দিয়ে দিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলত এভাবেই, সুনীলের মাধ্যমে সব কথাই বলেছি।'

ঠিক আমাদের অল্প বয়সে আমরা যা করেছি রবীন্দ্রনাথের লাইন নিয়ে।

শুধু কি ছোটোরাই? কেন, আমরা নই? সমসাময়িক হলেই-বা? আমরা পদে পদে শঙ্খ, সুনীল, শক্তির আশ্রয় নিই না? এবং এখন তো জয়েরও।

ভালো কবিরা আমাদের মনের কথাগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো করে বলতে পারেন, যেমন বলে গিয়েছেন সুনীল। সুনীল যে কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন আমাদের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকায়, তা কি তিনি পুরোপুরি জেনে যেতে পেরেছেন?

সুনীলের সঙ্গে আলাপের আগে তাঁর সম্পর্কে মোটেই ভালো ধারণা ছিল না আমাদের মতো গুড গার্লদের। ছেলেটা ভালো কবি হলে কী হবে, দারুণ মাতাল, মাতাল মানেই অসচ্চরিত্র! পঞ্চাশের কবিদের সঙ্গে আলাপ হবার পরে দেখা গেল, হ্যাঁ সুরাপানে মত্ততা ঘটে বটে এবং সেটা ভালো নয়, কিন্তু মাতাল মানেই অসচ্চরিত্র নয়। সত্তরের গোড়ার দিক। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলা বসত ময়দানে। আমি আমার বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে মেলায় গিয়েছি, সঙ্গে কলেজ-জীবনের বন্ধু, ঘাটের কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়। কৃত্তিবাসের তাঁবুতে পৌঁছে দেখি কবিতা পড়া-টড়া শেষ, দোকানের পিছনের পর্দার ওপারে পানসভা বসেছে। শক্তিকে মাটি থেকে তোলা যাচ্ছে না।

শরৎবাবু সেখানে নেই। সুনীল আছেন। কিন্তু পায়ের ভিতরে পা। আমরা তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেষ্টা করি। সে যত্রতত্র মাটির ওপর বসে পড়ছে। আমার হঠাৎ কী মনে হল, আমার এক মেয়েকে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম, 'এই ভিড়ের মধ্যে দুজনকে নিয়ে চলতে পারছি না, তুমি ওকে নিয়ে চল তো একটু গেটের দিকে।' শুনে সুনীল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটার আঙুল ধরে মিষ্টি করে বলল, 'চলো ভাই, আমরা দুজনে বাড়ি যাই', বলে দিব্যি টলে টলে হেঁটে হেঁটে গেটের দিকে চলল। এক সময়ে ভিড়ের মধ্যে ওদের আর দেখা গেল না। যত খুঁজে পাই না, তত বিজু আমাকে বকে। 'কে মাতাল? তুই না সুনীল? মাতালের কাছে কেউ বাচ্চা তুলে দেয় এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে? কী হবে এখন?'

আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছি। গেটে পৌঁছে দেখি অতিকায় এক বেলুন হাতে আমার এক কুচি কন্যা, আর হাস্যবদন সুনীল দণ্ডায়মান। মেয়ে বলল, 'মা, এই দেখ সুনীলমামা দিয়েছেন, আমার হাতে মনুমেন্ট!' বিজয়ার কাছে আমার দারুণ মুখরক্ষা হয়েছিল সেদিন। মেলার মধ্যে কেমন যেন মনে হয়েছিল বিশ্বাস করে জরুরি কোনো দায়িত্ব অর্পণ করলে, মাতাল হোক আর যা-ই হোক, সুনীল পালন করবেই। জোর করে ঠিক করে নেবে নিজেকে। নিয়েছিলও। আমরা ফিরলাম মহানন্দে। আমি চালক, আমার পাশে সুনীল গলা ছেড়ে গান গাইছেন, পিছনে বিজু গাইছে, জানালায় পতাকার মতো উড়ছে মনুমেন্ট।

আমার লিখতে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে, সুনীলকে 'সে' লিখব না 'তিনি' লিখব? প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রসঙ্গে 'সে' লিখলে রূঢ় শোনায়, আর বন্ধু সুনীলের প্রসঙ্গে 'তিনি' লিখলে বড্ড দূরের শোনায়। বন্ধু সুনীল তো আমার শ্রদ্ধেয় কবিও বটেন? বাংলা কবিতার যৌবনে তিনিই স্পর্ধা এনে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে এত উন্মুক্তভাবে অথচ এত মোহিনী রূপে ব্যবহার করে গিয়েছেন। অনেক শত্রু বানিয়েছেন তিনি, বাগ্‌দেবীর প্রতি তাঁর কৈশোরের কাম নিয়ে একটা গল্প বলে। কিন্তু বাংলা ভাষার সঙ্গে তো তাঁর তেমনই কামনা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন, শব্দ, অক্ষর, তার কমা, ড্যাশ, রেফ ও র-এর ফুটকি সমেত ছুটে গিয়েছে— গুণিনের বাণের মতো ছুটে গিয়েছে, ভবিষ্যতের কবিদের দিকে! তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন কী অনায়াসে, কবিতার ভাষার সম্মানের হানি না ঘটিয়েই লিখতে পারা যায় 'যোনির ভিতর জিভ'-এর প্রসঙ্গও, যখন তা 'লবণাক্ত স্বাদ ছাড়া কিছুই আনে না!' শিল্পের মান বজায় রেখে ভাষা ব্যবহারে দুঃসাহস দেখানো সহজ নয়, খুব সূক্ষ্ম এক লক্ষ্মণরেখা আছে শ্লীল ও অশ্লীলের মাঝখানে। সেটি পেরিয়ে গেলেই শিল্পের বেড়া পেরিয়ে যেতে হয়। হাংরি জেনারেশনের কবিতায় অনেক সময়ে এই রেখাটি ঠিক থাকেনি। অনেক শিখেছে পরের প্রজন্ম সুনীলের কবিতার কাছে। পরবর্তী কবিদের বেশির ভাগই লেখার ব্যাপারে সেভাবে শক্তির নয়, যেভাবে সুনীলের শিষ্য। ভাষার ব্যবহারে সুনীল অনেক স্বচ্ছ, সহজ, তাঁর মতো করে নিজের কথা লিখতে পারা যায়। এই কারণেই হয়তো সুনীলের অনুগামীর সংখ্যা অগুনতি।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, শুধু সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র শাখায় নয়, গ্রন্থের সংখ্যাতেও সুনীলের সঙ্গে আর কারো লেখার কোনো হিসেব হয় না। সুনীল কবি হিসেবে আমার কাছে খুব জরুরি, তার পরে তাঁর গদ্য এসেছে। কবিতার ক্ষেত্রে আমি যদি একটাও কবিতা লিখতে পারি যা দিয়ে মানুষের আমার কথা মনে পড়বে, আর গদ্যের ক্ষেত্রে এক জীবনে আমি যদি একটা ক্লাসিক গ্রন্থ

রচনা করতে পারি তাহলেই আমি আমার জীবন ধন্য বলে মনে করব। সুনীল অনন্ত অবিস্মরণীয় কবিতা, আর অন্তত দুটি অনন্যসাধারণ ধ্রুপদি উপন্যাস লিখেছেন, 'প্রথম আলো' আর 'সেই সময়'। আর সেই সাতাশ বছরের ছেলেটা, যার পায়ের তলায় সরষে, সেই নীললোহিতকেই কি ভুলতে পারবে বাঙালি পড়ুয়া?

আমার প্রথম উপন্যাসের বায়না এল শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে, ১৯৭৬-এ। সুনীলের উপন্যাস বেরিয়ে গিয়েছে দশ বছর আগে। আমি খসড়া লিখেছি, আর ভাবছি শুরুটা করি কেমন করে? শেষে সুনীলকে জিজ্ঞেস করি কী করব। সুনীল বলল, 'শুরু করবে কোনো অ্যাকশনের মাঝখানে। যথা, "সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে আসছিল রুমনি।" বা কোনো ডায়ালগ দিয়ে।' কোনটা করেছিলুম এখন মনে পড়ছে না, তবে সুনীলের উপদেশ বেদবাক্যের মতো মনে হয়েছিল।

সুনীল আর আমি জীবনের অনেক মূল্যবান মুহূর্ত একসঙ্গে কাটিয়েছি। অনেকবার দেশে-বিদেশে একত্রে কবিতা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। নিউ ইয়র্কে একদিন মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ, আর একদিন সেন্ট্রাল পার্কের ব্যান্ডস্ট্যান্ডে কবিতাপাঠ ছিল। সুনীলের বন্ধু বিট কবি অ্যালেন গিনসবার্গ 'ভারত উৎসব'-এর কবিতাপাঠ উদ্‌বোধন করেছিলেন, ছোট্ট হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে নিজের কবিতা শুনিয়ে। ভারতের অনেকগুলি অঞ্চল থেকে কবিরা গিয়েছিলেন। প্রতিদিন ডিনারে আমাদের সকলকে মার্কিন কবিরাই কেউ-না-কেউ খাওয়াতেন। কিন্তু আমরা ভারতীয় দল থেকে, সরকারি খরচ হলেও, কেন জানি না প্রাণে ধরে তাঁদের খাওয়াতুম না। শেষ দিন সুনীল আর লজ্জা সইতে না পেরে নিজের খরচে তাঁদের সবাইকে পানভোজনে আপ্যায়িত করলেন, ভারতবর্ষের হয়ে। আমার খুব গর্ব হল। সুনীলের তো অন্যদের চেয়ে অর্থ বেশি ছিল না, মনটা ধনী ছিল।

একবার ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে বসে প্রতীক্ষা করছি কলকাতার প্লেনের জন্য। হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটি উপবিষ্ট মানুষের মাথা দেখে মনে হল, সুনীল না? অমনি দৌড়ে গিয়ে 'সুনীল' বলে চেঁচাতেই দেখি, ঠিক!! সুনীল চীন থেকে আর আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরছিলুম। মাঝরাস্তায় পৌঁছে বসে আছি কলকাতার প্লেন ধরতে। সেইখানেই আমাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল এক বাঙালি ডাক্তারের। তিনি সান্টা লুসিয়াতে থাকেন, মহোৎসাহে নেমন্তন্ন করলেন আমাদের দুজনকেই সেই ছোট্ট সুন্দর দ্বীপে বেড়াতে যেতে। যাওয়া হয়নি। সেবারে দুই বন্ধু দুই জায়গা থেকে রওনা হয়ে, একসঙ্গে কলকাতায় ফিরেছিলুম। দমদমে স্বাতী তো আমাকে দেখে অবাক!

যাত্রা ফুরোয়নি। আবার কোনো সুন্দর ছোট্ট দ্বীপে দেখা হয়ে যাবে আমাদের। দুজনে দু-জায়গা থেকে রওনা হয়ে এক স্টেশনেই নামব।

২৬ অক্টোবর ২০১২

শুধু সুনীলের জন্যে

'আবোল তাবোল বকছো তুমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সবাই যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যাঁর কবিতা সবার ঠোঁটে ঠোঁটে
প্রতি বছর জন্মদিনে যার নামে হয় কয়েক ঘণ্টা বেতারে গান বাজনা—'

সুনীলও চলে গেল। আর ভালো লাগে না। রাত্তিরে বসে বসে ভাবছিলুম কী লিখি। কী আর লেখার আছে? সুনীল কি একা? সেখানে সুনীলকে স্বাগত জানাতে তৈরি আছে তার অনেক বন্ধু। আমাদের মাঝখান থেকে একে একে কতজনকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। বড়ো হব না হব না জপ করলেই তো হল না? বন্ধুরা হুট হুট করে যখন-তখন জীবনের মতো স্বর্গে চলে যাবে, শত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও ফিরবে না, আর তোমরা বুঝি টলটলে কচি থাকবে, হাসিখুশি, খোকা-খুকু হয়ে? না। সেটি হওয়ার নয়। তোমাদের ওই অল্পবয়সের হিরেমানিকের সিন্দুকটার খবরদারি করত যে ছেলেটা (নাকি যে লোকটা?), সে আর খবরদারি করছে না। কোমরে বাঁশিটি গুঁজে নিয়ে সে তার দূরের ঘরে ফিরে গিয়েছে। এখন তোমাদের যৌবন আগলে রাখার কেউ নেই। এবারে বাতাসে ভেসে ভেসে ফুলের গন্ধের মতো হারিয়ে যাবে তোমাদের বুকের মাঝখানে পুষে রাখা, ধরে বেঁধে আটকে রাখা, নীল সবুজ অল্প বয়েস।

এবারে যমের দক্ষিণ দোর আগলে রইল না কেউ।

খিল খুলে গেল, এবারে তোদের বুড়ো হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না রে!

এসো দিকিনি, তোমরা যারা ছিলে, বোসো আমার সামনে। দেখি একখানা লিস্টি করা যাক। আমি, এই নবনীতা আমি তো সবাইকেই চিনতুম না, আমি যাদের চিনতুম তোমাদের মধ্যে, তাদের কথা ভাবি। সোজাসুজি তালিকা বানাই, নেই বন্ধুদের। কেউ বেশি, কেউ কম। সবার সঙ্গে হয়তো সমান ভাব ছিল না আমার। কিন্তু আগে হোক পরে হোক, অল্প বিস্তর হোক, তোমাদের চিনেছি, তোমাদের জেগে-ওঠা দেখেছি। তোমাদের অনেকগুলো মুখের জন্যেই মন কেমন করে এইরকম আধো আলোছায়ার মুহূর্তে।

চোখ বুজে হারিয়ে ফেলা মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করি। কে কে ছিলে, কে কে নেই। শক্তি, সুনীল, শংকর, বিমল, কবিতাদি, পূর্ণেন্দু, দীপক, তারাপদ, সমরেন্দ্র, বিনয়, প্রণবেন্দু, ভাস্কর, শ্যামল, সন্দীপন— তোমাদের হাসিমুখ মনে পড়ে। কম কোথায়, লিস্টে এসে গেল পনেরোজন মানুষ, পনেরোজন সৃষ্টিশীল, প্রাণচঞ্চল মানুষ, তোমাদের যৌবনের আমি সাক্ষী। আমি হয়তো তোমাদের এক পাত্রের সঙ্গী হইনি কোনোদিনও, কিন্তু তাই বলে কি তোমাদের ফুটে উঠতে দেখিনি? তোমাদের মধ্যরাত্রের আড্ডায় থাকিনি, তা তো নয়?

কোথায় শুরু করি? আরও কিছু না-থাকা মানুষের গল্প করি। বড়োরাও তো ছিলেন আড্ডায়। মাঝে মাঝে সন্তোষ কুমার ঘোষ আমাদের নিয়ে যেতেন, রবিবারে সকালে স্বাতী, সুনীল সমেত

সুচিত্রা মিত্রের সুইনহো স্ট্রিটের দোতলার ফ্ল্যাটে আড্ডা বসত। কখনো তাঁর গাড়িতে আমরা চলে গিয়েছি কোলাঘাটের ভাতের হোটেলে নদীর সদ্য ধরা টাটকা মাছ ভাজা দিয়ে ডাল ভাত খেতে। একা সন্তোষবাবু নন, সমরেশ বসু, সাগরময় ঘোষ সমেত শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিলুম, গাড়িতে সাগরময়ের ভরাট গলায় 'নেই কেন সেই পাখি নেই কেন', আমার কানে বাজে। ওদের আড্ডায় আমি যেতুম ব্যাগের মধ্যে থামস-আপের শিশি নিয়ে। আমার জন্যে কেউ কিছু পানীয় রাখত না, তুমি খাওনা সে তোমারি দোষ! সেসব আড্ডা ছিল শুধুই সুরারসিকদের জমায়েত। আমি ছিলুম বহিরাগত।

সুনীলের গড়িয়াহাট রোডের (ঢাকুরিয়ার) বাড়িতেও আড্ডা হত রোববার দিন সকাল বেলাতে। ওদের ছাদের ওপরে একবার চাঁদনি রাতের আড্ডা খুব জমজমাট হয়েছিল, মনে আছে। তখন আইওয়া থেকে সুনীলের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু রাইটার্স ওয়ার্কশপ-এর তৎকালীন অধ্যক্ষ পল ইঙ্গল আর তাঁর চীনা স্ত্রী হুয়ালিং এসেছিলেন কলকাতাতে। ওই বাড়িতেই একবার সকালে এক পাবলিশার এসেছেন, নতুন লেখক সুনীলের কাছে। শীতকাল। সুনীল তাঁদের চা খাওয়াবে বলে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। চায়ের জল চেপেছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, চা আসছে না। শীতকাল। সুনীল স্বাতীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কী স্বাতী, চায়ের কী হল?' স্বাতী ভিজে চুল তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে এসে বললে, 'ও হো! তাই তো? আমি তো ওই জলটা দিয়েই চান করে এলুম।'

আমি গিয়েছি প্রধানত স্বাতী-সুনীলের বাড়ির আড্ডায়, তারাপদ-মিনতির বাড়ির আড্ডায়। এ.এই.আই.-এর আড্ডাতেও গিয়েছি, বুধসন্ধ্যার জন্ম হওয়ার আগে। এক একদিন কোথাও কবিতা পড়ার আসরের পরে কয়েকজনে দল বেঁধে লেক-এ গিয়ে বসেছি রাত্তিরে। আড্ডা হয়েছে চা সিগারেটের। আগে আগে বিজয়া-শরতের বাড়িতেও আড্ডা বসেছে, লেকভিউ রোডের বাড়িতে প্রণবের তরুণী বউ শ্রাবণীর গান শুনেছি সেখানে। আজ তো শ্রাবণীও নেই! প্রণবও গাইতে পারে, অমিতাভরও গানের গলা ছিল চমৎকার। আড্ডা দিতে এরা সকলেই অতি জবরদস্ত ছিল, আমি একক মেয়ে হয়ে এদের সঙ্গে এতদিন এতরাত অবধি সমানেই আড্ডা দিয়েছি, কেউ কোনোদিনও আমার বন্ধুত্বের অসম্মান করেনি, নারী-পুরুষের বিভাজনের কথা আলাদা করে মনে পড়িয়ে দেয়নি। শরৎ, প্রণব এরা এখনও আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এদের জীবনে আড্ডা আর নেই।

দীপক খুব গলা ছেড়ে গান গাইত বলে সে থাকলেই যেকোনো আড্ডা জমে উঠত। অবিশ্যি শক্তিরও গানের গলা খুব সুন্দর ছিল। সেই মত্ত কণ্ঠের গান সকলেরই শোনা। সুন্দর গান গাইতে পারত সমরেন্দ্রও। সুনীল তো বটেই। তার স্বলিখিত (সুনীলখ্যাপা গায়) দেহতত্ত্বের বাউল গান, 'কী ঘর বেন্ধেছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি' আশা করি শ্রীজাতদের গলায় শুনতে পাব। প্রণবেন্দু আর তারাপদকে গান গাইতে শুনিনি। ভাস্করকেও কি গাইতে শুনেছি? নাঃ। তার সঙ্গে আলাপ জমল অনেক পরে, তার হ্যারোর বাড়িতে, কুইন ভিক্টোরিয়ার সংসারে।

একবার সত্তরের দশকে অল্পবয়সি কবিরা কোনো লিটল ম্যাগাজিন থেকে, ঠিক মনে নেই কাদের ব্যবস্থায়, লেক মার্কেটের কাছে একটি দোতলার হল-এ দু-টাকার টিকিট করে শক্তি-সুনীলের কবিতা পাঠের সভা বসিয়েছিল, গোলাপি কাগজের টিকিটে আমাদের তিনজনের

নাম ছাপা হয়েছিল। আমি ছিলুম সঞ্চালক। সেদিন শক্তির মেয়ে তার স্ত্রী মীনাক্ষীর কোল থেকে পালিয়ে স্টেজে এসে শক্তির কোলে চড়ে বসছিল বার বার। আমার মেয়েরাও ছিল কচি শ্রোতাদের মধ্যে। কবিতাপাঠের পরে আমরা সবাই লেক-এ গিয়ে বসেছিলুম। তারাপদ, শরৎ বোধ হয় সস্ত্রীক ছিল সেখানে। সন্ধেটা খুব সুন্দর কেটেছিল। আড্ডা জমত বটে তারাপদর বাড়িতে। তারাপদর বিখ্যাত (তিন জোড়া ঘুমন্ত পায়ের অবুঝ লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র রচনাবলি লুটিয়েছিল যে ঘরের পাপোশে!) মহিম হালদার স্ট্রিটের দোতলার ঘরে গিয়েছি বটে অমর্ত্য সমেত, তারাপদর ঘুনসি পরা সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে দেখতে, কিন্তু সেই বাড়ির আড্ডায় আমি ছিলুম না। তখনও তো দেশে ফিরে আসিনি। আমি আড্ডা সবচেয়ে বেশি দিয়েছি তারাপদর পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে। প্রতি ২৫ বৈশাখের পরে শক্তি, সুনীল, দীপক, স্বাতী, শরৎ, বিজয়া, সমরেন্দ্র, সন্দীপন— আমরা ওখানে গিয়ে জড়ো হতুম সারাদিনের জন্যে। মিনতি খিচুড়ি রান্না করে ফেলত, আমরা সারাদিনের পরে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরতুম। আমি তো শ্বাসকষ্টের জন্যে রাতে তাড়াতাড়ি খাই, খেয়েদেয়ে রাত্তিরে তারাপদ মিনতির বাড়িতে চলে যেতুম, সেখানকার আড্ডায় সুনীল স্বাতী দীপক প্রণবেন্দু সন্দীপন জ্যোতি মিমি, কবিতাদি, অনেক বন্ধু আসত, শরৎবাবু বিজয়া প্রণবও। শক্তি রিকশা চেপে এসে গণ্ডগোল পাকিয়েছে কতদিন। রাত দেড়টা দুটো অবধি আড্ডা দিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছি। পরের দিন সকলেরই কাজে যেতে হবে। শংকরদের বাড়িতে একটা আড্ডা ছিল রবিবারের সকালে। শ্যামল দত্তরায়েরাও তাতে ছিলেন। শংকরের মা খুব স্নেহপ্রবণ, কিন্তু কড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে এসে গল্প করতেন। শংকর অফিসের কাজে একবার গৌহাটিতে গিয়েছিল, আর ফিরে এল না। গৌহাটি থেকে মা-কে লেখা চিঠি এসে পৌঁছেছিল তার মৃত্যুসংবাদের পরে। আমরা সেটা দেখেছিলুম। তাতে শংকর লিখেছিল রাস্তার মাঝখানে একটা ঘোড়ার চিত হয়ে পড়ে শূন্যে চার পা তুলে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করার কথা। মৃত্যুর পরে মায়ের কাছে আসা শংকরের সেই চিঠি, মরণপথযাত্রী ঘোড়ার সেই ছবি আমি ভুলতে পারিনি। আমি কেন, আমার মনে হয় আমরা কেউই ভুলিনি। ওই সময়ের কাছাকাছিই চলে গেল দীপেন। আমার এই লেখা শুধুই চলে যাওয়া মানুষদের গল্প। এখন যাদের সঙ্গে সুনীলের দেখা হচ্ছে, যারা এসে সুনীলকে নিয়ে নতুন করে আড্ডায় বসেছে, তাদের গল্প। আড্ডাবাজ নিমাইও গিয়ে জুটেছে নির্ঘাত সেখানে। ২৫ বছর বিলেতবাসের পরে নিমাই যেবারে প্রথম কলকাতায় ফিরে এল, তার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিতে আমি ডেকেছিলুম আমাদের কৃত্তিবাসের বন্ধুদের। শঙ্খদা তো কৃত্তিবাসের গোড়া থেকেই ছিলেন সুনীলের পাশে। শঙ্খদাও এসেছিলেন সেদিন। অলোকরঞ্জন কি ছিলেন? মনে নেই। অলোকদার গলাতেও অনেক গান শুনেছি আমরা। কিন্তু আজকের এই গল্প তাঁদের নয়। দীপক সেদিন গভীর রাত অবধি দোতলার লোহার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বসে অনেকগুলো গান করেছিল, আজও মনে পড়ে। তখন ভালো-বাসা বাড়িতে একটা লোহার বারান্দা ছিল, যেটা এখন আর নেই। শ্যামলের গল্প শেষ হওয়ার নয়। তার দুষ্টুমি নষ্টামি অগুনতি। যাদবপুরে আমরা ক্লাসমেট ছিলুম। আমার সঙ্গে প্রেম হল না বলে শ্যামল ঠিক করল যারই বউ হই, আমার ৫০ বছর বয়সে সে আমাকে বিয়ে করবেই। কথাটা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিত। আমার ৫০ বছর বয়স যেদিন হল, শ্যামলের

সুন্দরী স্ত্রী ইতি ফোন করে বলল, 'শ্যামল বলছে, এইবারে তোমার যে ওকে বিয়ে করার কথা ছিল, তার কী বল? আমার তাতে আপত্তি নেই।' এমনি বদখত ছেলে ছিল শ্যামল।

অমিতাভর সঙ্গে ভাব হল অনেক কাল আগে, ধানবাদ, না আসানসোল, কোথায় যেন কবিতা পড়তে গিয়ে। ফিরেছিলুম অনন্তকাল ধরে, সারাটা রাস্তা ট্রেনে দাঁড়িয়ে। 'ভালো আছো, কলকাতা?' কলম আমি এখনও মিস করি। তাতে আমাদের চেনা মানুষদের, চেনা দিনের গল্প থাকত।

পূর্ণেন্দুর 'ছেঁড়া তমসুক' ছবির মধ্যে আমরা সবাই ঢুকে পড়েছিলুম, শুটিং নিয়ে সে কী উত্তেজনা! ছবিতে 'কবি সম্মেলন'-এ কবিতা পড়লেন শক্তি সুনীল তারাপদরা। স্বাতী, মিনতি, নবনীতারা শ্রোতা, সামনে। সবাইকে বলেছি, 'ছবিটি দেখতে যেয়ো, আমরা আছি!' সিনেমাটা হল-এ দেখতে গিয়ে দেখি ছি ছি এই দৃশ্য!' দর্শকদের মধ্যে বসে নবনীতা বিশাল অসুন্দর এক হাই তুললেন। শুটিং-এ আসলে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, আমরা খুব এলিয়ে পড়েছিলুম ততক্ষণে। পূর্ণেন্দুর প্রসঙ্গে মনে পড়ল অন্য এক আড্ডার কথা। সে তখন কলকাতা বইমেলায় 'প্রতিক্ষণ'-এর স্টল গড়ে দিত, স্বপ্নাদের সঙ্গে আমরা অনেকে, (দেবেশ, শঙ্খদা) অনেক সময়ে রাত অবধি উপস্থিত থেকে ভাঁড়ের চা খেয়ে আড্ডা দিতুম। সেই চায়ের আড্ডা অন্য জাতের। পূর্ণেন্দুর তৈরি স্টল শ্রেষ্ঠ ছোটো স্টলের পুরস্কার পেয়েছে ক-বার।

বইমেলার প্রসঙ্গে মনে পড়ল, নতুন নতুন শুরু হওয়া বইমেলার মাঠে আমি হেঁটে চলেছি দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। একজনের পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, মালকোঁচা মারা ধুতি, বাবরি চুল, বড়ো বড়ো চোখের নজরে তিনি প্রতিটি নারীর প্রাণহরণ করতে করতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে চেক চেক কাপড়ের বুশ শার্ট, প্যান্ট পরা একটি লম্বা মতো, ষণ্ডাগুন্ডা ছেলে। তেরছা চাহনিতে স্ত্রী পুরুষের প্রাণহরণে সেও কম দড় নয়। কবি কবি চেহারার প্রথমজন বিবর-লেখক, সমরেশ বসু। কাঠখোট্টা ছেলেটাই নীরা-র প্রেমিক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের দুজনকেই ঘিরে ধরেছে সই-শিকারির দল। আমি কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছি একপাশে। আমার সই চাইছে না কেউ। আমিও কবিতা লিখি বটে কিন্তু শুধু আমার বন্ধুরাই বোধ হয় পড়ে। খানিকক্ষণ পরে সুনীলের মায়া হল। একটা খাতায় সই করে খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, রেকমেন্ডেশন সহ।... 'এরও সই নাও তোমরা, ইনি কবি নবনীতা দেব সেন।' সই গ্রাহকের সুস্পষ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি মহানন্দে সই দিয়েছিলুম। বোধ হয় সেই আমার বইমেলাতে প্রথম সই দেওয়া।

প্রণবেন্দু আর আমি এক জাহাজে বিদেশ যাত্রা করি। বিলেতে সাতদিন থেমে, তারপরে আমাদের কানাডার পথে আমেরিকা যাত্রার কথা 'সাত সমুদ্র' নামের অন্য এক জাহাজে। কিন্তু ইতিমধ্যে কেম্ব্রিজে আমার সঙ্গে অমর্ত্যর বাগ্‌দান হয়ে গেল, আমি আরও কিছুদিন ইংল্যান্ড-এ থেকে গেলুম। আমাদের আর একসঙ্গে আমেরিকা যাওয়া হল না। প্রণবেন্দু আমাকে একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল খামের মধ্যে মাত্র একটি লাইন— 'কথা ছিল এক তরীতে—'। এক তরীতে কি কেউই কোনোদিন ফিরে যেতে পারি? আসা হয়, ফেরা হয় না।

সুনীলের সঙ্গে আমার শেষ মঞ্চাভিনয়, 'শাজাহান'। নাটকের বাদশা বেগমদের মধ্যে এক ফাঁকে ঢুকে পড়া সুনীলেরই তৈরি দুটি গ্রামীণ চরিত্র আমরা। সরল, বয়স্ক, চাষা আর চাষা বউ, ঘোর বজ্রবিদ্যুতের রাতে, প্রকৃতির দুর্যোগে ভীত হয়ে, আর যুদ্ধের সম্ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে দুজন

দুজনের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চে আমাদের সব কথাবার্তাই ছিল মৃত্যু নিয়ে। কখনো চাষা বলছে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'— আর চাষা বউ বলছে, 'হয় যুদ্ধে মরবো নয় বজ্রপাতে! যা অবস্থা, এবারে মরণ আমাদের হবেই।' সুনীলের শরীর ভালো ছিল না, আমাকে বলে দিয়েছিল স্টেজে তার হাতখানা শক্ত করে ধরে রাখতে। মাথা ঘুরতে পারে। (আমারও তো পা টলোমলো!) তা হোক, শক্ত করে সুনীলের হাত ধরে স্টেজ ছেড়ে যাওয়ার আগে এইটে ছিল আমার মুখের শেষ উচ্চারণ। সেটা ৬ অক্টোবর। শক্ত করে সুনীলের হাত আমরা আর ধরে রাখতে পারলুম কই?

কিন্তু সে তো অভিনয়। তার অল্প কিছুদিন আগে, এক শনিবারে, তারিখ পিনাকী বলতে পারবেন, বোধ হয় গেল অগাস্ট মাসেই, 'শুভম'-এ, কৃত্তিবাসের আড্ডায় শেষ যেদিন সুনীল কবিতা পড়লেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। প্রথমে কবিতা পড়তে উঠে ভনিতা করতে গিয়ে আমি বললুম, 'আমাদের এখন যেমন বয়েস, রোজই বন্ধুরা কেউ-না-কেউ চলে যাচ্ছেন, এখন সবসময়েই ভয় ভয় করে। শরীর খুব ভালো নেই তবু এলুম, কে বলতে পারে কে কবে আছি কে নেই, হতেই পারে এই হয়তো আমাদের শেষবারের মতো একসঙ্গে কবিতা পড়া?'

আমাকে অনেকেই বকুনি দিল তারপরে। এ-রকম হতাশামূলক বাক্য নাকি আমার মুখে বেমানান। কোন বাক্য মুখে মানাবে, অতশত ভাবি না তো কথা বলার সময়ে? কেন বললুম জানি না, কথাগুলো আপনি উৎসারিত হল আমার ঠোঁট থেকে।

সেদিন কবিতা পড়া শুরুর আগে সুনীল অনুরোধ করেছিল আমার শেষ বই থেকে ছোটো ছোটো কবিতাগুলো পড়তে। সেইগুলো তার ভালো লেগেছিল। 'আনন্দবাজার'-এ সাম্প্রতিক কলামটি লেখা শুরু করার প্রথমদিনেই আমার সেই বইয়ের একটা দু-লাইনের কবিতা সযত্নে নামসহ উল্লেখও করেছিল সুনীল। —'তুমি যতো বলো/চিরদিন চিরদিন/আমি শুনি শুধু/ আজকেই, আজকেই।'

কৃত্তিবাসের অলিন্দে সেইটেই আমাদের দুই বন্ধুর একসঙ্গে কবিতা পড়ার শেষ সন্ধ্যা!

আজকেই। এবং চিরদিন।

হাওয়া স্পর্শ করো

সে কি ভালো আছে?
যতটা থাকলে ভালো অন্ধকারে একা একা থাকা যায়
ততটা ভালো কি?

না, ততটা ভালো তিনি ছিলেন না ইদানীং, সেই কবি, যিনি আমাদের বলতে চেয়েছিলেন, 'জীবন নয় জীবনসংগ্রাম'। সেই কবি, যিনি, 'নরম মাটির গন্ধে' মেতে উঠতেন, যিনি বলেছিলেন, 'নরম মাটির বুকে পা ফেলে পা ফেলে মানুষ চলেছে।'

মানুষ তো এখানেই থেকে যেতে চায়,
গাছ হতে চায়, যাতে সমস্ত শিকড়
আরো মাটির গভীরে যেতে পারে।

'এই পৃথিবীর গন্ধ তার ভালো লাগে'।
বলেছিলেন,

তোমরা যাই বলো,
আমি যতোদিন পারি, ততোদিন
এই নরম মাটির কাছে থেকে যাবো।

হ্যাঁ, সেই কবিও পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হন, কেননা, 'মানুষকে কেঁপে উঠতে দেখে অন্য মানুষ স্থির থাকে।'

তাই বিপরীত বাক্য উঠে আসে, 'মানুষ পারে না। এক জায়গায় এসে স্পষ্ট ভেঙে পড়ে।' বাঁচার চেষ্টা কবিমানস তবুও ছাড়ে না,/কিন্তু তার সে চেষ্টা কতদূর গ্রাহ্য হয় মানবসমাজে? 'মানুষ যে চেষ্টা করে এই কথা অন্য মানুষ মেনে নেয়?' প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে কলম শুকিয়ে আসে, ফুসফুসের বাতাস ফুরিয়ে আসে, তখনও কবি বলেন, 'এই ভালো মানুষ চিনতে চিনতে দিন কেটে যায়— এখনও পাগল হইনি, কিন্তু একদিন হয়তো হয়ে যাবো তখন মানুষ এসে গলায় বগলশ দিয়ে আমাকে রাস্তার ওপরে টেনে নেবে।' যে মানুষের দিকে যেতে কবির এত আকুলতা, সেই মানুষের প্রতি তাঁর নির্ভরতা থাকছে কই? মানুষ তো এক অত্যাচারী মনিব, পাগল কবি তার কাছে সারমেয় সমান জীবমাত্র। একমাত্র কবিতায় কবির নিরাপত্তা আছে। বাস্তব জীবনকে তাঁর ভীতি, 'না হলে জীবন এসে গ্রাস করে নেবে/মানুষজনের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে একা!' অথচ সেই হিংস্র 'মানুষ জনের' টানও তো কম নয়, তার অভাবে অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে। 'তবু মানুষের সঙ্গে মানুষজনের যোগাযোগ/ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে।' কবি দোটানাকে দোটানা বলে

মানতে রাজি নন। 'আমি একা থাকতে চাই, আবার সবার সঙ্গে/চুক্তিহীন যোগাযোগ চাই।' কিন্তু স্ববিরোধে জর্জর অযৌক্তিক শঙ্কায় অস্থির হয়ে তিনি লেখেন, 'প্রিয় মাটি,/এখন মৃত্যুর কথা শুধু ভাবি,/তোমাকে ভাবি না।' লেখেন, 'আমি মরে যাইনি তো, পোড়াকাঠ? মানুষের সন্দেহ-ঘৃণায়/ আমার অস্তিত্ব আজ উবে যায়নি তো?' কবি সচেতন চেষ্টা করেন যোগাযোগ ঘটানোর—

আমি করজোড়ে বলি, 'এসো কাছে এসো,
অন্ধকারে আমরা কেন এখনো একাকী?'
এক অন্ধকার আছে,
তাকে নিয়ে দীর্ঘদিন বাস করা হল।
—ঈশ্বরের চোখ মুখ দেখা যায় না, এমন আঁধারে।

—বড়ো দীর্ঘদিন এই অন্ধকারে বাস করা হল। তারপরে? যতই অন্ধকার হোক, 'সামনে কি কিছু আছে? সামনে কি কিছু আছে? একটা পাখি ক্রমাগত শব্দ করে ওঠে।' এই শব্দ কবির বুকে যতদিন শোনা যাচ্ছে ততদিন কবিতাও রক্ষাকবচ হয়ে কবির পাশেপাশে আছে। কিন্তু সেই শব্দ যদি থেমে যায়? তখন যদি দেখা যায়— 'অন্ধকারে, সীসের খণ্ডের মতো/টুপ করে গলে পড়লো একটি মানুষ।/তারপর, রাত্রি নেমে এলো।'/— 'লোকটা কি সত্যিই মরতে চেয়েছিলো?/কেউ কি কখনো তা-ই চায়?/আর পাঁচজন তাকে প্রতিদিন একটু একটু করে/নিহত করেছে'— এই 'আর পাঁচজন'-এর সঙ্গে প্রণবেন্দু কোনো সম্পর্ক পাতিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার, যোগাযোগের কোনো সূত্রই বুঝি তৈরি হল না তাঁর। অথচ অসীম বাসনা ছিল মেলামেশার। 'আমি দিতে চাই, যদি শোক ছাড়া/কিছুই না-পারি, তবে/তাও কি দেবো না।' কিন্তু শোকের ভাগ নেওয়ার লোক কোথায়?

'জন্মেছিলাম, জন্ম হয়েছিল, এখনো বেঁচে আছি।'

প্রণবেন্দুকে যেদিন দেখতে গেলুম এ.এম.আর.আই.-এর ইন্টেন্সিভ ট্রিটমেন্ট ইউনিটে, যক্ষপুরীর যন্ত্রে যন্ত্রে রাখা তার প্রাণবায়ু, মৃত্যুর সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে নিরত সেই নির্জীব, জীবিত শরীরের দিকে চেয়ে লাইনটা ভেসে এল। তার পরেই কেউ কানে কানে বলল, 'তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম,/জীবন নয় জীবন সংগ্রাম।' এই মুহূর্তে এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিহাসের উচ্চারণ কী-বা হতে পারত। কিন্তু প্রণবেন্দুর সেদিন চেতনা ছিল, নাম ধরে ডাকতে নিমীলিত চোখের পাতা খুলে গেল, মণিগুলি চঞ্চল হয়ে আমাকে খুঁজে নিল, মেরি অ্যান বললেন, 'নবনীতা এসেছে,' প্রণবেন্দুর চোখ কি হাসল? ডান হাতটি তুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু নিষ্ঠুর সেলাই ফোঁড়াই আঁটন বাঁধনের হাতকড়ায় বন্দি হাতটি বেশি দূরে উঠল না। আমার মনে পড়ল, 'আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি জীবনের ভিতরে/সেখান থেকে আমি মুক্তি চাই না।'

এই বছরটা আমাদের মন কেমনের বছর হয়ে রইল। প্রথমে তারাপদ। তারাপদর পরে অমিতাভ, অমিতাভর পরে প্রণবেন্দু। পঞ্চাশের তিন কবিকে বিদায় জানাল ২০০৭। অথচ প্রত্যেকেরই হাতে সময় বাকি ছিল ঢের। সবে তো সত্তরের ঘরে পা পড়েছিল ওদের। হাসপাতালে প্রণবেন্দুর হাত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে তারাপদর কথা মনে পড়েছিল। পি.জি.-তে ইন্টেসিভ কেয়ারের খাটে শুয়ে আমার হাতটা ধরেছিলেন তিনি-ও। সেই বন্ধুদের সর্বশেষ স্পর্শ আমার ডান হাতে লেগে আছে।

তারপরে যে ক-দিন গিয়েছি, অচেতন প্রণবেন্দু জানতেও পারেননি কেউ তাঁর কাছে ভালোবেসে এল কি এল না। চিনতে পারেননি, তাঁর কপালে কার হাত।

এল বৎসরান্তের নিশিকাল। 'সোনাল ফুল রাত্রিবেলা ঝরে।'— আর সকাল বেলা তাঁর ঘরে চলে আসে সম্পূর্ণ অচেনা এক অতিথি। খুলে যায় অজানা এক জগৎ। 'শেষের ধাপের করুণ কাটাকুটি' সেখানেই ফুরিয়ে যায়। এবারে অন্য এক হিসেব শুরু হয়। অন্য অঙ্ক।

'... গড়ে উঠছে অনন্ত ওপার/তপ্ত শলাকার মতো গ্রহপুঞ্জ বিঁধছে আমার একশোতলা বাড়ির জানালা...।'

তাঁর সেই এক-শোতলা বাড়ির জানালাতে মানুষের মুখ উঁকি দিত না ইদানীং। যদিও কবির সব যাত্রাই ছিল মানুষের দিকে এমনকী যে কবিতা তাঁর অস্তিত্বের মূলে রস সিঞ্চন করে, সেই কবিতাকেও সাতদিনের জন্য উধাও করে দিতে পারত কোনো প্রিয় মানুষীর অমনোযোগ। কিন্তু মানুষের কাছে তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাঁর পাওয়া হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন আরও একটু ভালোবাসা। কিন্তু, 'চারপাশে ফণিমনসার ঝোপ এগিয়ে আসছে।' আর 'একটু একটু জ্বরে মানুষের সমস্ত শরীর পুড়ে যায়।'

এক অসহ দহনদাহের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে প্রণবেন্দুর সব শান্ত কবিতা।

'ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু বাইরে ছাই জমছে না
এই আমার চুরুট
একে তোমরা লক্ষ করো
...' 'তার পরে শুধু যখন, পুরোটা দেহ আগুনের আঙুলে গলে যাবে,
... তখন সবাই বলবে :
আহা, পুড়েছিলো। সারা জীবন পুড়েছিলো।'

যিনি লিখেছেন, 'মনে হয়, মানবজন্মে এসে। ভালো হলো খুব', তিনিই যখন লেখেন,

'তবু,
মানুষকে মরে যেতে দেখে
অন্য মানুষ সুখী হয়।
মানুষকে বেঁচে উঠতে দেখে
অন্য মানুষ ছুরি শানে।'

তখন আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। তখন আরেকরকম হিসেবের কথা মনে হয়।

এত তীব্র বিপরীতমুখী টানে জর্জরিত কবি মানুষটা একজনকেও প্রকৃত বন্ধু বলে, একজনকেও প্রকৃত প্রেমিকা বলে, একজনকেও প্রকৃত ভক্ত বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। 'তেমন মানুষী নেই যাকে তুমি সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পারো,/তেমন বন্ধু নেই, যে তোমাকে সমস্ত গুজব ছেঁকে/ঠিকমতো সাড়া দিতে পারে।' তাই প্রণবেন্দুকে লিখতে হয়, 'তবুও ককিয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ মানুষ!'

'বয়স হলে শিরোপা দেয় লোকে' কিন্তু সবার কপালে শিরোপা জোটে না। সঙ্গও না। সত্যিই তিনি ক্রমশ একাকী হয়ে পড়েছিলেন, ভিতরে, বাহিরে, ব্যক্তিগত এবং নৈর্ব্যক্তিক জনজীবনেও। সুখ দুঃখের কথা বলার, আড্ডা দেওয়ার লোক ছিল কি তাঁকে ঘিরে? সত্যিই তো, আমাদের

এত বেশি দান করে এত কম প্রতিদান পেয়েছেন তিনি! প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। এমন শক্তিশালী কবির কি আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্য ছিল না? অবশেষে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন যখন, তখন তা নিয়ে আহ্লাদ করার ক্ষমতা তাঁর দেহে মনে বাকি ছিল না। তবুও, আমরা বাংলা আকাদেমির কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। প্রণবেন্দুর মতো এমন সর্বতোরূপে কবি আমাদের মধ্যে ছিলেন, রয়ে গেলেন, এ আমাদের অসীম সৌভাগ্য।

প্রণবেন্দু মানুষ বড়ো অভিমানী, বড়ো অবুঝ। এক সময়ে নিজেকে নির্বান্ধব এবং সকল বিশ্ববাসীর অপ্রেমের শিকার বলে সন্দেহ করতে শুরু করলেন, আমাদের বন্ধুতায়, ভালোবাসাতে তাঁর বিশ্বাস রইল না। 'আমি চলে যাই, চলে যাই, চলে যাই'— স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করলেন নিজেকে, তালাচাবি বন্দি হয়ে রইলেন নিজের দোতলার কারাঘরে। টেলিফোন পর্যন্ত নেই, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, একক কুঠুরিতে দ্বীপান্তরী হয়ে শুধু কবিতার সান্নিধ্যে বাঁচা। কবিতাও কি বন্দিত্বে বাঁচে? দশ বছর তিনি শীধুপান করতেন না, কোনো নেশা নেই, অথচ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপন করেননি তিনি। মানুষের ভালোবাসায় অবিশ্বাসই বোধ হয় ওঁর প্রধান অসুখ ছিল এবং সে-রোগ সারেনি।

'অন্ধকারে আমরা কেন এখনও একাকী?' এই একাকিত্বের দায় কিন্তু তাঁরও ছিল সমপরিমাণে। মানুষ কাছে এসেছিল তাঁর, বন্ধুদের ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে-ভালোবাসা তাঁর সংশয় পারাবার পার হয়ে বুকের তীরে পৌঁছোয়নি। 'আর কিছু নয়, শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা', পরিণামহীন তো নয়, ভয়ংকর আর পরিণাম। কবির নিজেরও সে-কথা অজানা ছিল না।

'তোমার যন্ত্রণা তুমি।' তিনি লিখছেন। 'শুধু ভয় আর সন্দেহ,/ভয় আর বিমিষা'। যা প্রণবেন্দুকে ঠেলতে ঠেলতে সমাজ সংসারের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি জানতেন তাঁর কোথায় ত্রুটি। 'যদি বলতে পারতাম, তুমি আমার/তোমরা আমার স্বজন/তবে হয়তো হতো' কিন্তু বলা হল কোথায়?

কিন্তু তোমার একটা ইচ্ছে নিশ্চিত পূর্ণ হবে, প্রণবেন্দু। তুমি লিখেছিলে, 'কৃষ্ণের বাঁশির মতো বেঁচে থাকতে চাই কোনো স্মৃতির ভিতরে।' অসংখ্য চিত্তের মধ্যে বাজবে তুমি, বেজে চলবে তোমার কবিতা। 'একটি আকাশ চলে গেলে,/আমি স্পষ্ট জানি, তুমি রয়ে গেছো আমার হৃদয়ে।' শিল্পের আশ্রিত হওয়ার এই তো সুবিধে। শুনেছি ইদানীং তুমি শুধু রিলকের কবিতা পড়ছিলে। সম্প্রতি আমার পায়াভারী হয়ে দোতলায় উঠতে পারতুম না, আমাদের দেখা হয়নি কথা হয়নি প্রায় দু-বছর। কিন্তু এই ক-দিন তোমার বইগুলো খুলে তোমাকে খুব কাছাকাছি পেলুম। পড়তে পড়তে মনে পড়ে যাচ্ছে এক একটি কবিতার জন্মবৃত্তান্ত, সেই সকাল বেলাই উশকোখুশকো চুল, দাড়ি, পাঞ্জাবির পকেটে টাটকা কবিতা নিয়ে ভালো-বাসাতে চলে আসা, পড়ে না শোনানো অবধি শান্তি নেই। কোথাও প্রেম, কোথাও বেদনা, কোথাও ঈর্ষা। আমার মন কেমন করছে, প্রণবেন্দু।

এত তো কবি বন্ধু আমাদের, আমার মা বাবা, মাস্টারমশাইরা সকলেই কবি, কিন্তু তোমার

কাছেই আমি শিখেছিলুম, আমাদের মতো পাগলদের জীবনে কবিতা কত জরুরি, কবিতা কত শক্তিমান।

তিনি জানতেন, 'একা একা কিছুদূর যাওয়া যায় তারপর খুব ক্লান্ত লাগে।' তবু মানুষকে বিশ্বাস করেননি, 'একা মানুষের দুঃখ রাস্তার কুকুর শুধু বুঝতে পেরে শব্দ করে ওঠে।'

কিন্তু প্রণবেন্দু শেষ হাসিটি হেসেছেন বহুদিন আগেই। যখন নিজেই নিজেকে প্রতীক বলেছেন,

বয়স তখন চল্লিশ, 'ঢাল-আড়াল, ভেতরদিকে-বাঁধা-দেহে,
তুমি তখন প্রতীক,
তোমায় হারাবে কে?'

চিরকালের নিঃসঙ্গ শিল্পীর প্রতীক হয়ে চলে গেলেন প্রণবেন্দু, আমাদের সকলকে অপরাধী করে রেখে গেলেন।

'মানুষ যে ভালোবাসতে পারেনি এখনও
সেই কথা মানুষ কি জানে?'

হ্যাঁ প্রণবেন্দু, তুমি অভ্রান্ত।

'আমাদের আরো বেশি ভালোবাসবার কথা ছিলো।'

১৩ জানুয়ারি ২০০৮

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি

কবে যে শক্তির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল? আমার মনে পড়ে না। সুনীলের সঙ্গে আলাপের দিনটা যেমন মনে আছে, কবিতাদির সঙ্গে, কিংবা তারাপদর সঙ্গে প্রথম আলাপ। শক্তির বেলায় তেমন নয়। আমি তাঁর কবিতা আবিষ্কার করি বিদেশে চলে যাবার পরে, অর্থাৎ ১৯৫৯-এর পরে। ছুটির সময়ে যখন দেশে ফিরে আসতুম, একবার 'দেশ' খুলে হঠাৎ কেঁপে উঠি, 'ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে'। চমকে দেখি, 'অই কপালে কী পরেছ?' কিন্তু তখন আমাদের আলাপ হয়নি।

বিরামবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন 'ভারবি'তে, বোধ হয় 'সোনার মাছি খুন করেছি'-র প্রুফ দেখতে দাড়িওয়ালা শক্তি সেখানে বসেছিলেন। ভাব হল আরও পরে, বরাবরের মতো দেশে ফিরে এলুম যখন পাততাড়ি গুটিয়ে, শক্তি তখন রাজত্ব করছেন বাংলা কবিতার রাজ্যে। সঙ্গে জুটি আছেন সুনীল। আছেন শঙ্খদা, অলোকদা, উৎপল, তারাপদ, প্রণবেন্দু এবং অন্য বন্ধুরা। শক্তির সঙ্গে প্রথম প্রথম আমার ভাবের চেয়ে আড়ির ভাগটাই ছিল বেশি। ভাব ভালোবাসা ক্রমে ক্রমে জমল। শক্তি তখন বেশ দুর্দম। আমি কিঞ্চিৎ বেম্মো টাইপ, মদ্যপান করি না (তখনও দেশে ওয়াইনের চল হয়নি), ধূমপান করি না। শ্বাসরোগের কল্যাণে সিগারেটের ধোঁয়ায় মৃত্যুযন্ত্রণা পাই, অতএব বন্ধুদের সান্ধ্য আসরে বেশিক্ষণ টিকতে পারি না। তাঁরাও সেখানে আমার বিরস, বিধূম উপস্থিতি বেশিক্ষণ পছন্দ করেন না, ভিতরে কোথাও একটা বাধে, স্বাচ্ছন্দ্যেও। এদিকে অ্যালকোহলের সঙ্গে ধূমপান না করে বন্ধুরা কেউই পেরে ওঠেন না। আবার আমাকে একেবারে ফেলে দিতেও তাঁদের প্রাণ চায় না। শক্তি তখন মদ্যপানে কিংবদন্তি পুরুষ এবং তাই নিয়ে গৌরব বোধ করেন। রিকশাওলা, ঠেলাওলা, পানের দোকানি, সবাই চেনেন মধ্যরাতে ফুটপাথ বদল করা এই মহৎ কবিকে, শুধু আমিই চিনি না।

অথচ সে-কবি নাকি আমারই কলেজে পড়েছেন, আমার সঙ্গে নয়, সামান্য আগে পরে, প্রেসিডেন্সিতেও, যাদবপুরেও। দেখা হয়নি।

বন্ধুদের মুখে তাঁর দুষ্টুমির, অপকীর্তির অনেক গল্প শুনেছি, কিছু কিছু মুদ্রণ-অযোগ্য নষ্টামি, কিন্তু নিজে আস্বাদন করিনি তাঁর দৌরাত্ম্য, তাই শোনাকথা সবটা বিশ্বাস করিনি, স্পষ্ট ধারণা নেই শক্তির ব্যাপারটা ঠিক কেমন। তখনও তাঁর কণ্ঠস্বরের অসংকোচ ঘোষণা শুনিনি, 'আ—মি স্বেচ্ছাচারী!'

আমার দেশে ফেরার পরে কবি দীপক মজুমদার দেশে ফিরলেন তাঁর দ্বিতীয় বউ ক্যারলকে নিয়ে। সত্তরের গোড়ার দিকের কথা, ৭৩/৭৪ হবে? আমি ক্যারলের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে সবাইকে একদিন রাত্রে খেতে ডাকলুম, শক্তিকে চিনি না কিন্তু 'শক্তিকেও নিয়ে এসো বাড়িতে' বলেছিলুম বন্ধুদের কাউকে। বাবা সুরারসে দীক্ষিত ছিলেন না,

আমাদের বাড়িতে শীধুপানের চল ছিল না। যদিও পিতৃবন্ধুরা অনেকেই মদ্যপ্রিয় ছিলেন কিন্তু 'ভালো-বাসা'তে সেটা চলে না জানতেন এবং মানতেন। মা খুব কড়া, বাড়িতে অতিথিদেরও মদ্যপানের অনুমতি দেননি। সেযুগে তাতে আড্ডার অভাব হয়নি 'ভালো-বাসা' বাড়িতে। এতদিনে বোধ হয় এটাও বুঝতে পেরেছি যে, বাবার বন্ধুদের সব আসরগুলি কেন রবিবারের দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের আড্ডা হত, সান্ধ্য আসর নয়। এ বাড়িতে আমার বন্ধুদের আড্ডার যুগে অধ্যাপক বন্ধুরা সেটা সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু লেখক বন্ধুরা মেনে নিতে পারেননি। তাই বিনা সুরার নৈশভোজে ডাকলে তাঁরা অন্যত্র পানপর্ব ও আড্ডা সমাপনান্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে শুধু খাবারটুকু খেতে আসতেন বেশি রাত করে, আড্ডা আর হত না। অনুপায় হয়ে মেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানতে পারিনি মন থেকে। মনে হত ওটা লেখক শিল্পীদের লাইসেন্স নেওয়া, কিছু ভালো অভ্যাস নয়। বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যাব, তারা মদ্যপান করে না বলে তাদের সঙ্গে মেলামেশা নয়, দুটো সুখদুঃখের কথাবার্তা নয়, একটু গল্প-টল্প নয়, ইয়ার্কি ঠাট্টা নয়, শুধুই নিমন্ত্রণ রক্ষার খাতিরে আত্মীয়বাড়ির মতো গোমড়া মুখে গিয়ে অমন নামকা ওয়াস্তে খাওয়া কি ভালো? আর, খাওয়াতেই কি মন আছে? পাতের দিকেও তো মন নেই। যত্ন করে রান্না করলুম তাঁরা তো বুঝলেনই না কী খেলেন, কেমন রান্না। তো, খাবার আগে সুরা পরিবেশনের চলন না করলে লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে না এটা বুঝেছিলুম।

কিন্তু সুরা চালু করিনি, মা যতদিন ছিলেন, মায়ের মতোই সংসার চালিয়েছি।

দীপকের বউ দেখতে সেদিন কিন্তু সবাই সময়ে এসেছিলেন এবং অ্যালকোহলের অভাবে বিরক্ত হননি কেউই। শুধু একজন ছাড়া। খবর পেলুম কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসে আমাদের বাড়ির নীচের শ্বেতপাথরের রোয়াকে বসে পা নাচাচ্ছেন, ডাকাডাকিতেও ওপরে আসছেন না। আমি নীচে গিয়ে ডেকে আনলুম, তখন বললেন আমি নিজে কেন ওঁকে আসতে বলিনি, অন্যের কথায় তিনি আসবেন কেন? সত্যিই তো। আমি মাপ চেয়ে নিই। তা, শক্তি তো ওপরে এলেন। আমি খুশিতে গদগদ। কিন্তু শক্তি যে শক্তিসংগ্রহ করেই এসেছেন তা আমি না বুঝলেও বাকিরা টের পেয়েছিলেন। এসে পৌঁছানোর পরে অতিথিদের আনারসের রস দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছিল। হঠাৎ শক্তির পায়ে লেগে তাঁর ফ্রুটজুসের গেলাসটা উলটে পড়ল ফরাশের সাদা চাদরের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রবল হাঁ হাঁ করে উঠলেন দেখে আমি ভাবলুম, এত কী? তেমন কিছুই তো হয়নি, ওটা তো চাদরই মাত্র, ধুলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আরেক গেলাস জুস এনে দেবামাত্রই শক্তি এবার এক সদম্ভ পদাঘাতে সেটি উলটে দিলেন। প্রণবেন্দু আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'আর ওকে জুস দিয়ো না, শক্তি ইচ্ছে করেই লাথি মারছে জুসে, মদ নেই বলে চটে গেছে।' আরও কয়েকজনের জুসের গেলাস উলটে দিয়ে শক্তি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেলেন। দীপক প্রাণ ঢেলে গান গাইলেন, সেদিন খুব সুন্দর আড্ডা হল, সন্দীপন, শ্যামল, তারাপদ মিনতি, প্রণবেন্দু, সুনীল স্বাতী, সমরেন্দ্র, শুদ্ধশীল, সম্ভবত জ্যোতি মিমিও ছিলেন। অনেকে একত্র হয়েছিলুম সেদিন, সব মুখ মনে পড়ছে না।

তবে সন্দীপন যে বার বার ক্যারলকে পরমাসুন্দরী বলছিলেন, এটা মনে আছে। সন্দীপনও মেজাজে ছিলেন।

এও সেই সত্তরের গোড়ার দিকেই হবে, শক্তির তখন মেয়ে হয়েছে, মেয়েকে নিয়ে তাঁর খুব

আহ্লাদ। লেক মার্কেটের উলটোদিকের একটি অচেনা হল ঘরে একবার সুনীল-শক্তি জুটির 'যুগলবন্দি কবিতাপাঠ'-এর বন্দোবস্ত হয়েছিল, দু-টাকা করে সবুজ রঙের পাতলা কাগজে টিকিট কেটে শুনতে আসতে হবে। আমাকে করা হয়েছিল সঞ্চালক। ব্যস, এই তিনজনের মঞ্চ। কিন্তু শক্তি হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে এলেন আরেকজনকে, তার গুবলুগাবলু খুদে সুন্দরী কন্যাটিকে। বেশ কিছুক্ষণ সে ছিল বাবার পাশে, মঞ্চে। আমার সেই ছোট্টো, মিষ্টি, আর অসাধারণ দৃশ্যটা চোখে লেগে আছে। ছোটো-বড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, আর কোনো কবিকেই আমি সাধারণ মঞ্চে এমন একটি অমূল্য মুহূর্ত তৈরি করতে দেখিনি। সেদিন সেই এক অচেনা অখ্যাত হল-এ টিকিট কেটে প্রিয় কবিদের কবিতা শুনতে আসার পরীক্ষাতে কিন্তু কলকাতার কাব্যপ্রেমীরা পাশ করেছিলেন। আমার দুর্ভাবনা মিথ্যে প্রমাণ করে, সেই দোতলার হল ঘর ফাঁকা ছিল না। সেদিনের সেই কচি মেয়ে এখন নিজেই মা হয়েছে, মীনাক্ষীর কোলে তার ভারি মিষ্টি সন্তানকে দেখেছি। এমনকী তার ছোটোভাই তাতারও বাবা হয়ে পড়েছে। শক্তি এখন অন্তরাল থেকে রহস্যময় হেসে উপভোগ করছে, শুধু পিতা নয়, সে এখন দাদামশাই, ঠাকুরদাদা সব কিছু। সেদিনকার তরুণ তরুণী কবিদের মধ্যে এখন অনেকেই উধাও, বাকিরা প্রবীণ। সন্তানের চিবুক ধরে চুমা খেয়েও চলে যেতে হয়েছে শক্তিকে। অসময়ে। ষাট বছরে কোনো কবির কাজ ফুরোয় না, নতুন করে বাড়ে। শক্তি চলে গিয়েছেন, আলো ঝলসিয়ে জয় গোস্বামী এসেছেন আর এক নতুন যুগের নিশান বয়ে। তবু শক্তির অনুপস্থিতি নানাভাবে এখনও অনুভূত হচ্ছে বাংলা কবিতার সংসারে।

তারাপদর বাড়িতে শক্তি সুনীলের সঙ্গে অনেক আড্ডা হয়েছে, ২৫ বৈশাখের দুপুরগুলো তো ছিলই। সুনীলের গড়িয়াহাট রোডের তিনতলায়, শরৎ বিজয়ার লেক রোডের দিকের বাড়িতেও অনেকবার দেখেছি শক্তিকে। একসঙ্গে নানা জায়গায় গিয়েছি দল বেঁধে, কবিতা পড়তে। আস্তে আস্তে শক্তি মীনাক্ষীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। দেখা যত হত ভাবটা তার চেয়ে বেশি। একবার উত্তরপাড়ার এক সমিতির আমন্ত্রণে দুই ট্যাক্সি ভরা তরুণ কবি গিয়েছি কবিতা পড়তে। আনন্দ করে কবিতা পড়ে আবার দুই ট্যাক্সি ভরে খুশি এবং ক্লান্ত কবিরা ঘরে ফিরে আসছি, শক্তি হঠাৎ বিষম জোরে চেঁচালেন, 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও!' থামল গাড়ি, কিন্তু সবাই বিরক্ত শক্তির খামখেয়ালিপনায়। শক্তি শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁরে সুনীল, ট্যাক্সির পয়সাটা কে দেবে?' 'তাই তো?' গাড়ি ফিরল, কবিসম্মেলনের কর্তাব্যক্তিদের ধরা হল। অন্যমনস্কতায় ভুল হয়ে গিয়েছিল। শক্তির ফুর্তি আর অহংকার দেখে কে? এত লোক থাকতে ওরই তো কেবল মনে পড়েছে ভাড়ার ব্যাপারটা। নইলে এত ফুর্তি, এত আনন্দ শোকে পর্যবসিত হও। তবে নাকি শক্তি দায়িত্ববান নয়?

শক্তিকে তাঁর বন্ধুরা সবাই ভালোবাসতেন, তাঁর কবিতাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর বেচালকে চোখ বুজে প্রশ্রয় দিতেন, দস্যি ছেলেকে বড়োরা যেমন দেয়। মাঝে মাঝে আদরে শক্তি যখন বাঁদর হয়ে উঠতেন, সহ্যের সীমা ভঙ্গ হত, তখন নাচার বন্ধুরা বাধ্য হতেন অগত্যা তাঁকে কিঞ্চিৎ শাসন করতে। সেটাও ছিল শক্তির ওই আহ্লাদেপনার নিয়মের মধ্যেই বাঁধা ধরা।

শক্তি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বেশ অনেক বছর পরে, তখন মা আর নেই। শীধুপায়ীদের নিষেধ ঘুচেছে। নীচের তলায় কিছুকাল বুধসন্ধ্যার আড্ডা বসত। শক্তি সেখানে এসেছিলেন দুই এক সন্ধ্যায়। শক্তি আর সুভাষদা দুজনেই একদিন এসেছিলেন, মেজাজে ছিলেন,

ফলত সেই সন্ধ্যাটি শেষের দিকে হয়ে উঠেছিল বেশ একটু মুশকিলের এবং সেই কারণে অবিস্মরণীয়।

অবিস্মরণীয় ছিল শক্তির ৪৯ বছরের জন্মদিনটিও। সুন্দর একদিক থেকে। ঠিক সেই দিনটায়, ২৫ নভেম্বর, একটা কবিসম্মেলনে গিয়ে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে ছিলুম, 'উনপঞ্চাশ বায়ু'-র প্রসঙ্গ তুলে নীরেনদা শক্তিকে খেপাচ্ছিলেন। সেদিন শক্তির মেজাজ ছিল বিষাদ-মধুর, শান্ত, আসন্ন অর্ধশতাব্দীর আবছা আলো-আঁধারি এসে পড়ছিল তাঁর কথায়, গানে। অনেক গান গেয়েছিলেন সেই রাত্রে কবিরা। শক্তি, নীরেনদা, সুনীল এবং সমরেন্দ্র। সবার কণ্ঠে সুর আছে। অনেক আড্ডা হয়েছিল, অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন সকলে, আমি সেদিন একমাত্র মেয়ে-কবি সেখানে। গানও গাইনি কবিতাও বলিনি শুধু প্রাণভরে দেখেছি। আগেই বলেছি কলকাতাতে কবিদের সন্ধ্যার আসরে আমার সাধারণত বেশিক্ষণ থাকা হত না। বাচ্চারাও ছিল, ঘরে ফেরার টানও ছিল। শক্তির জন্মদিনের সেই রাতের আড্ডায় আমি উপস্থিত ছিলুম বলে আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের দেখেছি, শুনেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। কেউ বেচাল হননি, দিলখুশ মাতাল হয়েছিলেন সকলেই, কিন্তু কোনো অশান্তি হয়নি। সীমা অতিক্রম করেননি কেউই। শুধু ভালোবাসাবাসি। মোটামুটি শক্তি ঠিক থাকলেই সন্ধ্যা ঠিকঠাক থাকে। শক্তি সেদিন খুব সুন্দর মেজাজে ছিলেন, আমি যতক্ষণ দেখেছি, ভারি মনোরম হয়েছিল তাঁর জন্মদিনের সন্ধ্যাটি।

আর একবার, দীপক আর ক্যারলের নাকতলার বাড়িতে (বুদ্ধদেব বসুর বাড়ির সামনে) একটা আড্ডায় আমার ডাক পড়েছিল। সেদিন শক্তি এলেন কারণসুধা সিক্ত হয়ে, এবং আমাদের মধ্যে একটু কঠোর ধরনের মনোমালিন্য হয়েছিল। সেটা ভুলে যাবার নয়। বর্ণনা করবারও নয়। কিন্তু তার পরেই আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল, শক্তি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন, খবর জেনেই আমি ছুটলুম তাঁদের কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে অভিনন্দন জানাতে। তখনও এসব হত, বন্ধুদের সুখবরে বন্ধুরা খুশি হতেন।

গিয়ে দেখি আকাশবাণীর লোক এসেছেন, শক্তির সঙ্গে কথা বলতে। আমাকে দেখে তো খুব খুশি, হাতে হাতে প্রতিক্রিয়া! তাড়াতাড়ি কবিতাদির সঙ্গে কথা বলে নিলেন, কবিতাদি বললেন, শক্তির কথাবার্তাটি তাহলে আমার সঙ্গেই হোক, অর্থাৎ ওদের বাড়িতে বসে সেই আনন্দের মুহূর্তে আকাশবাণীর হয়ে আধ ঘণ্টার সাক্ষাৎকারটা আমিই নিয়ে নিই।

বেশ, খুব আহ্লাদের কথা, কিন্তু একটু প্রস্তুতির সময় দিতে হবে দুজনকে। দুজনে মিলে বসে প্রশ্ন ঠিক করলুম। শক্তি কী বলতে চান পাঠকদের, তেমনি করে কিছু প্রশ্ন সাজালুম, আর কিছু প্রশ্ন তাঁর মুখে আমি কী শুনতে চাই, তেমনি। সেদিন আকাশবাণীর কল্যাণে এক অদ্ভুত ফিরে দেখা-র মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল, শক্তির সঙ্গে তার কবিতা নিয়ে নানা ব্যক্তিগত শিল্প প্রসঙ্গ আলোচনা করে আমাদের নিজেদেরও ভালো লেগেছিল। এমন সুযোগ তো বেশি হত না।

সেদিন সকালের সেই সাক্ষাৎকারটি বার বার প্রচারিত হলেও আমি কোনোদিন শুনিনি। মীনাক্ষীর কাছে শুনেছি সাক্ষাৎকারে শক্তি খুব প্রাণবন্ত আর খুশি ছিলেন, কবিতা পাঠ করা ছাড়াও, নিজের কবিতা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। খুব খোলামেলা মেজাজে ছিলেন, স্বচ্ছন্দে অনেক কথা আলোচিত হল, কোনো জটিল মুহূর্ত আসেনি। আকাশবাণীর কাছে একটি

ক্যাসেট চেয়েও আমি জোগাড় করতে পারিনি। অবশ্য তখন ওখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তী ছিলেন না। সরকারি কড়াকড়িও কবিতা সিংহের সময়ে অনেক বেশি ছিল, তবু কবিতাদি সাহিত্যিকদের নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। এখন স্বপ্নময় সেগুলি উদ্ধারে লেগেছেন।

মীনাক্ষী এক অসাধারণ মেয়ে। নানা ধরনের বিচিত্র পরিস্থিতিতে শক্তিকে সামলে, চাকরি করে, সংসার করে, তাঁর সন্তানদের সযত্ন লালনপালন করে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের বিয়েতে বেলেঘাটাতে নিজস্ব বাগানওলা বাড়িতে আমাদের রাজসূয় নেমন্তন্ন খাইয়েছেন। তাঁকে যত দেখেছি মুগ্ধতা বেড়েছে।

অনেকদিন আগে প্রথম দেখেছিলুম শান্তিনিকেতনে, পৌষমেলাতে কালোর দোকানে, বন্ধু রুচিরার সঙ্গে। পিঠে মোটা বিনুনি, ফর্সা মুখটি রোদে লাল, বুদ্ধি-উজ্জ্বল, লাবণ্যময়ী এক তরুণী, হাতে তাঁর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন। সেই আমাদের আলাপ। তখনও তিনি শক্তিমতী হননি।

এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, যে কবিতার পরেই শক্তির জীবনে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান মীনাক্ষী।

১৭ অক্টোবর ২০১০

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ!

অনেকদিন আগে এক জায়গায় লিখেছিলুম জগতে আনন্দযজ্ঞে কি সবার আমন্ত্রণ থাকে? সেখানে গেস্ট কন্ট্রোল, শর্ট লিস্টেড হতে হয়। যজ্ঞ মানেই আগুন আর আহুতি। আনন্দযজ্ঞ সোজা ব্যাপার তো নয়, অশ্বমেধে কুলোবে না, সব গেরো ছিঁড়ে ফেলে সর্বস্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়া চাই। এই গেরো খোলার কম্মটি আমাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় সম্ভবে না। জীবন মাঝে মাঝে ঘুরপথে এসে গাঁঠ খুলতে সাহায্য করে। কখনো-বা আদর্শ এসে মুক্ত করে দেয়। আর সেটাই হয় নেমন্তন্নের চিঠি।

আমাদের শ্যামলী ছিল জগতের আনন্দযজ্ঞে শর্ট লিস্টেড গেস্ট।

ভালোবাসা দিতেও সে যেমন দড়, ভালোবাসা পেতেও তেমনি। এত ভালোবাসা ছিল ওর মধ্যে, এত টান, এত মায়া। মায়া সারা জীবজগতের প্রতি। সৃষ্টির প্রতিটি কণা ছিল তার কাছে মূল্যবান। ধরিত্রীকে সুস্থ রাখা, তাকে অকলঙ্ক রাখা, তাকে দীর্ঘায়ু রাখা সে তার নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিল। সেই একই মানসিকতার মানুষদের সঙ্গে তার বন্ধুতা হত, কাজের সঙ্গী হয়ে পড়ত সে তাদের, বয়েস যার যা-ই হোক না কেন। তিনি স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তও হতে পারেন, আবার গ্রামের কোনো নাম-না-জানা সাঁওতালনিও হতে পারেন। শ্যামলী আদর করতে ভালোবাসত, নিজে সে যতই অসুস্থ থাকুক, সেই অবস্থাতেও কেউ তার বাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে শুধু মুখে বেরোতে পারত না। সে সত্যিকারের মুক্তপ্রাণী ছিল, কিন্তু বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তার জন্যে ছিল না। বাগানের গাছপালাগুলিও তার আদর পেত। আর বিশ্বসুদ্ধু মানুষের কল্যাণের জন্য এই বিশ্বের বসবাসকারী হিসেবে সে নিজেকে যেন ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ মনে করত। তার বাবা শিল্পী সুধীর খাস্তগীর ছিলেন ঘোরতর শান্তিবাদী, যুদ্ধবিরোধী। তাঁর মনোভাব থেকেই হয়তো শ্যামলী শিখেছিল মানুষ খুনের অস্ত্রজোগান দেওয়া ব্যাবসার বিরোধী হতে। মাতৃহীন শ্যামলী তার বাবার কাছে শুধু ছবি আঁকতেই শেখেনি, শিখেছিল তাঁর মানবিক মূল্যবোধগুলিও। তার জীবনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কটিও সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল, শুধুমাত্র স্বামীর কর্মস্থল, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানায় উচ্চপদে কাজ করার নৈতিকতা নিয়ে আদর্শগত বিরোধের জন্য। এমন ঘটনা আমাদের প্রজন্মে আমি আর দেখিনি। শ্যামলী ছিল সত্যি অর্থে শান্তির সাধক। ('শান্তির সৈনিক' কথাটা কী বিচ্ছিরি, না?) সেই সাধনার জন্যে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল সে, কেননা জগতের শান্তি, আর মানুষের কল্যাণ ছিল তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে প্রার্থনার বস্তু। জীবনভোর ওই অসম্ভব মন্দ স্বাস্থ্য নিয়ে যেভাবে ম্যাজিক করে মেয়েটা কেবলমাত্র আদর্শের তাগিদে যথেচ্ছাচার করে গেছে, আমি দূর থেকে দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি এবং ঈর্ষাও করেছি। আমিও মনে মনে চেয়েছি যখন-তখন ওর সঙ্গে ছুটে যেতে। কিন্তু পারিনি। আমার হাতে পায়ে চাকরির বেড়ি ছিল।

শ্যামলী ফিরে এসে সব গল্প শোনাত। ওরও ঠিক আমারই মতো সুস্বাস্থ্য, এদিকে হাঁপানি, ওদিকে পায়ের ব্যথা। তাই নিয়ে বাসে, ট্রেনে, পায়ে হেঁটে ঘুরছে সারা ভারতের চেনা অচেনা গ্রামে গঞ্জে, সমাজের দৈন্য, মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে। আর তা অপসারণের জন্যে একতিলও যদি কাজ করতে পারা যায়? কোথায় কোথায় না গিয়েছে সে-মেয়ে? এলোপাথাড়ি মনে পড়ে, সে গিয়েছিল পোখরানে। গিয়েছিল জাদুগোড়ায়, ছবি তুলে এনেছিল সেখানকার গ্রামের মানুষের, কীভাবে পারমাণবিক দূষণে তাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন, জল বিষাক্ত, শিশুরা পর্যন্ত বিকৃত হয়ে জন্মাচ্ছে। তার পরেই আবার এল হরিপুরের সম্ভাবনার যন্ত্রণা। হরিপুর নিয়েও লড়াই করেছে সে। এখনও তো আমাদের সামনে দুঃস্বপ্ন রয়েছে হরিপুর পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরির। আমেরিকাতে থাকার সময়ে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের বিপক্ষে শ্যামলী বার বার প্রতিবাদ করেছে, বার বার গ্রেপ্তার হয়েছে, একবার সেই 'ট্রাইডেন্ট' তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, সিয়াটলে গ্রেপ্তার হয়েছিল, আর একবার হল ওয়াশিংটন ডিসিতে, হোয়াইট হাউসের সামনে।

দেশ-বিদেশ বলে তো তার মনেপ্রাণে কিছু ছিল না, তার কারবার সারা বিশ্ব নিয়ে। তাই তার আবহাওয়া, তার প্রাণী, তার উদ্ভিদ, সবই জরুরি শ্যামলীর কাছে। তাই সে পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে 'মীন মঙ্গলে' যায় উৎসব করে নদীতে মাছের পোনা ছাড়তে, গ্রামে পুকুর কেটে সেই মাটি জড়ো করে 'পাহাড়' বানাতে যায় সগৌরবে। দেশের যেখানে যেকোনো সেবার কাজ চলে, শ্যামলীর হাত নিঃশব্দে সেইখানে পৌঁছে যায়। সে 'নর্মদা বাঁচাও'-তে মেধা পাটকরের কাছেই হোক, আর কুষ্ঠসেবায় বাবা আমটের 'আনন্দবন'-এই হোক। শ্যামলী সবখানেই ছুটে গিয়েছে। ভাগলপুরের বীভৎস দাঙ্গায় আহতদের দেখতে, তাদের মনোবল জোগাতে ছুটে গিয়েছিল গৌরদার (গৌরকিশোর ঘোষ) সঙ্গে, আবার কুড়ি কুড়ি বছরের পারে, এই সেদিন, ২০০৯-তে আরেকবার ফিরে গেল ভাগলপুরের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন, সেটা সরেজমিনে দেখে আসতে। চিরশত্রু শরীরকে কিছুতেই পাত্তা দেয়নি মেয়েটা। ভাগ্যিস দেয়নি? তাই তো এত কাজ পেরেছে, এত আনন্দ পেয়েছে, এত আনন্দ দিয়েছে। আমার সঙ্গে শ্যামলীর একটাই মিল, আমারও শরীর চিরশত্রু। কিন্তু শ্যামলী চিরজন্ম বেঁচেছে শুধু অপরের জন্যে। জগতের জন্যে। তার দেহ প্রাণ সঁপে দিয়েছিল মানুষের সেবায়। আমি তো সে-গর্ব করতে পারব না, আমি স্বার্থপর সাধারণ মানুষ। বলতে পারব না আমি অন্যের জন্যে বাঁচি। আমার কাজের ক্ষেত্র আলাদা। তাই শ্যামলীর শান্তির আদর্শে গভীর বিশ্বাসী হলেও অধিকাংশ মানুষের মতো সে-বিষয়ে আমি থেকেছি মূলত নিষ্কর্মা। তার মতো হতে চেষ্টা করিনি। জরুরি বলে সে যা বিশ্বাস করে এবং সত্য বলে সে যা বিশ্বাস করে, তার জন্যে সে-সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। আমি কি তেমনটি পেরেছি?

শ্যামলীর সাজগোজে মন ছিল না। যেমন তেমন শাড়ি, আর আধো খুলে পড়া এলো খোঁপা, কপালের ওপরে ঘেঁটে যাওয়া কুমকুমের টিপ, ধুলোমাখা চটি পায়ে, পাগলির মতো এলোথেলো চেহারা করে, মিষ্টি হাসিভরা মুখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরে বেড়াত সেই করিতকর্মা মেয়ে। তার সবখানি অস্তিত্বই ছিল তার ভিতরটুকু নিয়ে।

শ্যামলী সব জায়গায় দুর্বলের কাজে লাগার সুযোগ খুঁজে নিত, সে অনাথ শিশুদের পড়ানোই হোক, আর লিটল ম্যাগাজিনদের সাহায্য করাই হোক। মেলার সময়ে দেখেছি বীরভূমের নানা লিটল ম্যাগাজিন তার কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ। শ্যামলীর স্বভাব ছিল মানুষকে উপহার দেওয়া।

আমার মেয়েদের যখনই দেখা হত শ্যামলী মাসির সঙ্গে, সে তাদের হাতে কিছু-না-কিছু আদরের উপহার তুলে দিত। সবসময়েই তার অশেষ ঝোলার মধ্যে একটা কিছু স্নেহের চিহ্ন প্রস্তুত থাকত, সবার জন্যে। কখনো মালা, কখনো পুতুল, কখনো চুড়ি। আমার জন্যেও বরাদ্দ ছিল কখনো ভবানীপুরের গুজরাতি নোনতা, কখনো রামদেবের দোকানের কবিরাজি হজমী, কখনো বনলক্ষ্মীর দারুণ পেয়ারার টফি। ওদের তৈরি পেয়ারার জেলি ছেঁকে ফেলার পরে ছাঁকনিতে ভরা উদ্‌বৃত্তটুকু ফেলে না দিয়ে এই টফি বানানোর সুবুদ্ধি শুনেছি বনলক্ষ্মীকে শ্যামলীরই দেওয়া। যেমন সোনাঝুরিবনে আজকের এই জমজমাট 'শনিবারের হাট' সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সুবিধের কথা ভেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই আপনভোলা শ্যামলীর দ্বারাই, গভীর ভালোবাসায় ও দূরদৃষ্টিতে। আগে ছিল শুধুই গ্রামের তৈরি পণ্য, শুধু সাঁওতালদের হাতে তৈরি শহরে দুর্লভ জিনিসের হাট। এখন জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র পালটে যাচ্ছে। (আমরা কি প্রাণে ধরে ব্যাবসার স্বর্ণসুযোগ গ্রামীণ গরিব মানুষদের হাতে একচ্ছত্র ছেড়ে দিতে পারি?) পান্নালালবাবুর শেষ জীবনে তিনি শ্যামলীর কাছেই থাকতেন, আর তাঁর সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে শ্যামলীর চোখে গ্রাম ধরা দিয়েছিল তার অন্তরাত্মা নিয়ে। পেশায় সে ছিল শিল্পী, তার বাবার মতো। বাবার ধরনেই ছিল তার তুলির টানও। সহজ, বর্ণোজ্জ্বল, আর তীব্র প্রাণের উচ্ছলতায় ছন্দময়। খুব সহজে অনায়াসে সে এঁকে ফেলতে পারত বিশাল চিত্রপট, বিরাট আলপনা, কিন্তু বোধ হয় শ্যামলীর গভীরতর বাঁধন ছিল মানুষ নিয়ে ভাবনার সঙ্গে।

শ্যামলী আর তান লি-র ছেলে আনন্দকে দেখতে বাবার মতো সুপুরুষ, আর অন্তরে সে হয়েছে মায়ের মতো সেবাধর্মী। বিশ্বের শান্তি, আর পরোপকারের কাজকেই নিজের জীবনের পেশা করে বেছে নিয়েছে আনন্দ। সারা পৃথিবীতেই তার ঘর।

শান্তিনিকেতনে গেলেই আমাকে একবার 'পলাশ' বাড়িতে যেতেই হবে। আর আমি এসেছি জানলে, সে 'রতনকুঠি'তেই হোক বা 'প্রতীচী'তে, শ্যামলী ঠিক এসে হাজির হত। অনেকগুলো মাসই সে নেই, কিন্তু ইতিমধ্যে আমিও যাইনি তার দেশে। আমি শান্তিনিকেতনে যাব, কিন্তু শ্যামলী আসবে না, আমিও যাব না 'পলাশ'-এ এটা এখনও ভাবতে পারছি না। আমার শাশুড়িমায়ের শেষের বছরগুলিতে শ্যামলী খুবই আসাযাওয়া করেছে তাঁর কাছে। আমার ননদ মঞ্জুর সঙ্গেও খুব ভাব ছিল তার। সব্বাইকে চান্স পেলেই রেঁধে খাওয়াতে ভালোবাসত শ্যামলী। কত যে খেয়েছি ওর কাছে! শিল্পীর সৃজনশীলতা ছিল তার রান্নাতেও। অনায়াসে গল্প করতে করতে নিজের খুশিমতো আবিষ্কৃত উপায়ে নতুন নতুন রান্না করে ফেলত। শ্যামলীর হাতের স্বরচিত রান্নার স্বাদ কেউ ভুলতে পারে না। মিষ্টিও তৈরি করতে পারত হরেক রকমের। ঘরে সবসময়ে কিছু-না-কিছু থাকত তার, চায়ের সঙ্গে টা। মারা যাবার দিন দশ বারো আগে মঞ্জু শেষ গিয়েছিল শ্যামলীর কাছে ভাত খেতে আর সারাদুপুর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। খুব ভালো লেগেছিল তার। আবার শিগ্‌গিরই শান্তিনিকেতনে যেতে হবে, শ্যামলীর বাড়ির মতো ওইরকম আড্ডা দিতে, সেকথা আমাকে খুব আনন্দ করে একটি চিঠিতে লিখেছিল মঞ্জু। আরও একটু উপরি, দুটো মনের কথা। ভাগ্যিস ওর সেদিন ফোনটা খারাপ ছিল! নইলে তো ওই শেষ চিঠিটা কোনোদিন লেখাই হত না। শ্যামলীর কল্যাণেই চিঠিটা উৎসারিত হয়েছিল ওর প্রাণ থেকে। মঞ্জুরও শান্তিনিকেতনে যাওয়া সেই শেষবার।

আমার তো শান্তিনিকেতনের গেরোগুলো আস্তে আস্তে সব খুলে যাচ্ছে।

'প্রতীচী'-র বারান্দায় আরামকেদারায় বসে থাকা সাদা শাড়ি পরা বয়স্কা মানুষটির চেনা ছবিটা রবার দিয়ে মুছে দিয়ে, শাশুড়িমা চলে গেছেন।

যজ্ঞেশ্বরের প্রাণপ্রিয় রান্নাঘরে এখন সেই মেঝেনরাই রান্না করছে, বেঁচে থাকতে চেঁচামেচি করে যাদের কিচ্ছুটি ধরতে ছুঁতে দিত না যজ্ঞেশ্বর।

ওর বাড়িতে যাইনি বলে মঞ্জু রাগারাগি করবে না আর, 'হেমশ্রী'-তে যাবার দরকারই হবে না।

'পলাশ' ফাঁকা করে চলে গেছে শ্যামলী, কে জানে ওর শখের দুর্লভ গাছপালার এখন কী হাল হবে? এবারে আমি শান্তিনিকেতনে গেলে, বাইরে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে, আলুথালু শাড়ি শাল, ব্যস্ত মুখ-চোখ নিয়ে, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাবার পথে, 'এখন শুধু এক মিনিট তোমাকে দেখে যেতে এলাম' বলে আমার কাছে এসে দাঁড়াবে না কেউ আর।

২ ডিসেম্বর ২০১১

আমার মল্লিকা বনে

গতকাল অনেক রাত অবধি ৫ জুনের জন্যে পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু লিখছিলুম। আমরা এখানে খাবার খাই, জিনিসপত্তর বানাই তার প্লাস্টিকের পাতাগুলো ভেসে গিয়ে জমা হচ্ছে উত্তর মেরুর সমুদ্রে, আমরা সভ্যতার জঞ্জালে ভরে দিচ্ছি সুদূর উত্তর মেরু, প্রকৃতি মায়ের শুভ্র শীতল নির্মলতাকে। জীর্ণ করে তুলছি সেখানকার প্রাণ, এই গ্রহের পক্ষে প্রচণ্ড মন খারাপের কথা। শুভঙ্করের তোলা ছবি সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ। আরও অনেক কিছু আছে বলবার। আমাদের দেশেই আছে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিপর্যয়ে বিপন্ন বহু প্রাণ, উদ্ভিদের, জানোয়ারের, মানুষের। কে করবে তার শুশ্রূষা? কে সারিয়ে তুলবে এই রোগগ্রস্ত গ্রহকে? আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, ল্যাপটপ খোলা, আমি শাড়ি-টাড়ি বদল না করেই ঘুমিয়ে পড়েছি। লেখাটা শেষ হয়নি। বাকি আছে। আবার লিখতে বসেছি, বিজয়ার ফোন এল, মল্লিকা নেই। ভোর রাতে চলে গিয়েছে। কবি কৃষ্ণা বসু আর বাদল বসু আসছেন, তাদের সঙ্গে বিজয়া মুখোপাধ্যায় যাবেন সিরিটিতে, মল্লিকার বাড়িতে। আমি বাড়ি চিনি না, ঈশ্বর জানেন বেশ কিছুদিন হল, ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। দিনের পর দিন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব যাব করেও ব্যবস্থা করে যাওয়া হয়নি। শেষ গিয়েছি সেই এ.এম.আর.আই.হাসপাতালে। দেখা হতে খুশি হয়েছে মেয়েটা। 'এত ভুগছ তবু কী সুন্দর দেখাচ্ছে।' শুনে খুশি হয়ে বলেছে, 'দিদি, কতদিন নিজে চুল বাঁধিনি, মুখ দেখিনি নিজের। এখানে একটা আয়না নেই।' দুর্বা বোধ হয় ওকে একটা চিরুনি দিল, আর আমার হাতব্যাগে একটা পাথর বসানো হাত-আয়না ছিল, আমি বের করে ওকে দিই। 'এই তো, মুখ দেখে চুল আঁচড়াও। দেখো সুন্দর আছে কি না।' চুল আঁচড়ে আয়নাটি ফিরিয়ে দিচ্ছে, 'কী সুন্দর আয়না।' আমি বলি, 'ওটা তোমার কাছেই থাক, তুমি চুল আঁচড়াবে।' ব্যবহৃত, সামান্য বস্তু, ওর নাম করে নিয়েও যাইনি, কিন্তু খুব আনন্দ করে আয়নাটা নিয়েছিল মল্লিকা। তার মধ্যে কি দেখতে পেত সেই মল্লিকাকে আমরা যাকে দেখতে পেয়েছি? এত অসুস্থতাতেও যার আত্মবিশ্বাসের এতটুকু অভাব হয়নি, সবসময়ে রঙিন পোশাকে সেজেগুজে থাকত, যৌবনের তেজ ছিল তার চুল থেকে পা পর্যন্ত। হাসিমুখে থাকত, যথাসাধ্য সামাজিকতা বজায় রাখতে চাইত। কোনো নাটকীয়তা, কোনো বাড়াবাড়ি করেনি কোনোদিন এত বড়ো অসুখটা নিয়ে। কত সহজেই মেনে নিয়েছিল তার ভবিতব্যকে, আবার মানেওনি। আমরণ বিদ্রোহিনী, সব জেনেও শেষ দিন পর্যন্ত সে ছিল জীবনের দিকে। একদিনের জন্যেও মৃত্যুর দিকের পাল্লা ভারী করেনি, জীবনের হাত ছাড়েনি, ভয় পেয়ে মরার আগে মরে থাকেনি, সে-মেয়ে সিন্ধুর মেয়ে।

অবাক হবার মতো সংবাদ নয়, মনে মনে প্রস্তুতি ছিল প্রত্যেকেরই। তবুও বুক ভেঙে যাবার মতো সংবাদ। এখানেই মজা। জানা ছিল, তবু এতটা কষ্ট হবে সেটা তো জানা ছিল না। এতটা অনুভব করব তার চলে যাওয়া এটা তো টের পাইনি! মল্লিকার অসুস্থতার সংবাদ জেনেছি ২০০৫

থেকে। কতটুকুনি মেয়ে, এমন মারণ রোগ তার কেন হল? কত কাজ করে মল্লিকা, কত সাহস জোগায় মেয়েদের মনে, কত মেয়ে তার লেখা পড়ে ভরসা পেয়েছে। নারীবাদী বাংলা কবিতার যে ধারাটি আমার অন্যতম প্রিয় কবি কবিতা সিংহের শুরু করা, সেইখানে এসে হাল ধরেছিল তো মল্লিকাই।

আমার মনে পড়ছিল একের পরে এক দৃশ্য, আগে পরে টুকরো টুকরো। আমরা নৈনানে এক কর্মশালায় একসঙ্গে তিন দিন নিছক আড্ডা মেরে কাটিয়েছিলুম, ফেরার সময়ে মন কেমন, ঠিক হল ফিরে একটা দল গড়ব, কলকাতায় ফিরেও এমনি আড্ডা দেব, দলের নাম কী হবে? অনেক ভেবে মাথায় এল, 'সই'। সবচেয়ে খুশি হয়েছিল মল্লিকা। তার খুব পছন্দ হয়েছিল 'সই' শব্দের ওই তিনটি ব্যঞ্জনা, সখী, স্বাক্ষর আর সহ্য করি। অথচ সে সই-তে নিমন্ত্রণে এলেও, সদস্য হয়ে আসেনি। তার সখী কৃষ্ণা এল, মল্লিকা এল না।

কেন আসেনি, কারণ জানায়নি কোনোদিন। সব কিছুই এলোমেলো মনে পড়ছে। বাইরে এখন বৃষ্টি। আমি গিয়েছিলুম বাংলা আকাদেমিতে, ভিতরে রাখা হয়েছিল মল্লিকার ফুলে ফুলে ছাওয়া শরীর। অজস্র অল্পবয়সি কবিদের মধ্যে মন্ত্রী এসে মাল্যদান করলেন। নবীন মন্ত্রী মল্লিকাদেরই সমসাময়িক সাহিত্য নাটকপ্রেমী যুবক, ব্রাত্য বসু।

মনে পড়ছে মল্লিকার সঙ্গে আমাদের হইহই করে ওয়ার্কশপ করা। সর্বদাই উজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাসী। একসঙ্গে ভোপালে, দিল্লিতে, হায়দ্রাবাদে অনেক জায়গায় ঘুরেছি আমরা, কবিতা পড়েছি, আলোচনাসভাতে অংশ নিয়েছি। আমার ছোটোবোনের মতো স্নেহ আছে মানুষ মল্লিকার প্রতি, আছে গভীর সম্মান তার কর্মের প্রতি, আর মুগ্ধতা তার কবিতার প্রতি।

এবং যেভাবে সে নশ্বরতার মতো কঠোর শত্রুকে বশ মানিয়েছিল তার জন্যে মল্লিকার প্রতি আমার অশেষ, অবাক শ্রদ্ধা।

ওর লেখা নিয়ে লিখতে চাই, বইপত্র নেই, পরে লিখব। বইয়ের নামকরণ যা যা মনে পড়ছে সেও তো অনেক কথা বলে। 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' থেকে 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালোবাসা', 'কথামানবী' থেকে 'অর্ধেক পৃথিবী', 'হাঘরে দেবদাসী' থেকে 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে'। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'-এর মতো জরুরি মানবীবিদ্যা বিষয়ক প্রাথমিক বই বাংলায় আর নেই।

রবীন্দ্রনাথের থেকে এক-শো বছরের ছোটো মেয়েটা যখন জন্মাচ্ছে, আমার তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কতটুকু মেয়ে সে? আমি ছুটতে ছুটতে পৌঁছে দেখি বাংলা আকাদেমির উঠোনে ঠান্ডা গাড়ির মধ্যে শুয়ে, আমি পায়ে লাল পদ্মফুল দিয়ে সরে এলুম। অনেক প্রিয়জন জড়ো হল, সুবোধের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে একই সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে। আর একজনের যুদ্ধটা সবচেয়ে কঠিন, তাকে আমি খুঁজিনি। তাকে পাছে দেখে ফেলি, পাছে চিনে ফেলি, আমার ভয় করছিল। আমি জানি সে খুব লম্বা হয়েছে আর খুব সুদর্শন। আমি তার ছেলেবেলার চেহারাটি জানি। শেষ দেখেছি শান্তিনিকেতনে, আমার সঙ্গে তখন বেশ ভাব হয়েছিল, কয়েক বছর আগে। আজ আমি তাকে এড়াতেই চাইছিলুম। আজকে কেন জানি না, আমার সাহস হচ্ছিল না তার মুখের দিকে চাইবার। সে রোরো, মল্লিকার ছেলে। তার সাহস সবচেয়ে বেশি। ঈশ্বর তাকে বুঝদারি দিন, সাহস দিন, শক্তি দিন, পৃথিবী তার চোখে সুন্দর থাকুক, মধুর থাকুক, কোনোদিন যেন তেতো হয়ে না যায়। মায়ের লড়াই তাকে সবল করুক। পিতাপুত্র পরস্পরের সহায় হোক।

কিছুদিন আগে মল্লিকার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন হল। আমার অসুস্থতার জন্যে যেতে পারিনি, যদিও অন্যতম আমন্ত্রক ছিলুম। ওকে আদর করে একটা চিঠি লিখেছিলুম। তার উত্তরে মল্লিকা আমাকে একটা এস.এম.এস. করেছিল, সেটাই ওর সঙ্গে আমার শেষ সংযোগ। এখানে তুলে দিই? আমি চিঠিটা বহুবার পড়েছি।

আপনার ভালোবাসার চিঠি পেয়ে আমি কাঁদছি, নবনীতাদি। প্রণাম নেবেন। মল্লিকা।

তারিখ ছিল ২৮ মার্চ, ২০১১, সময় : ৭:২৬:৫৮।

আজ ২৮ মে ২০১১, ভোর ৩.৫০-এ সে চলে গিয়েছে। এবারে কান্নার পালাবদল, মল্লিকা।

২৮ মে ২০১১

অশ্রু ঝলোমলো

ভেবেছিলুম বুঝি মৃত্যু আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ছিল, নেই/মাত্র এই। রোজ-রোজই তো খবর আসে আজকাল, এ নেই, সে নেই। আগে আগে মারা যেতেন বড়োরা। হ্যাঁ, সে বেশ দুঃখজনক হলেও, বোধগম্য। এক সময়ে সয়েও নেওয়া যেত গুরুজনদের বিদায়। তারপরে শুরু হল বিনা নোটিশে বন্ধুদের নিষ্ক্রমণ। প্রথম প্রথম কিছুতেই সহ্য হতে চাইত না। ঘুরে ঘুরে ভিতরে ছোবল মারত শোক।

রোজ রোজ বন্ধুদের মৃত্যুসংবাদ পাচ্ছি আজকাল। ৭৫ বছর ধরে বেঁচেবর্তে থাকলে বন্ধুবান্ধবের বিদায়ের খবর শুনতেই হবে। চামড়ার সয়ে গিয়েছে আমার। ধাক্কা লাগে, যন্ত্রণা পাই, কিন্তু বিস্মিত হই না। পরক্ষণেই ভাবি এই তো, আর ক-দিন, পরেরবার হয়তো আমার দান আসবে। ভেবে শান্তি পাই।

আজ সকালের একটা ফোন এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, হয়নি, হয়নি, সব বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ এখনও সহ্য হয়নি তোমার, নবনীতা। এখনও মৃত্যু বড়ো ভয়ংকর, বড়ো অসহনীয়। নিষ্ঠুর। নিজেকে যে খুব পরিণত-বুদ্ধি ভাবতে শুরু করেছিল, সে-ধারণাটা চুলোয় গেল। বাঁচার খুব অসুবিধে করে দিয়ে, ছোটোরা যদি পরে এসে আগে চলে যায়, আকাশ-বাতাস নিথর হয়ে যায়। মনে পড়ে গিয়েছে পাপ্পার মুখ। শুভ। খুকু। দীপংকর। বিক্রম। হুহু করে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ধমনী-ছেঁড়া শোক। লজ্জা করে স্বীকার করতে, আজকাল আমরা শোক লুকিয়ে রাখতে শিখেছি পশ্চিমি কায়দায়। কিন্তু সবসময়ে সেটা অন্তত নিজের কাছে করা যায় না।

ঋতুপর্ণ আমার সন্তানের বয়সি। আমার বড়ো মেয়ে অন্তরা আর সে এক ইশকুলে আর এক কলেজে পড়ত, ঋতু খানিকটা সিনিয়র। একবার 'ফার্স্ট পার্সন'-এ পিকো-র কথা লিখেছিল ঋতু— 'আমার বন্ধু পিকো দারুণ একটা পত্রিকা বের করে দিল্লি থেকে'— ইত্যাদি। তবে কি পিকোর বন্ধুরাও এবারে চলে যেতে শুরু করল? ঋতুর মৃত্যু কেন অপরাধী বোধ করাবে না আমাকে? কতজনের মুখেই যে শুনলুম, 'ফিলিং সো গিলটি!' কেন? বেঁচে আছি এই অপরাধে। তারই থাকার কথা, আমার না থাকলেও চলত, অথচ সে নেই, আমি রয়েছি। নেহাত অসময়ে সে তার অতি-দীর্ঘযাত্রা শুরু করে ফেলেছে। আমরা তার নাগাল পাব না আর।

মায়ের বিষয়ে ঋতু লিখেছিল— 'তত দিনে পৃথিবীর দীর্ঘতম, অনন্ত উড়ালপুলে মা-র যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে।' সেই উড়ালপুলের পথ এখন তারও চেনা হয়ে গেল। আমার সঙ্গে ঋতুর একটি গহন মিল আছে, আমরা দুজনেই মা-অন্তপ্রাণ। শুধু কি উড়ালপুল, যখন যা-ই লেখে, হোক তা পুজোর বাজার কিংবা নাহুমের কেক, কাশীর হিপি, কি রবিশংকর, সানফ্রান্সিসকো কিংবা মাদুর, বোলপুর কিংবা জোড়াসাঁকো, প্রত্যেকবারই মা এসে ছুঁয়ে যান ঋতুর কলম। আর

একবিন্দু অশ্রু। অল্প বয়সে বিপুল অভিজ্ঞতা, এত স্বকীয়তা, এত পড়াশোনা, আর এত দুঃসাহস— ঈশ্বর ছপ্পড় ফাঁড়কে দিয়েছিলেন ঋতুকে। তাঁর না-দেওয়াটাও কিন্তু ভয়ংকর।

আর কি কারো ভালো লাগবে, 'রোববার' খুলতে? আর কি জমবে, সপ্তাহের শেষে শেষে রোববারের আড্ডার ভরভরাট নেশাটা?

'ভালো-বাসার বারান্দা'-র প্রথম অতিথি, আর প্রধান অতিথিও, ঋতুপর্ণই ছিল। ওরই জবরদস্তিতে আমার সাপ্তাহিক কলম লেখার দুঃসাহস।

ওতে-আমাতে কত তর্কাতর্কি, কত ভাবনাচিন্তা, তার পরে কথায় কথায় : এটা, ওটা, সেটা করতে করতে বেরিয়ে এল এই নাম, ওরই বাছাই, এই নামে দুজনেই খুশি। 'ভালো-বাসার বারান্দা'। দিনে-দিনে হয়ে উঠল ভালোবাসাবাসির বারান্দা।

সন্তানের বয়সি হলে কী হবে, খুব ওস্তাদ ছেলে, আমাকে এই রোববারে সক্কালবেলাতে উঠে আড্ডা দিতে বাধ্য করিয়েছিল সে। আমি যত বলি, 'ওরে ঋতু, আমি পারব না ভাই, আমি বড়ো উড়নচণ্ডে প্রকৃতির মানুষ, ঘড়ি ধরে কোনো কিছুই করে উঠতে পারি না। সবসময়ে— সব ব্যাপারে— লেট! এই ভয়ে বাদলবাবুর বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশেও এবং স্বয়ং সাগরমামার সস্নেহ অনুরোধেও, আশির দশকে আমি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে সাহস পাইনি 'দেশ' পত্রিকায়। 'ফেমাস' হওয়ার অমূল্য সুযোগ হেলায় নষ্ট করে ফেলেছি। আমি চিরকালের লেটলতিফ, ভাই, আমার নিশ্চয়ই প্রত্যেক সপ্তাহে দেরি হয়ে যাবে, ঠিকমতন খেপে খেপে লেখা জমা পড়বে না, সময়মতন কাগজ বের করতে মুশকিল হয়ে যাবে আমি একেবারে রিলায়েবল নই—'

কিন্তু আমার সবরকমের বিভীষিকা প্রদর্শন বিফলে গেল। ঋতু কিছুই কানে নিল না, বলল— 'টেক ইট ইজি, যেবারে একেবারেই পারবে না সেবারে তোমার লেখা না হয় যাবে না। নো টেনশন! যখন যতটুকু পারো, যেবারে যত শব্দ ইচ্ছে করবে, ততই লিখবে, হাজার, দেড় হাজার, সাতশো, পাঁচশো, ছবি-টবি দিয়ে আমি ঠিক সাজিয়ে নেব, জায়গা নিয়ে ভেবো না, বিষয়ের উচিত-অনুচিত নিয়েও ভেবো না। এটা তোমার যা-খুশি-তাই লেখার স্পেস— আমাদের সঙ্গে মন-প্রাণ খুলে আড্ডা মারবে। লিখতেই হবে তোমাকে—।'

অনিন্দ্য, ঋতু আর আমাতে কয়েকদিন ফোনের সভা বসল, নানারকমের নাম ভেবে ভেবে শেষে এই নাম ঠিক হল : 'ভালো-বাসার বারান্দা'।

নাম ঠিক হওয়ামাত্র মহোৎসাহে সম্পাদক মহাশয় আমার কাছে একজন ফোটোগ্রাফার পাঠিয়ে দিলেন, তিনি এসে হইচই করে ভালো-বাসার তিন চারটে বারান্দায় আমাকে দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে, হামাগুড়ি দিইয়ে, শ-খানেক ছবি তুলে নিয়ে গেলেন। ঋতু তার সঙ্গে একটি তরুণ-কে পাঠিয়েছিল, সে আমার শাড়ি, চুল ইত্যাদি ঠিক করে দেবে। এত মনোযোগ দিয়ে এত ছবি, বা এত ভালো ছবি এর আগে কখনো কেউ তোলেনি আমার। নেহাত বয়সটা বড্ডই সিনিয়র সিটিজেনের! নইলে সেইসব ছবি মডেলিং-এর কাজে লেগে যেত। ওইসব চিত্রবিচিত্র দিয়ে পাতা সাজিয়ে আদ্যন্ত ঝলমলে রঙিন ভালোবাসায় মুড়ে ফি-রোববারে ঋতু ছাপতে আরম্ভ করে দিলে আমার সাপ্তাহিক কলম।

যেদিন থেকে 'রোববার' বেরোতে শুরু করল, সেদিন থেকে ঋতু আর আমি দুজনে হাত ধরাধরি করে প্রতি রোববারে এসে চায়ের কাপ নিয়ে আড্ডায় বসেছি। সে আমরা যে যখন যত

দূরেই যাই না কেন, ঠিক 'রোববার'-এ হাজির হই। আমার কাছে 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাতাটা ব্যক্তিগত আড্ডার পাতা। এবারে আমি কী করি?

জানি না, দেহ ছাই হয়ে যাওয়ার পরে মানুষের কী বাকি থাকে? ঋতু কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না জীবনে বাবা-মা-র অনুপস্থিতি। অথচ এই অভাব তো প্রকৃতির নিয়ম মেনেই ঘটবে। প্রকৃতির কিছু কিছু অপছন্দের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঋতু তার মানবিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। প্রকৃতির দেওয়া বহিরঙ্গের শরীরী পরিচয়ের বিরুদ্ধে নিজের অন্তরঙ্গ শরীরের পরিচয়কে জিতিয়ে দিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু নির্মম আয়ুর বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্রই তো কাজ করে না। তোমার মা-বাবার বেলাতেও করেনি, ঋতু, তোমার বেলাতেও করল না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পৌঁছে গেলে স্বপ্নের রাজ্যে। মা-র কাছে। বাবার কাছে। তুমি লিখেছিল বটে, ছোটো ভাই চিঙ্কু তোমাকে শিখিয়েছিল বড়ো হয়ে যাওয়া, কিন্তু হে অক্ষবিশারদ, বুঝি তেমন বড়ো হয়ে উঠতে পারলে না তুমি, ভিতরে ভিতরে রয়ে গিয়েছিলে অসহায়, মাতৃক্রোড়ের আশ্রয়ভিক্ষু বালক রিঙ্কু।

জীবনে সফল হতে যা যা প্রয়োজন— মেধা ও হৃদয়, কল্পনাশক্তি ও কর্মক্ষমতা, শৃঙ্খলা আর আত্মবিশ্বাস এবং ভালোবেসে জোর করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার নেতৃত্ব গুণ— সব কিছুই ঋতুকে অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়েছিলেন প্রকৃতি, শুধু দেননি তার কাঙ্ক্ষিত শরীর। সেই কার্পণ্য, সেই বঞ্চনা, সেই অনিশ্চয়তা, যা থেকে সৃষ্টি হয় শিল্পের আকুলতা, তার ফলেই কিনা জানি না, ঋতুর মধ্যে বড্ড ছটফটানি ছিল ওর সৃষ্টিকর্তাদের জন্য। রোববারের পাতায় কতবার যে গল্পচ্ছলে লুকিয়ে কেঁদেছে মা-র জন্য, বাবার জন্য। এত দিনে সে অস্থিরতা শেষ হল। ঋতু স্থির হয়ে বসল একটা বড়ো জায়গায়। যেখানে ওই ছোটো পরিচয়ের আর মূল্য নেই।

অসময়ে ত্যাগ করে গিয়েছে সে আমাদের— অজস্র মূল্যবান কাজ অসম্পূর্ণ রেখে বিশ্বের সংস্কৃতি জগৎকে দরিদ্র করে গিয়েছে— নিজের অসুস্থ, দুর্বল শরীরটা নিয়ে প্রচণ্ড দুঃসাহসে কঠিন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছে (এই জনমে ঘটাবো মোর জন্মজন্মান্তর)— এমনকী পরমায়ু ক্ষয়ের ডাক্তারি সতর্কবাক্যও সে অগ্রাহ্য করেছিল যে স্বপ্নটি পূরণের প্রত্যাশায়, তারও পূর্ণ ফলাফল দেখা তার বাকি রয়ে গিয়েছে। আজ সকালে কে জানে কী ভেবে সবগুলো কাঁটা বুক থেকে তুলে ফেলে দিয়ে ঋতু তার মায়ের কোলে ফিরে গিয়েছে। ঘরে পৌঁছে শান্তি পেয়েছে, সেই নিরাপদ আশ্রয়ে, যে ঘর 'তাসের ঘর' নয়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে সে বলেছিল, এই গ্রহ সে ত্যাগ করতে চায় না নারী হয়ে। এই গ্রহ ঋতু ত্যাগ করেছে অন্তরাত্মায় নারী হয়েই।

সারা কলকাতা এসে আছড়ে পড়েছিল ইন্দ্রাণী পার্কে। এত ভালোবাসা সে নিজে কি কল্পনাও করেছিল? ন্যাকা-ছেলে, মেয়েলি-ছেলে বলে যার দিকে আঙুল তুলত কলকাতা, যার বাকভঙ্গি নকল করে মশকরা করা হত মঞ্চে, সে তো এই মানুষটাই? নিজেকে যে সগৌরবে নাম দিয়েছে 'প্রান্তিক মানুষ', আর নিজের সঙ্গে হাত ধরে আলোতে টেনে তুলেছে আরও অজস্র নিঃসঙ্গ, নির্দীপ মুখ। ঋতু নেই, কিন্তু তার গড়ে দেওয়া অহংকার রইল। 'এলজিবিটি' আন্দোলনকে 'চিত্রাঙ্গদা' অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাকে ভাষা দিয়েছে। এইবারে আর কেউ সাহস করে পতাকা তুলে নেবে।

শেষযাত্রার সময়ে আমার শুধু মনে হয়েছিল, ঋতু তো এত সাজগোজ করতে ভালোবাসত, শেষসজ্জায় মাথায় ওর পছন্দের পাগড়িটি বাঁধার পরে, সুন্দর মুখখানা যত্ন করে মেক-আপ করে

দিলে হত না? আর তো সাজতে পারবে না সে! বিদেশে শেষযাত্রার আগে মানুষের শরীরটাকে সাজানোর জন্য আলাদা পেশাদারি সেলুনই আছে।

'ফার্স্ট পার্সন'-এই পড়েছি ২০১২-র মার্চ মাস, হাসপাতাল থেকে 'প্যারোলে' বেরিয়ে এক ঘণ্টার জন্য ঋতু জোর করে কথা রাখতে যাবে কোনো সভাতে, হিমোগ্লোবিন ৫% তখন, এক ঘণ্টার ছুটি, সঙ্গে যাবে হাসপাতালের পেয়াদা। ঋতু আয়নার সামনে— "মুখ জুড়ে ক্লান্তির বিষাদ। ভ্রু আঁকা হল, চোখে পেনসিল পড়ল, ঠোঁটে লিপ লাইন।— আমি এখনও নিজে দুল পরতে পারি না, তাই শাবানা (নার্স) পরিয়ে দিল। দিয়ে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে— 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে গো? ঠিক যেন ফিল্‌ম স্টার'।" তারপরে ঋতু লিখেছে, 'মহাভারতে কোথায় যেন পড়েছিলাম, নটীদের জন্য এক বিশেষ নরক নির্ধারিত আছে।' নটীদের নরকে যেতে হবে না তোমাকে, ঋতু, তোমার জন্য মা সরস্বতী কোল পেতে আছেন। কিন্তু সরস্বতীর দিকে রওনা হওয়ার সময়ে ওকে একটু সাজগোজ করানো হবে না, যে এত ভালোবাসত সাজগোজ?

শেষযাত্রার প্রস্তুতিতে আমরা তো বার্ধক্যেও চন্দন পরাই। অগত্যা আমি নিজের ঘরে টিভির সামনে বসে বসেই মনে মনে আদর করে ওর তরুণ কপালে জয়টিকার মতো পরিয়ে দিলুম ছোটো একটি লাল কুমকুমের টিপ, সেই টিপ ঘিরে, ভ্রু ঘেঁষে অল্প করে কনে-চন্দনের আলপনা, ভ্রুতে পেনসিলের আলতো টান, বোজা চোখের পাতার কোণ থেকে কোণে কাজলের রেখা, কানে দুটি মুক্তোর দুল, টুসটুসে ঠোঁটে টুকটুকে লিপস্টিক। বাঃ কী সুন্দরী কনের মুখ! অল্প অল্প হাসছে। (ঠিক যেন ফিল্‌ম স্টার!)

গান স্যালুট তো হল, কিন্তু শ্মশানের খাতায় কি সরকারি প্রযত্নে পূর্ণ হয়েছিল মৃতের শেষ ইচ্ছেটুকু? যার জন্য শিল্পীর এই জীবনপণ সাধনা? পরীক্ষানিরীক্ষার অস্ত্রোপচার সমাপ্ত হোক-না-হোক, শেষযাত্রায় যিনি চলেছেন, তিনি স্ত্রী, না পুরুষ— এই বহিরঙ্গের পরিচয়টুকু দেওয়ার সময়ে শ্মশানের ডাক্তার কী লিখে দিয়েছিলেন? 'অ্যান্ড্রোজিনাস', 'হরগৌরী', আমরা মনে মনে হই, কাজেকর্মে হই। আমরা অনেকটা হয়তো তাই। সেইভাবে ঋতুও ছিল। তার পুরুষ দেহে, স্নেহে-প্রেমে-মমতায়-মান-অভিমানে নারীহৃদয় প্রকট ছিল। আমাদের অনেকেরই যেমন নারীদেহে খানিকটা পুরুষ-মন কাজ করে। কিন্তু শরীরে তো স্বেচ্ছায় 'হরগৌরী' হতে চাওয়া যায় না। ঋতুর এই গ্রহ ছেড়ে যাত্রার মুহূর্তে কি সরকারের খাতায় তোলা হয়েছিল, রণক্লান্ত শরীরটির মর্মস্পর্শী অন্তরঙ্গ পরিচয়? না কি আসল মানুষটি সব হিসেবের বাইরে চলে যাওয়ার পরেও, আদমশুমারের হিসেবের সুবিধা করে দিতে, সেই নকল পরিচয়ই শেষ খাতায় উঠল ঋতুর, যে পরিচয় সারাজীবন ধরে ভ্রান্ত বলে সে রিজেক্ট করেছে, অস্বীকার করে এসেছে?

আত্মপরিচয় বদল করার শুরু ঋতুর ইস্কুল ভরতি হওয়া থেকেই। ভরতি হতে গিয়ে বাবা-মা-র দেওয়া 'সৌরনীল' নাম প্রত্যাখ্যান করে বালকটি নিজের নাম নিজেই রেখেছিল 'ঋতুপর্ণ', মহাভারতের অক্ষবিশারদের নামে। নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে নেওয়ার আরম্ভ সেখানেই। সারাজীবনই দেখছি সমাজের সামনে খুব সহজ প্রস্তাব ঋতুর।— "এটা আমার জীবন। এটা আমার শরীর। আমি 'আমাকে' আমার যেমনটি খুশি তেমনি করেই উপস্থাপিত করব। পছন্দ না হয়, নিন্দা করো, বর্জন করো। তুমি স্বাধীন, আমিও।—" তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান বলে সে বুঝত, দিনের শেষে পৃথিবীর ঋতুকে প্রয়োজন হবে।

বার্থ সার্টিফিকেটে তুমি পুরুষ এবং সম্ভবত সৌরনীল, কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেটে কি তোমাকে 'নারী' লেখা হয়েছে, ঋতু? তুমি তো তাই চেয়েছিলে। আদালত অবধি পৌঁছোনোর আগেই তো সব শেষ!

কী এসে যেত সরকারি খাতার? কাহিনির যে নায়ক, সে তো চলেই গিয়েছে! কিন্তু খাতা-কলমের শেষ পরিচয়ে যদি তার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সমাদরটুকু উপহার দেওয়া যেত ইতিহাসের ঋতুকে?

ভেবে দেখুন, ভবিষ্যতে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' লিখেছে— 'দ্য গ্রেটেস্ট উওম্যান ফিল্ম মেকার অফ আওয়ার টাইম পাসেস আওয়ে ইন কলকাতা।' রোমাঞ্চ হল না?

থাক বিষণ্ণতার রূপকথা। এখন মনে মনে নীচের ছবিটি দেখে আজ আমি মনের আনন্দ পেতে চাই। চাই তাঁদের সঙ্গে নিয়েই দেখতে, 'ভালো-বাসার বারান্দায়' যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন, যাঁদের চোখে জল।

মধুগন্ধে ভরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি, বর্ষার ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ পিছনে ফেলে নিবিড় অমা তিমির হতে বাহির হল, বাহির হল জোয়ারস্রোতে— শুক্ল রাতে চাঁদের তরণী— তার দাঁড় ধরে বসে আছে এক চন্দ্রমুগ্ধা নারীমূর্তি— তার মাথার কালো কেশে লক্ষ তারার মালা জড়ানো, দুই নয়নে মায়াবী হাসির আহ্বান— ব্রজবুলিতে রচিত সুমধুর কৃষ্ণ প্রেমের ভজন তার কণ্ঠে— রসালো ফলের মতো পুষ্ট অধরোষ্ঠে অর্ধস্ফুট চুম্বন— তার মায়ের কোল বেশি দূরে নেই...।

একদিনের কলকাতা দর্শন

আচ্ছা, যদি আপনার কোনো বন্ধু মাত্র একদিনের জন্য কলকাতাতে আসেন, জীবনে প্রথমবার, আপনি তাকে একদিনের মধ্যে কী কী দেখাবেন? প্রথমে তো বেশ ভালো করে তাকে ঘরের রান্না বাঙালি খানা খাইয়ে বাঙালি কালচারের স্বাদ দেবেন, তারপর সাইট্ সিইং করানোর পালা এলে কী করবেন?

আমাদের বন্ধু, পাকিস্তানি সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক, জাহিদা হিনা হঠাৎ সেদিন একদিনের জন্য করাচি থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এসে পড়ে নিজেই যারপরনাই মুগ্ধ, কেননা কলকাতাতে আসবার কথা তিনি নাকি কোনোদিনও ভাবেননি। অথচ অনেকবারই দিল্লিতে আসেন, বম্বে ও লখনৌতেও গিয়েছেন, করাচি থেকে সেটা সম্ভব, মাঝে মাঝেই সেমিনার-টেমিনার থাকে। রাজধানী বলে কথা, তা ছাড়া পাড়াটাও পাকিস্তানের কাছাকাছি, নেই নেই করেও এখনও উর্দুভাষীদের মধ্যে বেরাদরি আছে যথেষ্ট। দিল্লিতে কবি সম্মেলনে আহমদ ফায়াজের মতো প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি কবিদের উর্দু শায়েরি উচ্চারণের সময়ে দেখেছি পুরো অডিটোরিয়াম শুধু যে সমস্বরে বাঃ বাঃ করে তাই নয়, মাঝে মাঝে পরের লাইনে কবির সঙ্গে আবৃত্তিতে যোগও দেয়। কলকাতাতে ঠিক এই ব্যাপারটা আশা করা যায় কি না জানি না। যদিও আমরা শামসুর রহমান জানি। কলকাতাতে আসতে হলে জাহিদার এখানে কোনো জরুরি কাজ থাকা চাই, অফিশিয়াল আমন্ত্রণ পত্তর দেখাতে হবে, তবে তো কলকাতার ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন? আয় চলে আয় কলকাতাতে, চুটিয়ে আড্ডা দিই গে ছাতে, বললেই কেউ পাকিস্তান থেকে চলে আসতে পারে না। ভিসা নিয়ে পাকিস্তান আর ভারতবর্ষের মধ্যে চমৎকার একটি সুস্থ বোঝাপড়া আছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশের সঙ্গে এমন ব্যবস্থার কথা শুনিনি। শুধু দেশে প্রবেশের ভিসা নয়, কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর, লখনউ, প্রত্যেকটি শহরে ঢুকতে আলাদা আলাদা ভিসা চাই। ভারতীয়রা পাকিস্তানে গেলেও তাই, করাচি, লাহোর, পিণ্ডি, হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো সব আলাদা ভিসা। পাকিস্তানিরা ভারতে এলেও তাই। মাননীয় সন্ত্রাসবাদের কল্যাণে এই সুবন্দোবস্ত। যারা অবশ্য বোমাবাজি করবার, সে বীরপুরুষদের ওসব তুচ্ছ ভিসা-টিসা লাগে না। সারা বিশ্ব জুড়েই নিরাপত্তার এই লোক দেখানো বাড়াবাড়ি কার্যত শুধু নিরীহ, ভীরু ভ্রমণকারীদের নাস্তানাবুদ করার জন্য। পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে তাই দিল্লিতেই সাক্ষাৎ হয়, এখানে বড়ো একটা উজিয়ে আসেন না কেউ।

সম্প্রতি ভারতীয় ভাষা পরিষদে চমৎকার এক সাহিত্য সম্মেলনে যেন আমারই উপকার করতে একগুচ্ছ পুরোনো লেখক বন্ধুবান্ধবকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণ থেকে কলকাতাতে এনে জড়ো করে ফেলেছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীইন্দ্রনাথ চৌধুরী। আমার আহ্লাদের সীমা ছিল না, বন্ধুদের সকলেরই তো বয়স হচ্ছে, মেলামেশা, দেখাশোনার সুযোগ আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে।

কর্ণাটক থেকে ইউ.আর. অনন্তমূর্তি, গুজরাট থেকে সিতাংশু যশশ্চন্দ্র, কেরালা থেকে এম.টি. বাসুদেবন নায়ার, দিল্লি থেকে গিরিরাজ কিশোর, প্রত্যেকেই যে যার ভাষার সাহিত্যে শিখরচুম্বী নাম। দেখা হল, আড্ডা হল, খুব ভালো লাগল।

শুধু ভারতবর্ষ নয় বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের কথাও ইন্দ্রনাথ ভোলেননি, এনেছিলেন দুজন নারী লেখককে, ঢাকা থেকে সেলিনা হোসেন আর করাচি থেকে জাহিদা হিনাকে। কিন্তু জাহিদার ভিসার গোলমালে বেচারার সেমিনারের পুরো সময়টা থাকা হল না, শুধু সমাপ্তির সভাতে উপস্থিত হতে ও ভাষণ দিতে পেরেছিলেন। তার পরের দিনটি ফ্রি, কলকাতা শহর ঘুরে দেখে, ভোরে উঠে চলে যাবেন দিল্লি। আমি ওঁকে কী দেখাব? একদিনের কিংবা আধদিনের কলিকাতা দর্শন নিশ্চয়ই টুরিস্ট বাসে সম্ভব, বড়ো হোটেলগুলো থেকে ছাড়ে, কিন্তু সেসব দ্রষ্টব্যে তাঁর উৎসাহ না থাকতে পারে। আমার বেজায় ভাবনা হয়ে গেল। দেখি, তিনি কী কী দেখতে চান।

—তুমি কী কী দেখতে চাও, জাহিদা?

—বই-এর দোকান।

—তাহলে তো কলেজ স্ট্রিট, কিন্তু তুমি তো বাংলা বই পড়তে পার না।

—আমি ভালো আধুনিক ইংরেজি বই-এর দোকানে যেতে চাই।

আমি তাকে কয়েকটি ভালো ইংরেজি বই-এর দোকানে, অর্থাৎ সীগালে, অক্সফোর্ডে আর ক্রসওয়র্ডসে নিয়ে গেলুম। এবং আমাদের পাড়াতে পূর্ণ দাস রোডের সুন্দর নতুন দোকানেও। কয়েকটা বই কিনলেন তিনি, তিনি চান আম্রপালির ওপর খবরওলা ইংরিজি বই, প্রাচীন যুগের বারাঙ্গনাবৃত্তি নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। কোনো দোকানেই সুবিধা হল না। কলেজ স্ট্রিটে ইন্ডিয়ানাতে যেতে বলি। অর্ডার দিলে অমিত এনে দেবে। কিন্তু কী বই চাই তাই তো জাহিদার জানা নেই।

—তাহলে তুমি আগে লাইব্রেরিতে যাও। নিদেনপক্ষে ইন্টারনেটে যাও? আম্রপালি খোঁজো। বই-এর দোকান তো দিল্লিতেও পাবে, এখানে তুমি আর কী দেখবে?

—ইউ সাজেস্ট।

—সাজেস্ট তো কত কিছুই করা যায়, তোমার হাতে সময় কই? বিড়লা তারামণ্ডল আর সায়েন্স সিটি দেখানোর সময় নেই, আমার তো খুব ভালো লাগে। কিন্তু বড়োরা দেখতে চায় না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়াম দেখ, সে তো তোমাদেরও পূর্ব ইতিহাস, ফোর্ট উইলিয়াম, ময়দান, অক্টারলোনি মনুমেন্ট, রাজভবন, কলকাতার টাউনহলের ইন্টার-অ্যাক্টিভ জাদুঘর দেখ, চমৎকার কলকাতার জন্ম ইতিহাস, সে তো ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতারও জন্ম কাহিনি, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার জাদুঘরটিও খুব ভালো, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অবশ্যই দেখো, টিপু সুলতানের মসজিদ দেখ, সেও তোমার আমার অভিন্ন ইতিহাস। সংস্কৃতির প্রসঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস দেখ, তুমি তো লেখক, প্রেসিডেন্সি কলেজ— এতক্ষণে জাহিদা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

—প্রেসিডেন্সি কলেজ। আমার ঠাকুরদার কলেজ ওটা। ওঁরা তো কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন। দেখা যাবে?

—কেন যাবে না, প্রসঙ্গত, ওটা আমারও কলেজ। প্রেসিডেন্সি, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট,

সব একই জায়গাতে। তাঁর যৌবনকালে তোমার ঠাকুরদা ওইখানেই হেঁটে বেড়াতেন, বই-টই কিনতেন, মিটিং করতেন, কী জানি তখন [illegible] হল ছিল কি না; চাইলে ফিরিঙ্গি কালীবাড়িও দেখে আসতে পার, কাছেই, বারাঙ্গনাপল্লি দূরে নয়, অনেক অদলবদল হচ্ছে সেখানে, নানা ধরনের সচেতনতার প্রোগ্রাম চলছে। কিন্তু তুমি তো প্রাচীনকালের খবর চাও। তা কি ওখানে পাবে? বউবাজারে বিখ্যাত বাইজিদের পাড়া ছিল, সে ঠিক বারাঙ্গনাপল্লি নয়, এখন কিছু আছে কি না জানি না, আমি আপন মনে গুজগুজ করে আউড়ে যেতে থাকি, জাহিদা একমনে শুনতে থাকেন, কোনো মন্তব্য করেন না— উত্তরে দ্রষ্টব্য আছে জৈনদের পরেশনাথের মন্দির, আর দক্ষিণে আমাদের এই বাড়ির কাছেই কলকাতার আরেক দ্রষ্টব্য, কালীঘাট, অবশ্য তার চেয়ে সময় থাকলে বেলুড়ে, কি দক্ষিণেশ্বরে গেলে বেশি ভালো লাগত। তবে কলকাতার মন্দিরগুলো সব বাদ দেওয়াই ভালো, এ তো উড়িষ্যা নয়, বিষ্ণুপুরও নয়, ওদের বহিরঙ্গে তো তেমন কোনো শিল্পের সৌন্দর্য নেই। কী দেখবে? অবশ্য হয়েছে এক বিড়লা মন্দির, অনেক কারুকার্য খচিত নতুন মন্দির। বরং উত্তর কলকাতাতে যাচ্ছ, নাখোদা মসজিদ দেখে আসতে পার। নাখোদা মসজিদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, বঙ্গভঙ্গের সঙ্গেও নামটি জড়ানো। রাখীবন্ধনের দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে ওখানে গিয়ে মসজিদে যাঁরা ছিলেন তাদের রাখি পরিয়েছিলেন এবং কোলাকুলি করেছিলেন পরস্পরের সঙ্গে।

—নাখোদা মসজিদ? জাহিদা যেন ঘুম ভেঙে মহোৎসাহে উঠে বসলেন। গুড! তাহলে আমি করাচিতে ফিরে বলতে পারব কলকাতাতে গিয়ে নাখোদা মসজিদ দেখে এসেছি। ওটা সবার জানা।

—কিন্তু মেয়েদের কি ঢুকতে দেবে?

—ঢুকতে চাই না তো? তুমি যে অনন্ত লিস্টি দিলে তাতে তো কোথাও ঢোকার প্রশ্ন নেই। সব ওই বাইরে থেকে চোখের দেখা। চৌরঙ্গি দেখা হবে তো?

—হবে। হাওড়া ব্রিজও দেখা উচিত তোমার, অন্তত নতুনটা। আর অজস্র আর্ট গ্যালারি আছে, দারুণ সব ছবি, অজস্র ভালো থিয়েটার আছে, শুধু বাংলা নয়, হিন্দিতেও ঊষা গাঙ্গুলির দল, প্রতিভা অগ্রবালের দল, কিন্তু তোমার সময় কই? দিশি শপিং-এর জন্য দক্ষিণাপণ, স্বভূমি। আর অজস্র বিদেশি চেহারার মল, কিন্তু এগুলো হয়তো পাকিস্তানেও আছে। দিল্লিতে যেতে এত তাড়া কেন? অনেকবার তো গিয়েছ দিল্লিতে। থাক না দু-দিন।

দুর্ভাগ্যবশত যেদিনটি জাহিদা ফ্রি সেইদিন আমি খুব ব্যস্ত, তাই বইয়ের দোকানের পরে লাঞ্চ, তারপরে ওকে একটি গাড়ি ভাড়া করে দিলুম, জয় ছেলেটি শিক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য সঙ্গী-কাম-গাইড হতে পারবে। বেছে একটি তালিকা তৈরি করে দিলুম জাহিদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোটামুটি সম্ভাব্য দ্রষ্টব্যের। ভিতরে প্রবেশের দরকার নেই। এক একটি দেখাবে, আর টিক-মার্ক দেবে। সারা দুপুর বিকেল সন্ধে আছে রাত পর্যন্ত।

রাত্রে জয় ফোন করে বিজয়গর্বে জানাল লিস্টির প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য সে ম্যাডামকে বাইরে থেকে দেখিয়েছে, টাউন হলের ভিতরে ঢোকেননি, ভিক্টোরিয়াতেও না, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতেও না, মিউজিয়ামেও না, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও না, শুধু কলেজ স্ট্রিটে নেমে বই-এর দোকানে, প্রেসিডেন্সিতে আর কফি হাউসে একবার করে ঢুকেছিলেন, নাখোদা মসজিদ, টিপু সুলতানের

মসজিদ, কোথাও নামেননি, একবার ফোর্ট উইলিয়ামের ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটার হলওয়েল মনুমেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কোথায় জয় জানে না তাই নামায়নি। যা বুঝলাম জাহিদার অনেক বেড়ানো হয়েছে সারা কলকাতা জুড়ে। প্রচুর রসদ সংগ্রহ হয়েছে কাগজে লেখবার মতো, একদিনের কলিকাতা সন্দর্শন। হলওয়েল মনুমেন্ট তো ফোর্টে নেই, আছে পার্ক সার্কাসে ফিরিঙ্গিদের গোরস্থানে। মনে পড়তেই খুব আফশোস হল। আহা, ওঁকে একবার পার্ক সার্কাসে ঘুরিয়ে আনা হল না? ওঁর মনে হত বুঝি আর পশ্চিমবঙ্গে নেই, পথ ভুলে পাকিস্তানেই চলে এসেছে, চারিদিকে উর্দু ভাষার বিজ্ঞাপন, উর্দু পোস্টার, উর্দু স্লোগান দেওয়ালে দেওয়ালে, বুরখা ঢাকা মেয়েরা, চাঁদি ঢাকা, টুপি মাথায় কুর্তা পাজামা পরা পুরুষ রাস্তাঘাটে। এ-রকম দেবনাগরী ভরতি হিন্দু পল্লি, কি গুরুমুখী ভরা শিখ পাড়া কি আমরা পাব করাচিতে? আহা, জয়কে বলে দেওয়া হয়নি, বোকামি হয়েছে আমার।

জয় রিপোর্ট দেওয়ার পরের দিন জাহিদা দিল্লি থেকে ফোন করলেন।

—ধন্যবাদ, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তোমার তালিকা মিলিয়ে কলকাতা দেখেছি। কিচ্ছু বাদ নেই। ড্রাইভারটি খুব চমৎকার। খুব ভদ্র, যত্ন করে ঘুরিয়েছে, লিস্টের বাইরেও দেখিয়েছে, ইডেন গার্ডেন, রাজভবন, জিপিও, রাইটার্স বিল্ডিং, হিন্দিতে সব রানিং কমেন্টারি দিয়েছে, চৌরঙ্গির গ্র্যান্ড হোটেল আগে অন্যরকম ছিল, এটা নতুন; রবীন্দ্রনাথের আসল দ্রষ্টব্য স্থল কিন্তু শান্তিনিকেতনে, তাও বলেছে, অক্টারলোনি মনুমেন্টে এখন রাত্রে আলো জ্বলে আগে জ্বলত না, আর মাথাটা লাল রঙের ছিল, এ-রকম অনেক জ্ঞান দিয়েছে আমাকে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে জাহিদা আমাকে বললেন, ড্রাইভার আমাকে অনেক জরুরি খবরও দিয়েছে, গোপনে বলেছে, নাখোদা মসজিদ খুব ডেনজারাস জায়গা ম্যাডাম, না যাওয়াই ভালো। জানেন তো, ওখানে মুসলমানেরা পাকিস্তান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা করে রেখেছে, আমাদের একদিন শেষ করে দেবে। আই.এস.আই.-এর চক্রান্ত হয় ওইখানে, যত পাকিস্তানের স্পাইদের আড্ডা, বাংলাদেশি গুন্ডারা এসে ওইখানে লুকিয়ে বোমা তৈরি করে, বুঝলেন ম্যাডাম? সব ওই সৌদি আরবের পয়সাতে। আমাদের ক্যাবলা সরকার কোনো কম্মের নয়, কিচ্ছু আটকাতে পারে না। আপনাদের দিল্লি অনেক ভালো। করুক দেখি জুম্মা মসজিদে এইসব কাণ্ড?

জাহিদার ঢেউ তোলা, পেট ফাটা, অট্টহাসিতে আমার কান আগুন হয়ে যেতে থাকল, ছি ছি! আমাদের এত গর্বের ধন, ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার রাজনীতিসচেতন, টলারেন্ট, সেকুলার সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে কিনা এই ধারণা নিয়ে গেলেন জাহিদা? হায়, এত করে জাহিদাকে ঔপনিবেশিক কলিকাতা প্রদর্শন, সব তাহলে একা নাখোদারই ভোগে চলে গেল। সাংবাদিকের মশালালোলুপ জিভে জয়ের দেওয়া খবরটাই তো হবে মুখ্য সুস্বাদ। জয় একটা কথা বলেছিল বটে ফোনে, তখন ঠিক খেয়াল করিনি। এবার তার নিহিতার্থ টের পেলুম।

—ম্যাডামকে রামকৃষ্ণ মিশনে ছেড়ে এসেছি। ওঁকে বলেছিলাম, কিন্তু উনি ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে ইন্টারেস্টেড ছিলেন না। অবশ্য উনি তো দিল্লির লোক, দিল্লির কালীবাড়ি অনেক বড়ো।

জাহিদা পাকিস্তানি, জয়কে সেটা বলা হয়নি।

সে ছিল জুনের মাঝামাঝি, করাচির লাল মসজিদের রক্তাক্ত ঘটনা তখনও ঘটেনি।

৫ অগাস্ট ২০০৭

এ বাড়িতে দুটি বস্তু ঢুকবে না, কম্পিউটার আর সেলফোন

কলকাতাতে নাদিন গর্ডিমারের সঙ্গে এবারে বেশ জমিয়ে আলাপ হল (আনন্দবাজার পত্রিকায় তার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল)। তিনি আমাকে টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললেন কখনো জোহানেসবার্গ গেলে যোগাযোগ কোরো, বাড়িতে এসো। আমি পরের সপ্তাহেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছি শুনে তিনি একটু বিচলিত হয়ে বললেন, কিন্তু আমি তখন মেক্সিকোতে থাকব! কার্লোস ফুয়েন্তেসের আশি বছরের জন্মদিনে! আমার ফিরে আসতে আসতে অমুক তারিখ হয়ে যাবে। আমি বলি, আমিও তো প্রথম যাচ্ছি কেপটাউনে। জোহানেসবার্গে যেতে যেতে তুমি এসে পড়বে। সেই কথাই রইল।

কেপটাউন থেকে ফোন করলুম। খুব সহজেই চিনতে পারলেন এবং খুশি হয়ে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। পথনির্দেশ দিতে গিয়ে নাদিন বললেন, 'সাবধান, আমাদের গেটের সামনে থেকে তিনখানা গাড়ি চুরি হয়ে গিয়েছে। সোজা সাত নম্বর লেখা গেট ছাড়িয়ে চলে আসবে পরের রট আয়রনের গেটে, আমার উঠোনে ঢুকে পার্ক কোরো। তারপর কিচেন দিয়ে প্রবেশ।' রোজ ব্যাঙ্কের কাছেই পার্ক টাউন। যেতে সময় লাগল না। শুনলুম ভীষণ ধনী ইহুদিদের পল্লি এটি, বাড়ির দর আকাশছোঁয়া। কিচেনের দরজায় ঘণ্টি বাজাতেই নাদিন নিজে এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। ভিতরে ঢুকে দেখি অ্যাপ্রন আর বনেট পরে, উপনিবেশের ছবির মতো একটি আফ্রিকান মেয়ে বসে আছে টুলের ওপরে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাসল। বাদামি রং। ঝকঝকে তকতকে কিচেনে কোনোদিন কিছুই রান্না হয় বলে মনে হয় না। আমাদের ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে নাদিন বললেন, 'আমার বাড়ির অনেক বয়েস তো, এক-শো পেরিয়ে গিয়েছে, তাই ছোটোখাটো গোলমাল লেগেই আছে। টয়লেট, বাথ, কিচেন, সবই পুরোনো ধরনের।' বড়ো বাড়ি। রান্নামহলের এদিকটা বন্ধ করে দেওয়া যায়, মাঝের মস্ত দরজাটা ভেজানোই থাকে। নাদিনের সেন্স অব প্রিভেসি অতি প্রসিদ্ধ। তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেন না। কাউকে জীবনী লিখতেও দেননি। একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্কলারকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি কথার খেলাপ করেন। যা লেখার কথা ছিল না এমন কিছু লেখেন, যাতে জীবনীটির যাথার্থ্য নাদিন সরকারিভাবে অস্বীকার করেছেন। জীবনীটি নাকি লেখক তবুও প্রকাশ করেছেন অন্যভাবে, আইন বাঁচিয়ে, সর্বত্র পাওয়া যায়। যেই আমি নাদিনকে জিজ্ঞেস করেছি, 'তুমি আত্মজীবনী লিখবে না? কত ইতিহাসের সাক্ষী তুমি—' জোরে জোরে সোনালি চুলগুলি দুলিয়ে নাদিন বললেন, 'না। আই অ্যাম আ প্রাইভেট পার্সন, অ্যান্ড উড লাইক টু রিমেইন ওয়ান।' 'প্রাইভেট' শব্দটি উনি আর একবারও বলেছিলেন সেদিন।

ফ্র্যাঞ্জিপ্যানি/গোলকচাঁপা

কিচেন থেকে বেরিয়ে আমাদের দালান পার করে নিয়ে যাচ্ছেন বৈঠকখানাতে। পথে একটা পড়ার ঘর দেখলুম, ঠিক ছবির মতো। মস্ত জানালার পাশে টেবিল, তাতে টাইপরাইটার আর অনেক কাগজপত্র ডাঁই হয়ে আছে। উঁচু উঁচু তাকে বই ভরতি, খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত তেরছা রোদ্দুর এসে পড়েছে প্রতীক্ষায় থাকা চেয়ারটার ওপরে আর টেবিলের একাংশে। ঘরের বাকিটা আলো-ছায়াতে রহস্যময়। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি।

'তোমার লেখাপড়ার ঘর?'

'আমার সব কিছু।'

'ওখানে তোমার ছবি তুলতে পারি?'

'যেখানে খুশি আমার ছবি তুলতে পারো এ বাড়িতে, শুধু ওই ঘরটা বাদে। ওটা আমার প্রাইভেট স্পেস, ওখানে আমি লিখি, ওখানে আমি ভাবি। ওই ঘরের ছবি আমি কাউকে তুলতে দিই না। চল না, বসার ঘরে তুলবে, বা বাগানে? আমি ওই ঘরটাকে আমার শোয়ার ঘরের চেয়েও প্রাইভেট বলে মনে করি।'

'কোয়াইট, বিকজ দ্যাটস হোয়্যার ইউ ক্রিয়েট!'

'লেখার সময়ে দরজা বন্ধ রাখি, ফোন ডিসকানেক্ট করে দিই, কারো সঙ্গে দেখা করি না, আমি একা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লিখি। কেউ বিরক্ত করতে পারে না।'

'এ কী, নাদিন তুমি এখনও টাইপরাইটারে লেখো? কম্পিউটার ব্যবহার কর না?' শিহরিত হয়ে নাদিন বললেন, 'না বাবা না, ওসব নতুন নতুন যন্ত্রে আমার আগ্রহ নেই। দুটি বস্তু এ বাড়িতে নেই। কম্পিউটার আর সেলফোন। কোনোদিন ঢুকবেও না।'

সদর্পে পা ফেলে তিনি বাগানের দরজার পর্দা টেনে খুলে দেন। বাগান ঘরে চলে আসে। বৈঠকখানাটিও গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে সাজানো।

'এইসব ফুল তোমার বাগানের?' নন্দনার প্রশ্নে একটু লজ্জা পেলেন।

'না না সব নয়, কিছু উপহার।' তার পরেই বলেন, 'চলো বাইরে চলো আমার বাগান ঘুরে দেখবে। অনেক রকমের গোলাপ আছে। আর আমার ফ্র্যাঞ্জিপ্যানিতে ফুল ধরেছে।' বেশ কয়েক বার 'ফ্র্যাঞ্জিপ্যানি' শব্দটি জিভের ওপর তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করলেন। এদেশে বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য ফুল। এটি হাওয়াই দ্বীপের জাতীয় পুষ্প। ফ্র্যাঞ্জিপ্যানির মালা পরিয়ে 'আলোহা' বলে হাওয়াই দ্বীপে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রথা আছে। হাওয়াই দ্বীপে গিয়ে ১৯৬১-তে আমি কী হতাশ। এই? ও মা, এ তো আমাদের গোলকচাঁপা, এর আর এক নাম গুলঞ্চ, আমাদের বাড়িতেও আছে। তবু নাদিনের সঙ্গে বাইরে গিয়ে তার ফ্র্যাঞ্জিপ্যানি দেখি। 'ওই দেখো, ছেয়ে গিয়েছে ফুলে ফুলে,' সগৌরবে গাছের দিকে তাকিয়ে বলেন নাদিন। অতি সাধারণ একটি গাছ। ফুলও ধরেছে সাধারণই। কিন্তু তার এপাশে বিশাল সবুজ লন গড়িয়ে গিয়েছে আকাশে। তার সীমানা দেখা যাচ্ছে না। ওপাশে ফুলের বাগান, নন্দনা বেরিয়ে গেল বাগান দেখতে। আমি আর নাদিন ঘরে এসে বসি। 'তোমার মেয়েটি ভারি সুন্দরী,' নাদিন বলেন, 'চা, না কফি, নাকি ফলের রস, না বিয়ার?' আমি বলি, চা।

তাজ হোটেল, নাতনি

একটু পরে সেই মেয়েটি আসে, আমাদের জন্য ট্রেতে চা সাজিয়ে। নাদিন উঠে পড়েন, টি-পট নিয়ে চা ঢালেন প্রত্যেকের কাপে। ঢালতে ঢালতে বলেন, 'ইস! কী ভয়ানক কাণ্ডই হল বম্বেতে। মানুষের পাগলামি আর নির্মমতা কোথায় পৌঁছেছে। সন্ত্রাস সারা পৃথিবীকে অসুস্থ করে ফেলছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না আর।' নাদিন উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের কেউ ছিলেন না তো বম্বেতে?' নন্দনার এক সহ-অভিনেতার দিদি-জামাইবাবু ট্রাইডেন্টে মারা গিয়েছেন। ওঁদের শুটিং পিছিয়ে গিয়েছে। অন্তরার এক সহকর্মী মারা গিয়েছেন তাজ-এ। শুনেই শিউরে উঠে নাদিন বললেন, 'ওঃ আর বোলো না তাজের কথা। ভাবতে পারছি না, মাত্র কয়েকটা দিন আগেই আমি আর আমার নাতনি তো ওখানেই ছিলাম, আমার কাছে সারাক্ষণ লোকজন, তাই নাতনি সময় কাটাত জিম-এ। জিমটা একেবারে অন্যদিকে। বাপ রে! যদি সেই সময়ে আমরা ওখানে থাকতাম, তাহলে কী সর্বনাশ হত বল তো, দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতাম, ও এক জায়গায়, আমি আর এক ঘরে। কী ভয়ংকর!' আমার অবাক লাগল এই ভেবে যে, তিনি কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবছেন না, মৃত্যুভয় পাননি, তাঁর শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আতঙ্ক হয়েছে। সেই প্রচণ্ড ভীতির মুহূর্তে নাতনিকে বুকে আর আগলাতে পারতেন না, এই তাঁর ভয়, যার কল্পনাতে তিনি শিউরে উঠছেন। নাতনি যে মারাই যেতে পারত, সে নিয়ে কিন্তু কিছুই বললেন না নাদিন।

নরিম্যান হাউসে ইহুদি হত্যার প্রসঙ্গও উঠল। নাদিন নিজে ইহুদি। আমি বলি, ভারতে ইহুদি ঘৃণার চিহ্ন মাত্র ছিল না, বহু যুগ আগে এক হিন্দু রাজা পালিয়ে আসা ইহুদিদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, আজ সেই মাটিতে ইহুদি হত্যা হল। সন্ত্রাসের ফসল ফলানো হয় ঘৃণার চাষ করে। ইজরায়েল আর প্যালেস্তাইনের ঘৃণার ছাপ এই হত্যাকাণ্ডে স্পষ্ট।

প্রসঙ্গ আবার ঘুরে গেল বিশ্বশান্তির দিকে; ইরাক, বুশ এবং ওবামা এসে পড়লেন। এসে পড়লেন ম্যান্ডেলা, তাঁর প্রাক্তন পত্নী উইনি, বর্তমান স্ত্রী গ্রেস। সকলকেই খুব ভালো করে চেনেন নাদিন। উইনি অনেক অন্যায়-অনুচিত কাজকর্ম করেছেন, তবুও নাদিনের মতে উইনির কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চিরঋণী। আর, নেলসন আর গ্রেস দুজনে এখন দিব্যি পরস্পরের প্রেমে পড়েছেন, গ্রেস ঘটা করে স্বামীর যত্নআত্তি করেন। ম্যান্ডেলা বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন। একটু জবুথবু।

মাঝগগনে জন্মদিন

'তারপর, মেক্সিকো কেমন হল? কার্লোস ফুয়েন্তেসের জন্মদিন?' এক-শোটা আলো জ্বলে উঠল ওঁর মুখে-চোখে। 'খুব সুন্দর। অপূর্ব। দারুণ আনন্দ করেছি সকলে। মাত্র দশজন লেখককে ডেকেছিল সারা পৃথিবী থেকে, মিনিট পনেরো করে বলতে, কিন্তু কার্লোসের সম্পর্কে নয়। অত্যন্ত সুন্দর বন্দোবস্ত করেছিল সিলভিয়া, ওর দ্বিতীয় স্ত্রী। আহা, ওদের তো দুটি সন্তানই বড়ো হয়ে, ২৫ আর ৩০ বছরে মারা গিয়েছে, শুধু প্রথম স্ত্রীর মেয়েটি এসেছিল, সিসিলিয়া মাকাডো। চমৎকার একটা মধ্যাহ্নভোজ ছিল, ছোটো করে অল্প লোকের জন্য, অসামান্য সুস্বাদু সৃষ্টিশীল

রান্না করে সিলভিয়া। সব নিজে রেঁধেছিল। যেমন রূপসি, তেমনি গুণী। একপিঠ এলো ব্লন্ড চুল, আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে বলেন, 'তোমার একপিঠ কালো চুলও সুন্দর...'

'কেন, নাদিন, তোমার সোনালি চুলও তো খুব নজর কাড়ে।'

'কাড়ত, এখন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। কার্লোসদের গোটা বাড়িটাই খুব মনের মতো, খুব অন্য রকম, কোনো ঘরটা কোনো ঘরের মতো নয়, অনেক সারপ্রাইজ আছে। সিলভিয়ার সবচেয়ে বড়ো গুণ কী জান? কার্লোসের সব কাগজপত্র, সব বইপত্র, প্রত্যেকটা এডিশন, প্রত্যেকটা অনুবাদ, রিভিউ, লেকচার, পুরস্কার, ফোটো, সব গুছিয়ে তাকে সাজিয়ে এবং ফাইল করে রেখেছে। যখন যেটা চাই সেটা তক্ষুনি হাতের কাছে পাবে। আর আমার? ঠিক উলটো। কোনো জিনিসটা যদি হাতের কাছে পাই! কেউ কিছু চাইলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, খুঁজতে খুঁজতে প্রাণ যায়।'

শুনে আমার প্রচণ্ড সহানুভূতি হল, আমারও তো সেই একই অবস্থা! কিছুই গুছোনো নেই, সবই হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি নাদিনকে বলি, 'তুমি একজন সেক্রেটারি রাখ না কেন?'

'রেখেছিলুম তো, খুব ভালো মেয়ে ছিল, কিন্তু সে যে মারা গেল। আর মনের মতো কাউকেই পাচ্ছি না।' আহা, নাদিন, আমিও কি কম খুঁজছি একজন গুছুনে সহকারী, ফুয়েন্তেসের সুন্দরী বউয়ের মতো? যে আমার সব কাগজপত্তর ভালোবেসে গুছিয়ে রাখবে?

'মেক্সিকো থেকে ফেরার পথে, মধ্য গগনে আমার ৮৫ পূর্ণ হল।'

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক সুরে নীচু গলায় বলে ওঠেন নাদিন।

'সে কী? আকাশে? একা একা? উৎসব হল না?'

'আমিই চাইনি উৎসব। ছেলে-মেয়েরা এসেছিল।' হাসিমুখে যোগ করেন, 'এইসব ফুল সেই দিনেরই!'

'নাদিন, তোমার নতুন কী বই বেরুচ্ছে?'

'একটা নন-ফিকশনের সংকলন বেরুচ্ছে, কিন্তু আমি নিজেকে নন-ফিকশনের লেখক ভাবতে পছন্দ করি না।'

'উপন্যাস কিছু ধরেছ?' নাদিনের মুখে হাসি, 'হ্যাঁ, নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছি।'

'কী নিয়ে লিখছ, জানতে পারি?'

নাদিনের সুন্দর মুখ কঠিন হল, 'আমি কখনো আমার অসম্পূর্ণ লেখার বিষয়ে কিছু বলি না। সেটা গোপন রাখা পছন্দ করি।'

'বেশ, আমরা ধৈর্য ধরে থাকব।'

১১ মার্চ ২০০৯

আমার গুরুমশাইয়েরা

অনেক বিদ্যাস্থানে পড়েছি, অনেকের পায়ের কাছে বসে শিখেছি, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি অনেক গুরুর, জীবনের এক এক সময়ে এক এক জন এক এক উপায়ে আমাকে ঋণী করেছেন। ইস্কুলের আদর দেওয়া শিক্ষয়িত্রীদের নাম দিয়ে ঋণ স্বীকার শুরু করলে বিদেশের কলেজের শেষ ধাপে সেই তালিকা শেষ হতে হতে শুধু তাঁদের নামেই পাতা ভরে উঠবে, আর কিছু লেখালিখি হবে না। আমি নিতান্ত ফাঁকিবাজ, দুরন্ত মেয়ে হয়েও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কাছে অনেক অহৈতুকী স্নেহ পেয়েছি, পৃথিবীর সর্বত্র। এই সংখ্যার শীর্ষক হল, 'স্যার'। ভারতের অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীরা ম্যাডাম, শিক্ষকেরা স্যার। বাংলায় আমাদের বলে, 'দিদিমণি'। আর ওঁদের, না, 'দাদামণি' বলে না, তার বেলায় ঘরোয়া সুরটি কেটে যায়, 'স্যার'। আমি ভাবলুম বড়ো স্যারদের নিয়ে তো সকলেই লিখবেন, আমি বরং আমার একজন খুব বড়ো দিদিমণির কথা লিখি, যিনি বিশিষ্ট একজন মানুষ এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাকি সবাই ছিলেন স্যার, তিনিই ছিলেন আমাদের সময়ে আমাদের বিভাগের একমাত্র 'দিদিমণি'।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্যের বয়েস এখন একানব্বই। আমি তাঁর ছাত্রী হই যখন, তখন আমি কিশোরী, চোদ্দো বছর বয়েস। তিনি পূর্ণ যুবতী। আক্ষরিকভাবেই সুকুমারী, শ্রীময়ী মূর্তি, লাবণ্যের প্রতিমা। মস্ত এলো খোঁপা, সাদা সুতি শাড়ি, একরঙা পাড়, ডান হাতে একগাছা চুড়ি। কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। উজ্জ্বল চোখ, টেপা ঠোঁট, গাম্ভীর্য, সব মিলিয়ে বেশ অহংকারী দেখতে। রাশভারী-র চেয়েও বেশি, ভয় ভয় করে। আর ছাত্রীরা বলে, রাগী মানুষ। লেডি ব্রেবোর্নে তিনি পড়ান ইংরিজি, আমি সদ্য স্কুল পেরিয়ে, প্রথম বর্ষের ছাত্রী, সময় ১৯৫২। আমাদের পরিচয়ের কত বছর হল, সুকুমারীদি, এই ২০১২ তে, ষাট? শুনেছি দক্ষিণ ভারতে বিয়ের ষাট বছর পূর্তি হলে আরেকবার বিয়ে দিয়ে সেটা সেলিব্রেট করে। আমি আজ আর একবার আপনার কাছে নতুন করে দুষ্টু ছাত্রীর প্রণাম জানাতে এলুম। নাঃ, আপনি তো আবার পা সরিয়ে নেবেন, 'কারুর প্রণাম নিই না'! তাহলে জানাই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। কিন্তু আমাদের প্রণাম করার মানুষও তো কমে যাচ্ছেন। আপনার প্রিয় ছাত্রী আমি ছিলুম না কোনোদিনই, কিন্তু প্রিয় পাত্রী তো ছিলুম। প্রথমে বকুনি খেলে আর ভয় পেলেও আমাদের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল একসময়ে। ছাত্রবয়সের অনেক বছর পরে। তখন আমি একা, আর আপনিও। এবং দুজনে সহকর্মী। অনেক দিন পরে দেশে ফিরেছি, অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আপনি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ও যদি তোমার কাছে ফিরে আসে কখনো, তুমি কি ফিরিয়ে নেবে?' আমি চুপ। অবশেষে, আপনি নিজেই বললেন, 'বোধ হয় বলবে, পুরানো জানিয়া চেয়ো না চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে!'

সে তো অনেক, অনেক পরের কথা, গোড়ায় ফিরি। আপনার কাছে দু-বছর ব্রেবোর্নে

ইন্টারমিডিয়েটের ইংরিজি পড়ে, আমি গেলুম প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরিজি পড়তে। সেখানে আমাদের প্রথম দিনেই পড়াতে এলেন একজন মিতভাষী কিন্তু কঠোর নিয়মনিষ্ঠ অধ্যাপক, অমল ভট্টাচার্য। (যাঁর হাত ধরে আপনার পৈতৃক পরিচয়ের 'দত্ত' পদবির বদলে 'ভট্টাচার্য' পদবি এসেছে।) 'প্রথম রাতেই বিল্লি কাটা'র সেই ধ্রুপদি কাহিনির মতোই শোনায় এখন, পাঠ্যবই নিয়ে ক্লাসে আসিনি বলে অমলবাবুর প্রথম ক্লাস থেকেই নির্বাসিত হয়ে গেলুম আমরা অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী, পরের ক্লাসে সবার বগলে বই! আমরা রোমান্টিক কবিদের পড়েছিলুম লাজুক মানুষ অমলবাবুর কাছে। ওই সময়েই শিষ্য হয়েছি কিংবদন্তি অধ্যাপক তারক নাথ সেনের (তাঁর টিউটোরিয়ালে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল), তিনি পড়াতেন ম্যাকবেথ, সে তো শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খে শেক্সপিয়র শেখানোই নয়, সাহিত্যপঠনের মূল সুর তিনিই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যেকোনো দেশের সাহিত্যপাঠের জন্যেই সেদেশটির ইতিহাস জানা আবশ্যক। ইংরিজি সাহিত্য পড়তে হলে ইউরোপের ইতিহাস পড়া চাই, ছাত্রদের কাছে সেটা তাঁর দাবি ছিল। আর রিচার্ড দ্য থার্ড তারাপদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর অভিনয় প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়া শুনতুম। প্রবন্ধ পড়াতেন বিভাগের প্রধান, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তাঁর নোটসে পরীক্ষার জন্যে চটপট তৈরি! বাংলা বিভাগে তখন জনার্দন চক্রবর্তী; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নক্ষত্রের ছড়াছড়ি। ইতিহাসে সুশোভন সরকার, মামুদ সাহেব। দর্শনে গোপীনাথ ভট্টাচার্য, প্রবাসজীবন ভট্টাচার্য। সংস্কৃতে গৌরীনাথ শাস্ত্রী। আরও কত মহৎ মানুষ! সেই পঞ্চাশের দশকের প্রেসিডেন্সি কলেজ, যেদিকে তাকাই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত তখন আমরা। এত নির্বোধ ছিলুম, কিছুই যথাযথ মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি। কত ভাগ্য করে এসেছি, কাদের সামনে বসে আছি, কারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তা বুঝতে বুঝতে দিন পার হয়ে গেল।

দু-বছর আমি আপনার পণ্ডিত স্বামীর কাছে ইংরিজি পাঠ সমাপ্ত করে, এলুম যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ করতে। এসে কী দেখি? আমি যেমন ইংরিজি ছেড়ে দিয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এসেছি ছাত্রী হয়ে, আপনিও তেমনি ইংরিজি পরিত্যাগ করে তুলনামূলক সাহিত্যে এসেছেন শিক্ষক হয়ে। শুধু এবারে আপনার আমাকে পড়ানোর বিষয় ইংরিজি নয়, সংস্কৃত। ইংরিজির মতোই ওই বিষয়েও আপনার একটি আরও ঝলমলে ডিগ্রি ছিল, সেটাই প্রথম। আপনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবারের মানুষ, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ.-র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রাপ্য ঈশান স্কলারশিপ থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, সে-কলঙ্কের কাহিনি আমাদের সময়ে কারুর অজানা ছিল না। ঈশানচন্দ্র বসুর তৈরি করা স্কলারশিপের যোগ্যতার নিরিখে বাঁধা ছিল 'বর্ণহিন্দু' হওয়া চাই। বিধর্মী বলে হিন্দু সংস্কৃত কলেজে চাকরিও দেওয়া হয়নি আপনাকে। সেই মানুষটি যে এতদিনে তাঁর প্রিয় বিষয়ের অধিকারে ফিরতে পেরেছেন, সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে, এতে আনন্দের সীমা ছিল না আমার। কিন্তু কয়েক বছর পরে আপনি পুরোপুরি সংস্কৃত বিভাগেই পড়াতে চলে গেলেন তুলনামূলক সাহিত্য ছেড়ে। যেমন চলে গিয়েছিলেন আমাদের আর এক প্রিয় অধ্যাপক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগে।

সুকুমারীদি, ভাবলেই আশ্চর্য লাগে, মাত্র আট মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে ইংরিজিতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন আপনি, তার প্রস্তুতির জন্য আপনার বাবা একজন তরুণ অধ্যাপককে

নিয়োগ করেছিলেন, তিনি সংস্কৃতে অনার্সের ছাত্রীকে ইংরিজিতে এম.এ. দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত করে দেবেন। তিনি পড়াতে এসে ছাত্রীকে হোমওয়ার্ক দিয়ে গেলেন, 'বায়রনের সেটানিজম নিয়ে কিছু লিখে রাখুন।' খেটেখুটে তো সুকুমারীদি লিখলেন তিন পাতা। স্যার এসেই উলটোপালটে দেখে বললেন, 'কোথা থেকে টুকেছেন?' 'মানে?' 'মানে, কোথা থেকে টুকেছেন?' ছাত্রীর নিজেরই লেখা শুনে অবাক হয়ে গিয়ে স্যার পুনরায় সেটি পড়তে শুরু করলেন। এই গল্প আমার সুকুমারীদির মুখেই শোনা। স্যারের ভাবনাটা কিন্তু স্বাভাবিক। কোনো সংস্কৃতের মেয়ে ভালো ইংরিজি জানবে এটা আশা করা হয় না। সেই স্যার সাত মাসের পরে সুকুমারীদিকে আর পড়াতে পারেননি, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন, পরীক্ষার তখনও মাস দেড়েক বাকি। মাত্র ৬ নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণি হয়নি ছাত্রীর। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল। তিনিই অমল ভট্টাচার্য। রূপকথার মতো রূপবতী গুণবতী সুকুমারীর রূপকথার মতো জীবনও, অনেক কষ্ট পেয়েছেন, নানাদিক থেকে অনেক অবিচারের শিকার হয়েছেন সারাজীবন। কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে হয়তো গবেষণার, লেখালিখির কেরিয়ার, কেম্ব্রিজে পড়তে যাবার পরে। কিন্তু কলম ঝলমলিয়ে উঠেছে তার পরে। আর এক মিনিটও তাঁর কলম থামেনি। ইংরিজি বাংলা দুই ভাষাতেই সমান শক্তিতে উৎসারিত হয়েছে তাঁর অজস্র গবেষণার কাজ। এখন অসুস্থ, শয্যাশ্রয়ী, দৃষ্টি অতি দুর্বল, কিন্তু এখনও নতুন ভাবনায় মস্তিষ্ক সচল, বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মনে কিশোরীসম আবেগ। কত কিছু নিয়েই যে উনি লিখেছেন, কখনো ভারতের দেবদেবী, কখনো রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবদগীতা, বেদ-উপনিষদ, ভারতীয় দর্শনের নানা দিক। পুরাণের, বৈদিক যুগের নারীদের বিষয়ে তাঁর কাছে অনেক খবর পাই আমরা। কিন্তু গোপনে বলি, সুকুমারীদির বিশেষ আহ্লাদ যে, নিয়তিবাদ নিয়ে তাঁর অনেক পরিশ্রমে রচিত বইটি বাংলা ইংরিজি দুই ভাষাতেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে। অমন একটা অদ্ভুত বিষয়ের বই বাংলাতেই ৫টা সংস্করণ যে কেমন করে হয়? সুকুমারীদি তো মহা আনন্দিত, 'বই বিক্রি হচ্ছে, লোকে তার মানে নিয়তিবাদ নিয়ে ভাবছে, এটাই তো চেয়েছিলাম।' পুরোনো দিনের মানুষ তিনি, বই লোকে জ্ঞানের আলো পেতে, স্বশিক্ষণের আগ্রহে কেনে বলে বিশ্বাস করেন।

ছোট্ট কথা, জগতের কাছে নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটা আমার কাছে জরুরি, বিশেষ করে আজকের তারিখের জন্যে (৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস), তাই বলি। সুকুমারীদি, একটা মজা দেখেছেন? আমি কিন্তু কলকাতায় আমার কলেজ জীবনের পুরো ছ-বছর ধরেই তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়েও আপনাদের পরিবারের একজন বা আর একজনের কাছে শিক্ষালাভ করে চলেছি। আচ্ছা, আপনার কি খেয়াল হয়েছে কোনোদিন, যে জগতে আমিই আপনার সেই একটিমাত্র ছাত্র যে আপনার কাছে প্রথমে ইংরিজি পড়েছে, আবার পরে সংস্কৃত পড়েছে? আপনার দুই ভিন্ন অবতারেরই সে ধ্বজাধারী ভক্ত? আজ্ঞে, আছি। এবং তদুপরি, দ্বিতীয় হিসেব দিই, আবার আমিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, যে আপনার কাছে এক কলেজে সংস্কৃত পড়েছে, আবার আপনার স্বামীর কাছে আর এক কলেজে ইংরিজি পড়েছে। দুজনেরই সোজাসুজি ছাত্র। (একটা কথা বলি, নিজেকে যেকোনো উপায়ে যেকোনো ক্ষেত্রে 'আমিই একমাত্র' বলে উপস্থাপিত করতে পারলে কিন্তু দারুণ আত্মতৃপ্তি হয়। 'আত্মশ্লাঘা হয়' বলতে গিয়েছিলুম আর

একটু হলেই। আপনি বকে দিতেন, 'পড়েছ, পড়েছ, এতে শ্লাঘার কী আছে?' ভাগ্যিস আপনি আছেন, সুকুমারীদি, গুরুজন, আমাকে ভালোবেসে বকুনি দেবার মতো মানুষ!)

যাদবপুরে চাকরি নিয়ে মেয়েদের নিয়ে আমার দেশে ফেরার সময়টা নিয়ে সুকুমারীদির জীবনেও নতুন আসা এক চরম একাকিত্ব চলছিল। গলার ক্যান্সারে সহসা অমলবাবুর জীবনাবসান হয়েছে তার কিছুকাল আগেই। মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফাঁকা। এখনও ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ মানুষটি যখন আমার চোখে ভাসেন, সিগারেট জ্বেলে তাঁর ফর্সা সরু আঙুলে, তাঁর দৃষ্টি দূরগামী। কন্যা মুনিয়া তখন অবিশ্যি বড়ো হয়ে গিয়েছে। মা বাবার মেধার যোগ্য উত্তরাধিকারী সে। মুনিয়ার প্রসঙ্গে মনে পড়ল আমাদের আরও দুজন মাস্টারমশাইয়ের কথা। মুনিয়ার বিয়ে হল সুমিতের সঙ্গে, শিপ্রাদির ছোটোভাই, ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারের পুত্র। দুই পুরোনো বামপন্থী পরিবারের মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন হল। সুশোভন সরকার ছিলেন প্রেসিডেন্সিতে আমাদের অধ্যাপক। তাঁর তরুণী কন্যা শিপ্রা সরকারের কাছেও ব্রেবোর্নে ইন্টারমিডিয়েটে ইতিহাস পড়েছি আমি, সুকুমারীদির কাছে যখন ইংরিজি। আমরাই ছিলুম শিপ্রাদির প্রথম বছরের ছাত্রী। সবাই তাঁর পড়ানোয় পাগল। পরে চলে এসেছিলেন যাদবপুরে পড়াতে। অমলবাবুর মৃত্যুর পরে মুনিয়ার বিয়েটা হয়, নেহাত তরুণ তারকা তারা দুজনেই, আজকের বিশ্ববরেণ্য বিদুষী তনিকা সরকার হয়ে ওঠেননি মুনিয়া তখনও, সুমিত সরকারও হননি আজকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুর্দান্ত ঐতিহাসিক। ছোট্ট মুনিয়ার বাবার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে বিকেল বেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে লেকে বেড়াতে যাবার দৃশ্যটা আমার চোখে ভেসে ওঠে। আমি, বন্দনা, বেলা, আমরা তখন 'ভালো-বাসা'র রোয়াকে বসে গুলতানি করতুম। অমলবাবু রাস্তা দিয়ে গেলেই উঠে দাঁড়াতুম সবাই। কিন্তু একদিনও তিনি আমাদের দেখতে পাননি! তখন ওঁরা ডোভার লেনে থাকতেন। তারকনাথ সেনও থাকতেন ডোভার লেনেই। সুবোধবাবুও এপাড়ার বাসিন্দা, এগডালিয়া রোডের মোড়ে বাড়ি। এই দক্ষিণেই বাড়ি তারাপদবাবুরও, লেক ভিউ রোড অঞ্চলে। পাড়ার লোক হলেও কেউই পাড়াতুতো স্যার হয়ে ওঠেননি। সুশোভনবাবুরা থাকতেন ভবানীপুরে, এলগিন রোডে। সুকুমারীদি অমলবাবু তার পরে আমাদের পাড়ায় কেয়াতলায় বসবাস করেছিলেন অনেকদিন। তাঁদের বাড়ির মূল্যবান গ্রন্থাগারটি আমাদের অনেকের কাজে লাগত। প্রচুর ইউরোপীয় সাহিত্যের ও সমালোচনার বই ছিল। বই ধার দিতে কার্পণ্য করতেন না সুকুমারীদি, তাঁদের চমৎকার একটা হিসেব ছিল। যে বইটা তুমি নিলে, তার ফাঁকা জায়গায় বইয়ের নাম ও তোমার নাম ও তারিখ লিখে একটা কার্ড ঢুকিয়ে রাখতেন। দেরি করলে, বা দরকার পড়লে বইটি ফেরত চাইতে সুবিধে হত, বই বেঠিকানা হয়ে যেত না। এত দেখেও আমি কিন্তু ঘরের বই রক্ষা করতে শিখিনি। আজও অমনোযোগের সুযোগে তারা পরের বই হয়ে যায়।

অমলবাবুর প্রয়াণের পরে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা মিলে তাঁদের বাড়িতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে একটি সমিতি গড়ে তুলেছিলুম, তাতে সাহিত্য আলোচনা, ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিদ্যাচর্চা হত, যা অমলবাবুর মনের মতো। সুকুমারীদি ছিলেন তার সভানেত্রী। একটি বড়ো করে বাৎসরিক স্মারক বক্তৃতারও ব্যবস্থা চালু ছিল অনেক বছর ধরে। সত্যজিৎ রায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, রামচন্দ্র গান্ধীরা সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বলে গিয়েছেন। সদস্যদের একদিন সুকুমারীদি রান্না করে চর্ব্যচোষ্য খাওয়াতেনও তখন, সেই উপলক্ষে। সেটি ছিল আমাদের খুব আনন্দের দিন।

ক্রমশ মানুষের অবসর কমে যায়, কাজ বেড়ে যায়। ক্ষমতা কমে যায়, সময় পালটে যায়। সুকুমারীদি যতদিন এপাড়ায় ছিলেন, কেয়াতলার বাড়িতে, আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হত। আমার মেয়েদের সঙ্গেও তাঁর দিব্যি ভাব ছিল। একা হয়ে যাবার পরে সুমিত-শিপ্রাদিরা, আর সুকুমারীদি মিলে একই বাড়িতে দুটি ফ্ল্যাট কিনে নাকতলায় চলে যাবার পরে, আমাদের দেখা হওয়া কমে গেল। (যদিও তখন ওবাড়িতে গেলে আমার এক ঢিলে দুই দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!) আমার জামাই প্রতীক এম.এ. পড়ার সময়ে সুকুমারীদির কাছে গিয়ে গুরুগৃহে সংস্কৃত পড়ে আসত। আমি অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে খুব বেশি ওপরে উঠতে পারতুম না, হাঁপ ধরত। আস্তে আস্তে আমাদের যোগাযোগ কমে গেল। কিন্তু অত সহজে কি ছাড়ান আছে, সুকুমারীদি, আপনি শাশুড়িরও মাস্টারমশাই, জামাইয়েরও। দুই প্রজন্মের লতায় পাতায় আমরা জড়িয়ে আছি গুরুশিষ্য সম্পর্কে।

'রোববার'-এ আমাকে যখন স্যারের কথা লিখতে বলা হল, একটু ভেবে, পরের দিন আমি অনিন্দ্যকে জানালুম স্যার নয়, এক ম্যাডামের কথা লিখব। কিমাশ্চর্যমতঃপরম। এই আলোচনার পরের দিনই দেখি শ্রীকুমার রানা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভালোবেসে আমাকে সুকুমারীদির প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম খণ্ড উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি তো শোনেননি, আমি সুকুমারীদির কথা লিখছি! এ যেন সেইদিকে দৈবনির্দেশে চলে এল।

খুব আহ্লাদ হল দেখে যে তাঁর জীবদ্দশায় প্রবন্ধসংগ্রহ বেরুচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রে, সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া নারী বিষয়ক ভাবনা নিয়ে তাঁর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বেদে, পুরাণে, মহাকাব্যে তাঁর মেয়েলি পাঠের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নারীচেতনার প্রকাশ। এই কাজের সময়ে কি সুকুমারীদি, আপনি সচেতন ছিলেন, যে এগুলোকে পশ্চিমি নজরে বলা হবে পুরাণের, শাস্ত্রের 'মেয়েলি পাঠ'? গাংচিলের বইটা এত সুন্দর করে তৈরি করা, হাতে নিয়েই আনন্দ হয়। আর পড়লে, আনন্দের সঙ্গে আলোকলাভও সুনিশ্চিত। যাদবপুরে আমাদের যখন ১৯৫৬-৫৭ তে উপনিষদ পড়িয়েছেন, তখনও এই সচেতন নারীভাবনা লক্ষ করিনি আপনার পড়ানোর মধ্যে। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর কাছেও উপনিষদ পড়েছিলুম আমরা, দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির তেমন পার্থক্য নজর করিনি তখন। পৃথিবীতে তখনও আসেনি পশ্চিমি নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের দোলা।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত মনের দেখার চোখ ও জানার দিগ্‌দর্শন পালটে যায়। আমাদের সকলের মতোই সুকুমারীদিরও ভাবনাচিন্তার ধারার ক্রমশ বদল হয়েছে। নারীচেতনার এমন বিকাশ আমাদের দেশের আর কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের কাজের মধ্যে আমি অন্তত দেখিনি, ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত'-র পরে।

প্রথম খণ্ডের এই প্রবন্ধগুলি পূর্বে পড়েছি। অসামান্য গভীরতা তাঁর দৃষ্টিতে এবং ব্যাপ্তি তাঁর বিশ্লেষণে। অবাক হতে হয় অনুপুঙ্খের দিকে নজর দেখলে। অত্যন্ত সৎকাজ করেছেন গাংচিলের অধীর বিশ্বাস আর কুমার রানা সুকুমারীদির সব লেখা সযত্নে, একত্রে প্রকাশ করে। আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ। সুকুমারীদির প্রাচীন ভারতের নারী নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এই জ্ঞানগর্ভ কাজগুলি বিশ্ববিদ্যার নানা প্রসঙ্গেই খুব জরুরি, এর মূল্য ফুরোবে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলবে। সংস্কৃত সাহিত্যের, শাস্ত্রের ক্ষেত্র চষে ফেলে মেয়েদের জন্য এত ধান তুলে আনেননি

তো আগে কেউ। শুধু আমার হার্ভার্ডের ক্লাসমেট ও বন্ধু, বিশ্বনিন্দিত সংস্কৃত পণ্ডিত, শিকাগোতে অধ্যাপিকা ওয়েন্ডি ডোনিগারের কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকোণ এবং পাণ্ডিত্যের ধরনটি একেবারে আলাদা। সুকুমারীদির বইটির বহিরঙ্গের উপস্থাপনাও অসামান্য, শুধু একটাই দোষ। ওই মলাটের ফোটোতে প্রকৃত সুকুমারীদিকে চেনা যায় না। অমন মিথ্যে ছবি দেওয়া উচিত হয়নি। এই বিভ্রান্তির শোধন চাই। এত অবধি লিখেছি, বইটা হাতে করে সুকুমারীদির জন্যে এত মন কেমন করা শুরু করল, আমি ঠিক করলুম কালকেই যাব তাঁর কাছে। কতদিন দেখিনি ওঁকে। শিপ্রাদি তো বিদায় নিয়েছেন, সুকুমারীদি অন্যত্র, লিফ্‌টওলা ফ্ল্যাটে আছেন। মুখখানা দেখে তো আসি একবার? তার পরে আবার লিখব। আজ এত অবধি থাক।

১৯ অগাস্ট ২০১২

যৌবন বাউল

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন আমাদের বিভাগের সবচেয়ে তরুণ অধ্যাপক। আমি তখনো টিনএজার এক ছাত্রী। কলকাতার বুকে জন্ম নেওয়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুরের নতুন বিভাগ তুলনামূলক সাহিত্যের এম.এ. ক্লাসের প্রথম ছাত্র আমরা ৬ জন। কবি বুদ্ধদেব বসুর হাতে গড়া বিভাগ, হাতে গড়া ছাত্র ছাত্রীও। তিনিই আদর করে অলোকরঞ্জনকে নিয়ে এলেন নিজের বিভাগে। সেখানে রয়েছেন আরো দুজন কবি, তিরিশের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর চল্লিশের নরেশ গুহ। পঞ্চাশের তরুণ কবি অলোকদা এলেন বিভাগের চতুর্থ ও কনিষ্ঠতম কবি শিক্ষক হয়ে, সময়টা ১৯৫৬-১৯৫৮। বিভাগটির বাতাসে অ্যাকাডেমিক উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে খেলে যেতে লাগল সৃষ্টিশীলতার ঢেউ।

শুধু কি শিক্ষকরাই কবি? তাঁরা বড়ো কবি। তথা বিদ্বান। কিন্তু আমাদের ক্লাসের মধ্যে ছোটোরাও সকলেই কিছু না কিছু লেখালেখি করি, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন তরুণ কবিদের মধ্যে, আমি আর মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখছি, প্রবন্ধও, মানব অনুবাদ করেন, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লেখক, অমিয় দেব আর তরুণ মিত্র প্রবন্ধ লেখেন, তরুণ মিত্র একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকও। মোট কথা শুধু সাহিত্যের বই পড়েই আমরা ক্ষান্ত দিইনি, বইপত্তর লেখালেখিরও গুপ্ত ইচ্ছে ছিল আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে। সেই অবস্থায় অলোকদার মতো উষ্ণতায়, ভরসায়, পাণ্ডিত্যে এবং ভালোবাসায় ভরপুর এক তরুণ কবিকে নিজেদের মাঝখানে শিক্ষক পেয়ে আমাদের আহ্লাদ বুঝে দেখুন। প্রণবেন্দুর বাড়ি ছিলো অলোকদার পাড়ায়, যাদবপুরে। ওঁদের দুজনের তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে খুব ভাব ছিল, প্রতিদিন ওঁরা আড্ডা দিতেন, ছাত্র প্রণবেন্দু ছিলেন তাঁর মাস্টারমশাই-এর চেয়ে মাত্র বছর তিনেকের ছোটো। ওঁদের আড্ডা হোতো কবিতে কবিতে, ছাত্তরে মাষ্টারে তো নয়? মাঝে মাঝে ঝগড়াও হতো, কথা বন্ধ। আবার ভাব হয়ে যেত কখন যেন। অলোকদা মানুষটি বড়ো অভিমানী। শঙ্খদার সঙ্গেও যে অলোকদার এমনতরো মান অভিমান, মুখ ফেরানো দেখিনি, তা নয়। কিছুদিন পরে আবার যে কে সেই। শিক্ষকতা করার সময়ে দেখেছি অলোকদার গহনতম বন্ধুতা ছিল কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে। তাঁদের দুজনের কলকাতায় ছাত্রজীবনের বন্ধুতা। যদিও তাঁরা ঠিক সহপাঠী ছিলেন না। শঙ্খদা কলকাতার, অলোকদার চেয়ে একটু বড়ো। দুজনের রুচির মিল ছিল গভীর। দুই বন্ধুর সম্মিলিত অনুবাদ কবিতার বই, 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'কে তো তুলনামূলক সাহিত্যের কাজ বলাই যেতে পারে। অলোকদা শান্তিনিকেতনের ছেলে, অমর্ত্য এবং তিনি ছিলেন সতীর্থ। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সিতে বি.এ. পড়তে এসেছিলেন দুজনেই। কলকাতায় এসে দুই বন্ধু নিজের বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। ১৯৫৬-এ সদ্যোজাত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন দুজনেই। মনে পড়ে, যেদিন অমর্ত্য যাদবপুরের প্রফেসর পদ ছেড়ে ট্রিনিটি কলেজে ফিরে যাচ্ছেন, ১৯৫৮ তে, আমরা ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে একটি বিদায় সম্বর্ধনা দিয়েছিলুম। সেখানে

অলোকদা গেয়েছিলেন, 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।' অসাধারণ সেই সুর আজও মূর্চ্ছিত হয় বুকের মধ্যে। অলোকদার গানে গভীর প্রাণ আছে, কোনো কৃত্রিমতা নেই।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতার সঙ্গে পরিচয় শতভিষা, কবিপত্র, কৃত্তিবাস ইত্যাদি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে এবং দেশ-এ, কবিতা-য়। এখানে সেখানে তাঁর কবিতা পড়তুম। প্রেম হল 'যৌবন বাউল' থেকে। তারপরে 'ভিনদেশী ফুল'। কিন্তু তখনই, বাংলা কবিতার জগতে পা ফেলতে না ফেলতেই, জীবনের প্রথম কবিতার বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি। মজার কথা, আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী অনেকেরই বই বেরুলো সেই সময়ে। প্রণবেন্দুর কবিতার বই বেরিয়েছে তার আগের বছরে। মানবের প্রথম কবিতার বইও ওই সময়ে। আমি আর প্রণবেন্দু যাচ্ছি আমেরিকায় পড়তে, আর মানব চলে গেলেন বার্মায় স্কুলে পড়াতে। শ্যামলের (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রথম বই, অসাধারণ উপন্যাস, 'বৃহন্নলা', বেরুলো অল্প পরেই, ১৯৬১ তে, আমি বিদেশে থাকতে। যাদবপুরে পড়াতে ঢুকলেন অমিয়, অলোকদার সঙ্গে তাঁর দেখা হোতো।

সেটা ১৯৫৯। ইতমধ্যে দেশে কত কি ঘটেছে, অলোকদার জীবনে নানান ওলট পালট হয়েছে। আমি দূরে থেকেছি, কিন্তু গল্পগুজব— সত্যিমিথ্যে— এটা সেটা কানে এসেছে, নিজের জীবনেও অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিলো। সত্তরের দশকে দেশে ফিরে যাদবপুরে শিক্ষকতা করার সময়ে দেখেছি ক্লাসের পরে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা শঙ্খদা আর অলোকদা দুজনে পায় হেঁটে কলকাতা চষে বেড়াতেন, ময়দানে বসে চিনেবাদাম খেতেন আর তাঁদের গল্প কোনোদিন ফুরোতে চাইতো না। এত কিসের গল্প ছিল ওঁদের? অনেকগুলো দশক গড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, দুজনে দুই মহাদেশে, তবুও হিংসে হবার মতো সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আজও বজায় আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

না, অন্যায় কথা বলবো না, গোপ্পে মানুষ, কাছে গেলে আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করতেন অলোকদা। এখনও করেন। বইপত্তরের, মানুষজনের। আড্ডা দিতে সিদ্ধরসনা ব্যক্তি তিনি, অনেক চুটকি গল্প তার ঠোঁটের ডগায়। রঙ্গরসের অভাব হয় না, তাঁর সব বাক্যেই থাকে নতুন নতুন, চটজলদি তৈরি-করা সদ্যোজাত শব্দ, আর একটু কৌতুকের মোচড়। কখনো চিমটি, কখনো আদর। কোনো কথা তো সোজাসুজি বলবেন না, সবই সাজিয়ে গুছিয়ে সালংকারে বলা চাই। আর, খালি খ্যাপানো! কিন্তু রঙ্গভঙ্গ করলেও ঠাট্টাচ্ছলে কাউকে হেয় করা, আঘাত করা তাঁর স্বভাবে নেই, যে ত্রুটি তিরিশের দুয়েকজন উচ্চস্তরের বাঙালি কবির চরিত্রে ছিল বলে শুনেছি। সেসব তো ঠাট্টা-ইয়ার্কি ছিল না, তাকে বলে মান-হনন। তবে হ্যাঁ, আমাদের অলোকদার একটা মহৎ দোষ আছে, দোষ-ধরার উলটোটি। গুণ-ধরা। কিছু পছন্দ হলে মুখের ওপরে প্রশংসা করেন এমনভাবে, যাতে মনে হয় ঠাট্টা করছেন। বাগদেবী তাঁর জিবের ডগায় বন্দিনী, আদেশ মাত্রেই অভিনব ছন্দে নৃত্যচপলা হন। অতি মুগ্ধ হয়ে পড়ে অলোকদা অতি প্রশংসা করে ফেলেন তো, আন্তরিক হলে কি হবে, আমার মতন বোকা লোকেদের কানে সেটা ব্যাজস্তুতির মতো শোনায়। সন্দেহ ঘোচে না, কী রে বাবা, প্রশংসা তো? না নিন্দে? এই কবির বাচনভঙ্গির ঢং-এ নিজেকে বড়ো সামান্য মনে হয়, মাঝে মধ্যে সংশয়ে ভুগি, দাদার মুখের ভাষাটি ঠিক ঠাক বুঝেছি তো? অথচ উনি নির্মম প্রকৃতি বলে তো শুনিনি! তবে? তাহলে বোধ হয় গুণগানই করছেন! ওইখানেই তাঁর মজা পাওয়া। ওই আমাদের একটু প্রাথমিক চমক লাগিয়ে দিয়ে। ধাঁধা লাগানো বাক্যটি নিয়ে আরেকবার ভাবলেই মানেটা স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, মানুষ জন্ম নিয়েছো, অত সহজে

পর পাবে? লেখালেখি করছো, ভাষা নিয়ে খেলতে চাও? খ্যালো তবে। তোমাকে ভাবতে হবে। ওটাই তোমার মনুষ্য পরিচয়।

অথচ পড়ানোর বেলায় বিন্দুমাত্র অস্বচ্ছতা ছিল না। আমাদের এম.এ. পরীক্ষার আগে আমরা দলবলে পাত্তাড়ি বগলে অলোকদার বাড়িতে ধাওয়া করতুম বাংলার অংশটা ভালো করে পড়ে আসতে। খুব যত্ন করে পড়াতেন অলোকদা, অসামান্য শিক্ষক তিনি। সন্দেহ নেই আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে একজন। খুব দুঃখ আমার যে তাঁর কাছে বেশিদিন পড়ার সুযোগ পাইনি আমি। নিজে পড়াশুনো করা, আর অন্য কাউকে পড়াশুনো করানো, দুটো তো এক নয়? অলোকদা দুটোই পারতেন। এমন করে পড়াতেন, ঠিকমতো নোট দিতে পারলে, বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত প্রশ্নপত্রের যে কোনো বিষয়ে লিখতে বসলে, মোক্ষম উদাহরণের পঙ্‌ক্তিগুলি পর্যন্ত অলোকদার নোটস থেকে অনায়াসে তুলে দেওয়া যেতে পারতো। মন দিয়ে ওঁর কাছে পড়া শুনলেই বিনা পরিশ্রমে দারুণ রেজাল্ট! শুধু কি লেখাপড়া? ওঁদের সেই বাগানঘেরা, বারান্দাওলা, একতলা বাড়ি ছিল আদরের কুঞ্জবন। মাসিমা এবং মেসোমশাই দুজনেই প্রবল স্পেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন, মেসোমশাই গল্প করতেন, মাসিমা খাওয়াতেন জলখাবার তৈরি করে। আশেপাশে ছোটো ছোটো ভাই বোনেরা উড়ে বেড়াতো ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো। ছোট্টো বোন কিটি, আর ভাই বুলবুলের সঙ্গেই বেশি ভাবসাব ছিল আমার, পরে বিশেষ করে বুলবুলের সঙ্গে। কিটি হয়েছে দাদার মতো অধ্যাপক। দিল্লিতে পড়ায় সে। বুলবুল থাকে দাদার পদচ্ছাপ অনুসরণ করে, জার্মানিতে, সেখানকার সামাজিক নাগরিক নানা দায়িত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত সে। তার মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক বউটির তুলনা হয় না, আমি তাকে ডাকি, পাখি বউ। সেও, ট্রুবার্টার মতই, জার্মনির মেয়ে। অলোকদা তাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য। দাদার ওপরে জোরজবরদস্তি করে তাঁর নিজেরই চিকিৎসাটুকুও করানোর চেষ্টাকে দুঃসাহস মনে হয় ওদের। এমন ভয় পাইয়ে রেখে দিয়েছেন তাদের আমাদের ঋষিতুল্য অলোকদা! বুলবুল বাল্যে ছিল খেলোয়াড়, এখন হয়েছে কবি। দাদার সুযোগ্য ভাই। দাদা বিদেশে থাকতে বুলবুল দেশে বড় হচ্ছিলো। প্রথমে সাইকেলে, পরে জানি না কার মোটর বাইক নিয়ে খুশিমতো আসা যাওয়া করতো আমাদের বাড়িতে। তাই চিঠিপত্রে আমি চিরদিনের অলস হলেও (পত্রপটু অলোকদার ঠিক বিপরীত স্বভাব আমার)। বুলবুলের দেশে এবং বিদেশে থাকাকালীন তার মাধ্যমে অলোকদার সঙ্গে আমার পরোক্ষ যোগ ছিল সব সময়েই। ভাই বোনেদের কাছে তাদের 'দাদা' তো ঈশ্বরের সমান। আর দাদার কাছে মা বাবা ভাই। এত শ্রদ্ধা করার শক্তি, এত ভালোবাসার শক্তি আছে ওঁদের পরিবারে।

অলোকদা ছিলেন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের কনিষ্ঠতম, কিন্তু সবচেয়ে নিপুণ শিক্ষকদের অন্যতম, একাধারে জ্ঞানী (পণ্ডিত) গুণী (কবি) আর অ্যাড্ডাবাজ। নিত্যনতুন শব্দ সৃষ্টিতে দড়, অলোকদার বাকশিল্পে দক্ষতা অসীম, পড়ানোর সময়ে সুবিধাই হতো তাতে। কিন্তু অলোকদা বেশিদিন থাকেন নি তুলনামূলক সাহিত্যে, বাংলা বিভাগে চলে গিয়েছিলেন। যদিও সারাটা জীবন কাটাচ্ছেন জার্মানিতে বাংলা পড়িয়ে নয়, তুলনামূলক বিশ্ব সাহিত্যের কাজ করেই, সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ দর্শন নিয়ে, অনুবাদ নিয়ে। তাঁর ভুবন তো রবীন্দ্রনাথ আর গ্যয়টেকে নিয়েই শুধু নয়? অলোকদার সাহিত্যের কথা, তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলার জন্য অনেক জন আছেন, আমি আমার কবিতা পড়ার কথাটুকুনি কেবল বলি।

আমার চোখে অলোকদার কবিতার চাল দিনে দিনে বদলেছে। প্রথমে তিনি এসেছিলেন

সকলের কবি হয়ে। প্রথমদিকের বইগুলির পাঠক হতে পারেন এখনও সকলেই, যাঁরা কবিতা পড়েন। তার পরে অলোকদা হলেন কবিদের কবি। সেই কবিতার রসগ্রহণে সক্ষম হলেন তাঁরা, যাঁরা নিজেরাও কবিতা লেখেন। তার পরের ধাপের কবিতার পাঠক হলেন তাঁরা, যাঁরা কবিতা পড়ান। ক্রমশ অলোকদা হয়ে উঠেছেন বিদ্বজ্জনের কবি। আমার এই রকম মনে হয়েছে, অন্য পাঠকের অন্য কিছু মনে হতেই পারে। আমি কিন্তু চাইবো অলোকদা আবার চাল বদল করুন, এবারে আর বিদ্বজ্জন নয়, আবার কবিতা প্রিয় মানুষদের জন্য কবিতা লিখুন।

আমরা, অলোকদার ছাত্রেরা, যতক্ষণে শিক্ষক হয়ে উঠেছি, তিনি ততদিনে বাংলা বিভাগে সরে গিয়েছেন, এবং আমি দেশে ফেরত আসতে আসতেই প্রায় তিনি দেশ ত্যাগ করে সটান জার্মানিতে। তবুও মাঝে মাঝে অলোকদা ট্রুবার্টাকে নিয়ে দেশে এলে দেখা হত, আর মা বাবার কাছে তিনি নিয়মিতই আসতেন, যতদিন না ছেলে-বউমা মিলে মা-বাবা দুজনকেই জার্মানিতে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন। এইদিক থেকে ট্রুবার্টার মতো স্নেহশীলা, কর্তব্যপরায়ণা পুত্রবধূ যে-কোনো শ্বশুরগৃহের স্বপ্নলব্ধ প্রাপ্তি। ওঁরা দেশে এলে, সুনীলের বাড়িতে আড্ডা হয়, কখনো আমাদের বাড়িতে, আর তাঁদের নিজেদের বাড়িতে তো বটেই। তা ছাড়া আগে আগে দেশে এলে তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো আড্ডা ফ্যাকাল্টি ক্লাবঘরেও মাঝে মধ্যে দেখা হত। অসুবিধে নেই। আড্ডার জন্যে চাই চেয়ার, টেবিল, চা আর বন্ধু। আমরা সবাই থাকতুম, উপরি ছিল টোস্ট, অমলেট, ঘুগনি, সিগারেটের ধোঁয়া, নিঃসীম সঙ্গতৃষ্ণা। রাজনীতি, পরনিন্দা তো ছিলই, কে কোথায় কী লিখছেন, কার কোন নতুন বই বেরুচ্ছে, কে কী পড়ছেন, সিনেমা, থিয়েটার, কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন, কখনো ছেঁড়া ছেঁড়া গান, আর প্রবল বিতর্ক ছিল সেই অতি সহজ আড্ডার উপকরণ। এবং প্রতিদিনই মনে হত আড্ডাটা শেষ হল না। অতি অল্প হইল। সে তো বহুকাল আগের কথা। সেই আড্ডার সেই আমরা কি আজ আছি?

এতে সন্দেহ নেই, যে এই একুশ শতকেও অলকদা কলকাতায় এলে কবিতার কলকাতা আরেকটু রঙিন হয়ে ওঠে, লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ সম্পাদকেরা নতুন করে উদ্দীপিত হন। উৎসাহ পান। সাড়া পড়ে যায় অল্পবয়সীদের মধ্যে। 'অলোকদা এসেছেন' রটিয়ে দেয় বাতাস। অলোকদা যে নবীন প্রজন্মকে উৎসাহ দানের কাজে সিদ্ধহস্ত, তরুণ কবিদের তিনি বহুদিন ধরেই নানাভাবে উজ্জীবিত করে আসছেন। এই যেমন মনে পড়ছে, সুভাষ আর দিলীপের 'হীনযান' পত্রিকা বের করার সময়ে অলোকদার অকুণ্ঠ সহযোগিতা। নামকরণও যতদূর মনে পড়ছে, তাঁরই। তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়। সুভাষ আজ নেই, কিন্তু এখনও তাঁর পরিবারের সঙ্গে স্নেহের দায়িত্বের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন অলোকদা। আমাদের মধ্যে অনেকে তো শহরে থেকেও ধরাছোঁয়ার বাইরে, অলোকদা কিন্তু সমুদ্রপারে সুদূরে থাকলেও নাগালের বাইরে নন। তরুণরা চিঠি লিখলে জবাব দেন, লিটল ম্যাগাজিন কবিতা চাইলে কবিতা পাঠান। স্নেহভরে বই উৎসর্গ করেন ছোটোদের। আমাকেও তিনি আদর করে একটি কবিতার বই উৎসর্গ করে ধন্য করেছেন।

অলোকদাকে প্রথম দেখেছি তাঁর কিশোরকালে, সম্ভবত 'ভালো-বাসা' বাড়িতেই। কচি কিশোর চেহারাটি মনে আছে। আমার বাবার সম্পাদিত 'পাঠশালায়' তাঁর কবিতা বেরিয়েছিল বলে আমার ধারণা। অল্প বয়সে শান্তিনিকেতনেও দেখেছি তাঁকে। সেই একই কিশোরসুলভ লাজুক, সুতনু চেহারা তাঁর বজায় ছিল বহু বৎসর অবধি। (লাজুক যদিও মন প্রকৃত প্রস্তাবে!)

ইতিমধ্যে জীবনে নানান ওঠাপড়া, দেশত্যাগ, চাকরি বদল, ভারি অসুখবিসুখ, শোক তাপ গিয়েছে অলোকদার ওপর দিয়ে। দিল্লিতে সকালবেলায় অফিসে বেরুনোর সময়ে মায়ের চোখের সামনে ছোটো ভাই-এর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু, পুত্রশোকার্ত মা বাবার মনের শুশ্রূষা, অবসর গ্রহণের পরে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনই নিতান্ত অসময়ে প্রাণাধিকা ট্রুবার্টার প্রয়াণ। মেসোমশাই চলে গিয়েছেন, এক সময়ে মাসিমাও। কলকাতার কেল্লা সামলানোর ছোটো ভাই চন্দনও হঠাৎ বিদায় নিয়েছেন বিনা নোটিসে। অবশেষে বুঝি এতদিনে অলোকদার এক মাথা ঝাঁকড়া চুল রং ঝরিয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন পরে আমাদের আর সকলের মতো তাঁরও শরীরে কিছু বয়সোচিত বদল এসে জুটেছে। তা সত্ত্বেও খুব ইদানীং তাঁর ঝাঁকড়া শুভ্রকেশ ছবি পত্র পত্রিকায় দেখতে পেলে আমি অবাক হয়ে যাই, ভুরু কুঁচকে দেখি, ইনি কে? কখনোই চিনতে পারি না। চুলের রং যেমনই হোক, অলোকদা তো 'আমাদের পাকবে না চুল গো'-এর দলে। চির নবীন মানুষ। অলোকদা মুখ খুললেই তার প্রমাণ মিলে যাবে। হতে পারে আপাতকঠিন বাক্যবন্ধ, তোমাকে প্রতি বাক্যে মনোনিবেশ করতে হবে অলোকদার সঙ্গে কথা কইতে বসলে, কিন্তু সে কথা বলাবলি তারুণ্যে ভরা, হাসিখুশিতে উচ্ছল।

আমি শুধু একবারই গিয়েছিলুম ট্রুবার্টা আর অলোকদার জার্মানির সংসারে। ১৯৭৪ মার্চ মাস। আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসভার কার্যকরী সমিতির একটা মিটিং সেরে জার্মানিতে গিয়েছি হাইডেলবার্গে লোথার লুৎসের আমন্ত্রণে, আর উলমে অলোকদার সঙ্গে দেখা করতে। আমার সেই যাওয়া গল্প আমি আগেও কোথায় যেন লিখেছি, মনে পড়ছে না। ড্যানিয়ুব নদীর তীরে ছোটো শহর উলম। সেখানেই ট্রুবার্টার উচ্চপদের সরকারি চাকরি শিক্ষাবিভাগে। নদীটার নামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। 'ব্লু ড্যানিয়ুব' সুরে বাইরেও। হাঙ্গারির ড্যানিয়ুব নদী, সেই নদীর মতো নদীটি, যার এপারে সমতলে পেস্ট নগরী, ওপারে পাহাড়ে বুদা নগরী, দুইয়ে মিলে বুদাপেস্ট। সে হল ঝলমলে দ্বীপ সমেত ব্যস্ত নদী, বুদাপেস্টেই ড্যানিয়ুবের একটি দ্বীপে, অপেরা হাউসে আমি 'কারমেন' দেখেছিলুম একদা। সেই নদী এখানে দ্যাখো কেমন কৃশকায়া, দীন হীন মূর্তি, নালার মতো দুই ধারে পাড় বাঁধানো, যদিও স্বচ্ছ নীল জল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই নাকি সেই প্রসিদ্ধ জলধারা যা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মাটিকে উর্বর করতে করতে এগিয়েছে। প্যারিসের 'স্যেন' নদীকে দেখেও এমনই হতাশ লেগেছিল গঙ্গাযমুনা গোদাবরীর দেশের মেয়ের। চোখে ধরেনি। যেমন করুণ লাগে অক্সফোর্ডের টেমসকে দেখে!

অলোকদার উলম শহরের বাড়িটিতে গিয়ে খুব ভালো লেগেছিল, এমন সুন্দর করে দিশি জিনিসে সাজানো, বসার ঘরে পিতলের ঘড়াগুলি ঝকঝক করছে। ট্রুবার্টা অনন্যসাধারণ গৃহিণী ছিলেন, কলকাতায় এবং জার্মানিতে, দু জায়গাতেই শ্বশুর আর শ্বশ্রূমাতার এত যত্ন করেছেন। যোগ্য সন্তানের মতোই তাঁদের আদর করে, বকে, ধমকে ওষুধ খাইয়ে, খাবার খাইয়ে, নিয়ম মানিয়ে চলতেন। তাঁদের আয়ুবৃদ্ধি হয়েছিল ট্রুবার্টার তত্ত্বাবধানে। মেসোমশাই-এর সংগৃহীত পাতার আর ফুলের পেস্টিং-এর অ্যালবাম কত সযত্নে সগর্বে দেখিয়েছেন আমাকে মেসোমশাই। আমার ধারণা সে সব সম্ভবত নিজের আগ্রহে আর ট্রুবার্টার উৎসাহেই করতে পেরেছিলেন। বয়েস বেড়ে যাবার পরে আমাদের শরীরের নানা সমস্যা হয়, হাঁটু ব্যথা, শাড়িতে পা বেধে যায়, হাঁটাচলা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই সত্তরোর্ধ্ব মাসিমাকে নির্দ্বিধায় সালোয়ার কামিজ পরিয়ে, চালু

করে, সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে সিনেমায় ঘুরেছেন অলোকদা আর ট্রুবার্টা। এঁদের কথা বলে শেষ করা যায় না। অলোকদার কলকাতার বাড়িতে যে-ই যাক, ট্রুবার্টা তাকে মাসিমার সংসারের ধারা অনুযায়ী ঘরে তৈরি দিশি কিংবা বিলিত একটু কিছু জল খাবার না খাইয়ে ছাড়তেন না। হতে পারে নারকোল নাড়ু, হতে পারে চিজ পাফস।

সেটা সত্তরের গোড়ার দিক, তখনো বুলবুল জার্মানিতে যায়নি। এর অনেক বছর পরে বোধ হয় নব্বই-এর শেষে, কিংবা একুশ শতকের শুরুতে, মনে নেই কখন, মিউনিখ কিংবা ফ্রাংকফুর্ট থেকে? নাকি দু'বারই গিয়েছিলুম বুলবুলের কাছে, তার আর পাখি-বউ-এর সংসারে? মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ে, সেখানেও খুব ভালো লেগেছিল। পাখি-বউ ঠিক ট্রুবার্টার মতোই লক্ষ্মী বউ হয়েছে। সে আরও এক কাঠি। বাংলায় শ্যামাসংগীতও গেয়ে শোনাতে পারে। ওরা কালীভক্ত বলেই হয়তো ওদের বারান্দায় টবে শীতের মধ্যেও জবাফুল ফুটেছিল। সেবারে কিন্তু অলোকদার সঙ্গে দেখা হয়নি। শেষবারে যখন যাই ট্রুবার্টা তখন আর আমাদের মাঝখানে নেই। অলোকদা নিজেও ভালো ছিলেন না, যারপরনাই বিমর্ষ ও অসুস্থ ছিলেন। ওই সময়ে অলোকদা ছিলেনও না তাঁর নিজের শহরে। আমার সঙ্গে সেবারে সুনীলও ছিলেন, মিউনিখ বুক উইক থেকেই ওদের বাড়িতে গেলুম বোধ হয় আমরা। নাকি তার কয়েক বছর আগে, ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ার থেকে? সেবারেও জার্মানিতে বাদলবাবু আর সুনীল ছিলেন। মিউনিখ থেকে সুনীল আর আমি একসঙ্গে বুলবুলের বাড়িতে গিয়েছিলুম। এই লেখা যেদিন শুরু করেছিলুম, পুজোর ঠিক আগে, আমাদের মাঝখানেই সুনীল ছিলেন কলকাতা শহরে। আজ, লেখাটি শেষ করছি যখন, সুনীল আর নেই।

আমি যেদিন ভিয়েনা থেকে ট্রেনে রেগেন্সবর্গ হয়ে অলোকদাদের কাছে গেলুম সেদিন ট্রুবার্টার অফিস ছিল, পরের দিনও। কিন্তু দুদিনই অলোকদার ছুটি ছিল। অলোকদা আর আমি সারাদিন আর সারা রাত্তির ধরে শুয়ে বসে গড়িয়ে অজস্র চা খেয়ে বাংলায় পুরোনো দিনের গল্প করেছিলুম। ট্রুবার্টার সামনে তখনও বাংলায় কথা বলা হতো না। পরে অবশ্যি তিনি নিজেও চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। অলোকদার সঙ্গে গল্প হচ্ছিলো, শান্তিনিকেতনের নয়, জার্মানিরও নয়, কলকাতার গল্পই। প্রধানত যাদবপুরের, আর অনেকখানি জুড়েই ছিল 'কবিতা' পত্রিকা, আর তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আর বুদ্ধদেব বসু। সকালে আমি ফেরত রওনা হয়ে গেলুম ইংলন্ড, ট্রুবার্টা তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিলেন স্টেশনে, অফিসে যাবার পথে। সেদিন রাত্রেই খবর এল বুদ্ধদেব বসু মারা গেছেন ওই ১৭ মার্চ, ১৯৭৪, যে তারিখটায় আমি আর অলোকদা ড্যানিয়ুবের তীরের ছোট্ট একটি শহরে সারারাত বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণে বিনিদ্র নিশিযাপন করেছিলুম। সেই ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন। ওই তারিখেই বুদ্ধদেব বসু আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। খবরটা শুনে প্রাথমিক ধাক্কা কমে যাবার পরে আমার মনে হল, তিনি আমাদের খুব কাছাকাছিই ছিলেন সেই রাতটা।

সেই রাতটা অলোকদার আর আমার জীবন থেকে কোনেদিন মুছে যাবার নয়।

১৮ অক্টোবর ২০১২

বাঃ বুম্বা

বাপ রে কী ডানপিটে ছেলে!

আমরা গাড়ি করে হিমালয়ে যাচ্ছি, দিল্লি থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হব হরিদ্বার, তারপরে আস্তে আস্তে উঠব। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাচ্ছি। বুম্বাদের বাড়িতে উঠেছি কলকাতা থেকে গিয়ে, আমি, পিকো আর আমাদের এক ছাত্র, রঞ্জন মিত্র। বুম্বা তখন বছর দশেকের, আমার সঙ্গে দারুণ ভাব ছিল ওর। আমাকে এনে ওর কবিতার খাতা দেখাত, ইস্কুলের গল্প শোনাত, ছবি এঁকে এনে দেখাত। আর গান শোনাত। হ্যাঁ, এই সব কিছুই পারত ছোট্ট বুম্বা, আর আমাকে চমকে দেওয়ার মতো ভালো করেই পারত। শিখত ধ্রুপদি সংগীত, কিন্তু গাইতে বললেই গেয়ে শোনাত রবীন্দ্রসংগীত। নইলে আবার তানপুরা-টুরা লাগবে। বুম্বা ছিল ভারি চঞ্চল, এক মিনিট স্থির হয়ে বসত না যদি না সে নিজের মনে কিছু করে। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনেই সে নেচে উঠল, 'আমিও যাব! আমিও যাব!' আমিও খুব রাজি ওকে নিতে। গাড়িতে জায়গা আছে। কিন্তু দাদা বেঁকে বসলেন, 'না, সে হয় না, ও ভারি দুষ্টু ছেলে, তোমার কথা শুনবে না, কোথায় খাদে-টাদে পড়ে যাবে, সে ভারি বিশ্রী হবে। আমি অনুমতি দিতে পারছি না। তুমি যাও চারধাম ঘুরে পুণ্য করে এসো, বুম্বাটা আর একটু বড়ো হলে যেতে দিতাম।' বুম্বা সরু লম্বা টিংটিঙে ফর্সা ফড়িঙের মতোন, খালি লাফাচ্ছে। এক মিনিট স্থির থাকে না। কেবল যখন ও কিছু করে, লেখে, কি আঁকে, কি নারকোলের কাঠি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়, তখন একেবারে চুপ। ওর কল্পনাশক্তি দেখে অবাক লাগত। খুব অন্যরকম বাচ্চা বুম্বাটা, লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী তো বটেই, প্রতিবার প্রথম হয় বলে সেন্ট কলম্বাসের মাস্টারমশাইরা ওকে খুব স্নেহ করেন। বিচিত্র দিকে ছড়িয়ে আছে ওর প্রতিভা। খুব ভালো করে পাশ করে বুম্বা স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গেল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন বাদে লস এঞ্জেলেস-এর এক কাগজে ছবি বেরুল, উঁচু ভারার ওপরে চড়ে একজন ভারতীয় ছাত্র সাতদিন ধরে কলেজের একটা বিল্ডিং-এর দেওয়ালে মুরাল আঁকছে। সে-ছাত্রের এটাই প্রথম বছর স্ট্যানফোর্ডে। সেই বালকটি আর কেউ নয় আমাদের বুম্বা!

এইভাবে চলল বুম্বার পড়াশুনো। স্ট্যানফোর্ডে গ্র্যাজুয়েশনের পরে অক্সফোর্ডে গেল পিএইচ.ডি.-র গবেষণা করতে।

আমি সেই সময়ে অক্সফোর্ডে আছি একটা কাজে, বুম্বা এসে হাজির আমার আসার খবর পেয়ে। আমরা একসঙ্গে মাঝে মাঝে কফি খেতুম মাঝে মাঝে লাঞ্চ, আর অনাবিল আড্ডা! একদিন, আমি সেদিন প্যাক করছি, এবারে দেশে ফিরব, বুম্বা এসে হাজির একটা মেয়েকে নিয়ে।

'কী রে বুম্বা, এতদিনে গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করাচ্ছিস?'

'আরে না না ও তো অমৃতা, আমার বন্ধু, তোমার বন্ধুর মেয়ে। ওর বাবা ইকনমিস্ট ডক্টর মনমোহন সিং, মা গুরশরণ কৌর। ও বলল, তোমায় চেনে, ছোটোবেলাতে দেখেছে।'

খুব চমৎকার মেয়ে অমৃতা, আমরা সবাই মিলে বাইরে গিয়ে চা কফি কিছু একটা খেয়েছিলুম সেদিন। খুব জমিয়ে আড্ডা হয়েছিল। বুম্বা উচ্ছ্বসিত হয়ে তার কাজের কথা বলছিল।

মাঝে হঠাৎ একবার কলকাতাতে এসেছিল বুম্বা, আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে গিয়েছিল। ও চলে যাবার পরে মনটা আলোয় ভরে উঠেছিল আমার। বিষয় যদিও ক্যান্সার। বুম্বা এক মনে আমাকে বোঝাচ্ছিল ক্যান্সার নিয়ে ও কেন কাজ করতে চায়, কত কিছু করার আছে। বলছিল রোগীদের কথা, রোগের কথা, আরোগ্যের প্রসঙ্গ। ওই সময়ে ২০০০/২০০১ নাগাদ লেখা আমার 'শনি রবি' উপন্যাসে ওর ছবি ঢুকে গিয়েছিল খানিকটা। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সেই আদর্শবাদী ডাক্তার যুবকের নাম দিয়েছিলুম সিদ্ধার্থ। রোগের রিসার্চে তার আত্ম-উৎসর্গিত ঐকান্তিক মনোনিবেশ, কিন্তু গল্পের যুবকের গবেষণার বিষয় ক্যান্সার ছিল না, ছিল স্নায়ুরোগ।

পিএইচ.ডি.-র পরে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণায় ব্যস্ত ছিল বুম্বা। আমি সেই যুগে ওর বস্টনের (মানে কেম্ব্রিজের) বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। তখনও ওর বিয়ে হয়নি।

এখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে বুম্বা। বুম্বা ভালোবেসে বিয়ে করেছে। ওর গুণী বউটি মার্কিন দেশের চীনে মেয়ে, প্রসিদ্ধ ভাস্কর, ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের ফেলো হয়েছিল সে, ওদের দুটি কন্যে আছে, রিয়া আর লীনা তাদের নাম। দিল্লিবাসী ঠাকুরদা ঠাকুমার তারা প্রাণ।

একদিন দাদা ফোন করে বললেন, 'তোমরা শুনলে খুব আনন্দ হবে তুমি তো বুম্বাকে ভালোবাসো, বুম্বার সেই ক্যান্সারের ওপরে বইটা শেষ হয়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে, নিউ ইয়র্ক টাইমসের টেন বেস্ট বুকস-এর তালিকায় আছে, বেস্ট সেলার হয়েছে, হুড় হুড় করে বিক্রি হয়ে চলেছে।' আমি তো শুনে আহ্লাদে আঠারোখানা! আমি জানতুম, বুম্বা এ-রকমই।

আবার একদিন দাদার ফোন। এবারে আরও উত্তেজিত। বললেন, 'নবনীতা, খুব আনন্দের খবর, ওই বই পড়ে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বুম্বাকে সস্ত্রীক ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ওরা যাবে নিউ ইয়র্ক থেকে হোয়াইট হাউসে ডিনার খেতে। ভাবা যায়?' সত্যি সত্যি ভাবা যায় না, বই লিখে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডিনার? বলা বাহুল্য খুবই গর্ব হল, এমন একটা ছেলে আছে আমাদের ঘরে!

১৯ এপ্রিল আমার বাবার মৃত্যুদিন, মনটা খারাপ ছিল, থাকেই প্রত্যেক বছর। দাদার ফোন এল। দাদার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা। বললেন, 'এখনও মিডিয়াতে ছড়ায়নি খবরটা, কাল বেরুবে। আজকেই তোমাকে জানিয়ে রাখি, তুমি ওর শুভাকাঙ্ক্ষী। বুম্বা ফোন করেছিল। বলল, ওর বইটা পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছে।' আমার শুনে মনের ভাবটি ঠিক কেমনতরো হল তা আর আপনাদের কাছে বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না। সারারাত গুর গুর করে আনন্দ হল বুকের মধ্যে। আর মনে পড়েছিল ছোট্ট বুম্বার বেড়ে ওঠার ছবিগুলো। হাফ প্যান্টের তলা দিয়ে বেরিয়ে থাকা লম্বা লম্বা ঠ্যাং, ঝাঁকড়া চুল কপালে পড়ছে বার বার, সরু লম্বা-আহ্লাদে-ছটফটে ছেলেটা ক্রমে কেমন শান্ত, সুপুরুষ, সুপণ্ডিত যুবক হয়ে উঠল। বিয়ের পরে দেখা হয়নি বুম্বার সঙ্গে। এখন সে স্বামী এবং পিতা।

পরের দিন সকালে সব কাগজে পাগলার ছবি, আর খবর। ড. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের

পুলিৎজার প্রাপ্তি। এই নিয়ে ভারতে চারবার, তার মধ্যে বাঙালিকে দু-বার। ঝুম্পা, বুম্বা। দুজনেই বামুন, দুজনেই বঙ্গসন্তান, দুজনেরই বইয়ের নামকরণে 'ম্যালাডিস' আছে, আবার তরুণ বয়েস। এবারে আমিই দাদার বাড়িতে ফোন করি, 'চন্দনা, বুম্বার নম্বর দাও।'

চন্দনা বললে, 'দিচ্ছি, কিন্তু ও আজ ফোন বন্ধ করে রেখেছে বলল, সবাই ফোন করছে তো? জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। আজ ওকে ফোন করা বৃথা।' আমি ভাবলুম, ঠিক আছে তার চেয়ে ওকে একটা ই-মেইল করে দিই। কোনোদিন তো পাবে। অবিশ্যি সেও তো এখন একই। অন্তহীন অভিনন্দন এসে জমা হবে। বুম্বা নিশ্চয়ই এখন এত মেল খুলতে সময় পাবে না। দুষ্টু পাগল বুম্বার এহেন সাফল্যের কাহিনিতে দাদা আর চন্দনা যেমন অবাক তেমনি খুশি। আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি, ওর যেমন উজ্জ্বল বহুমুখী প্রতিভা, মন দিলে ওর পক্ষে সবই সম্ভব। ইচ্ছে করলেই ও এখনও হতে পারে চিত্রশিল্পী, কিংবা কবি, গায়ক, কিংবা হাতের কাজের জাদুকর। হয়েছে সবচেয়ে জরুরি জিনিস, ভালোমানুষ আর ভালো ডাক্তার। আর তার পাণ্ডিত্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে, হাতে তুলে নিয়েছে ঝকঝকে, আর সরল কলম, যার নিবের টান স্পর্শ করবে সবার হৃদয়ে। ঈশ্বরের করুণা আছে ওর ওপরে।

আমি কিন্তু এখন বসে থাকব তোর নোবেলের পথ চেয়ে আর দিন গুনে। শুনছিস, পাগলা বুম্বা?

২১ এপ্রিল

আমার গার্জেনরা

ইংরেজিতে কী সুন্দর একটা কথা আছে? 'Once upon a time...' এই শব্দগুচ্ছ দিয়েই সব রূপকথার শুরু। বাংলাতে কিন্তু রূপকথা শুরুর ফর্মুলা 'কাল' দিয়ে তৈরি হয় না, 'স্থান' দিয়ে, কিংবা 'পাত্র'। 'এক দেশে এক...' কিংবা 'এক যে ছিল...'। ছোটোবেলায় এত ভেবে দেখিনি, কিন্তু 'Once upon a time...' শব্দগুচ্ছটি আমাকে যেমন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত, 'এক দেশে এক...' কিংবা 'এক যে ছিল...' এদের মধ্যে সেই রহস্যময়তা ছিল না। এখন তো সত্যি সত্যি 'Once upon a time' বলে বাক্য শুরু করার অধিকার পেয়েছি আমি, স্মৃতিমেদুরতার কল্যাণে কথাগুলোয় আরও মোহিনী মায়া লেগেছে। টের পেয়ে গেছি 'কাল'ই সর্বপ্রথম; তা'র দয়াতেই 'স্থান' আর 'পাত্র'। সময়, তুমি আমাকে রাখলে আছি, না রাখলে নেই। স্মৃতি যেমন তোমার সম্পত্তি, স্বপ্নও তেমনই তোমারই। যে-সময় এসে চলে গিয়েছে, যার বিরহে আছি, সে স্মৃতি। আর যে-সময় এখনও আসেনি, যার প্রতীক্ষায় থাকা, সেই তো স্বপ্ন। এই দুইয়ের মাঝখানে ছোট্ট হাইফেন হয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে বর্তমান। এখনও বনে পাহাড়ে নদীকূলে বিচরণ করছে আমার স্বপ্নেরা, ধরা পড়েনি জীবনের ঝাঁপিতে।

ঝাঁপিটা খুললেই ফোঁস করে ফণা তুলবে কুণ্ডলীপাকানো স্মৃতি। কিন্তু ফণা তুললেই তো সে কালনাগিনী হয় না? অন্যরাও তো আছে ঝাঁপিতে— জরির ফিতে জড়ানো দীর্ঘ বিনুনির মতো ঝলমলে সুন্দর, এলায়িত, ছন্দোবদ্ধ— আর নির্বিষ কিছু স্মৃতি। সেদিন এক আনন্দ উৎসবে গিয়েছিলুম— একজন হাসিমুখ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'নবনীতাদি আমাকে চিনতে পারছেন?'— এই প্রশ্ন আমি প্রায়ই শুনে থাকি এবং লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে বাধ্য হই— 'আপনি ঠিক কে বলুন তো?' এই সুটবুট পরা ভদ্রলোককেও তাই বলতে হল। বেশ ভালো করে লক্ষ করেও বুঝতে পারছি না ইনি আমার ছাত্র ছিলেন, না লিটল ম্যাগাজিন বের করতেন, না বিলেতে কখনো নেমন্তন্ন খাইয়েছেন, না এঁদের কোনো ক্লাবে-পাঠাগারে আমি গিয়েছি, কিংবা যাইনি। ভদ্রলোক বুঝলেন আমি চেষ্টা করছি, সম্ভবত আমার মুখের ভাবখানা তখন অঙ্ক পরীক্ষায় বসে প্রশ্নপত্র-পাঠের মতন হয়েছিল। তিনি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'আমায় চিনলেন না? আমি তো আপনারই পাড়ার ছেলে' এই সম্ভাবনাটা একবারও মনে হয়নি। পাড়ার ছেলেদের আর চেনবার তো উপায় নেই। গোটা পাড়াটাই বদলে গেছে। আমি যে-বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, এখনও সেই বাড়িতেই বাস করি— কিন্তু চারধারটা পালটে গেছে। এখন এ পাড়ায় যাঁরা থাকেন তাঁরা দশ বছর আগে অন্য কোথাও থাকতেন। আগে যারা পাড়ার ছেলে ছিল, তাই এখন পাড়ার জ্যাঠা কাকা মেসোপিসে হয়ে গেছে। তাদের কি আর চেনা যায়? তবু বলি, 'তোমার নাম কী ভাই?' আজকাল বেশ সবাইকেই তুমি বলা যায়। একে তো এটাই হল ফ্যাশন, তায় এক জ্যোতিবাবু আর অন্নদাশঙ্কর কাকাবাবু ছাড়া প্রায় সকলেই দিন-কে-দিন আমার চেয়ে বয়েসে ছোটো হয়ে যাচ্ছেন। এই ভদ্রলোক তো ছোটোই।

'নাম বললে কি চিনবেন?'

'কেন তুমি বুঝি পাড়ায় নতুন?'

পাড়াটা এখন নতুন লোকে, অচেনা মুখে বোঝাই। '—না না। আমরা পুরোনো সনাতন হিন্দুস্থান পার্ক আমরা!'

এক গাল হেসে একটু গর্ব করে ভদ্রলোক বলেন। আমরা, যারা সনাতন হিন্দুস্থান পার্কের লোক, তারা পাড়ার পুরোনো বাড়িগুলোকে কিছু চেনা ডাকনামে ডাকি— যেমন সাদা বাড়ি, লাল বাড়ি, চার নম্বর, তিন নম্বর, ন-নম্বর, ক্যালকাটা ফ্যান, পায়রা ওড়া বাড়ি, ভালোবাসা বাড়ি, ইলাবাস, তপোধাম, সুধর্মা, বুড়োদাদের বাড়ি, এন.কে. বোসের বাড়ি, বাজপেয়ীদের বাড়ি, পাঞ্জাবিদের বাড়ি, বলসায়েবের বাড়ি ইত্যাদি। (এন.কে. বোসের বাড়িটার নাম অবশ্য ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর হল জ্যোতিবাবুর বাড়ি হয়ে গেছে) ভদ্রলোক পুরোনো বাসিন্দা শুনেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন : 'তাই? কোন বাড়ির ছেলে ভাই তুমি?'

'আমি গোবিন্দকাকার বাড়ির ছেলে, দিদি।'

বলামাত্র একমুহূর্ত স্তব্ধতা।

তারপরেই সেই টাই-পরিহিত ভদ্রলোককে বুকে জড়িয়ে ধরি। সে-ছেলে আমার হৃদয়ের মাঝখানে আসল ঘণ্টাটাতে ঠিকই ঘা দিয়েছে, যেটা বাজালে বুক জুড়ে তার প্রতিধ্বনি বাজতেই থাকবে। নির্ভুল আন্দাজ। '—সাদাবাড়ির ছেলে তুমি?' তার মুখের হাসিটাও এবার দশগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে ধরে আনল। '—বললুম না, দিদি গোবিন্দকাকার নাম বললে ঠি-কই আমাকে চিনতে পারবেন? যতই ভি.আই.পি. হয়ে যান না কেন? দিদি, এই যে আমার বউ, এই আমার ছেলে।' অর্থাৎ সে-ছেলেও একটা গোপন এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল এতক্ষণ আমাকে নিয়ে। 'সাদাবাড়ির ছেলে' কিংবা 'মিনুর ভাই' না বলে 'গোবিন্দকাকার বাড়ির ছেলে' বলে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল আমি এখনও সেই পুরোনো 'পাড়ার মেয়েটা' আছি কি না। যাক, মাত্র প্রথমবারেই পাশ!

এই বউটি হয়তো গোবিন্দকাকাকে চোখে দেখেনি, কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই শুনেছে।

গোবিন্দকাকা। গায়ে ফর্সা পইতে, ফর্সা গেঞ্জি, ফর্সা ধুতি। কোমরে গোঁজা পানের বটুয়া। কাঁচাপাকা চুলে টিকি। টিকিতে গেরো বাঁধা। সাদাবাড়িতে গোবিন্দকাকা, আর আমাদের বাড়িতে আমার গুনিয়াভাই, গুণনিধি। (যার জন্যে আমার 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল' গানটি এত পছন্দ ছিল! ওতে একটি লাইন আছে, 'যদি মিলয়ে বিটি মম গুণনিধি বাঁধিব অঞ্চলে করি!') দেখতে দুজনে একই ধরনের রোগা, পাতলা, ফর্সা, পইতেধারী। কিন্তু গোবিন্দকাকা ভালোমানুষ, গুনিয়াভাই মারকুট্টে। নামেই তাঁরা বামুনঠাকুর, আসলে পাড়ার সর্বেসর্বা— হিন্দুস্থান পার্কের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ন্তা। আমরা ছোটোরা তো রাস্তায় খেলতুম! ফাঁকা মাঠ ছিল না তা অবশ্য নয় কিন্তু সময়টা ঠিক যুদ্ধের পরপরই— মাঠগুলো সব গর্তকাটা! এবড়োখেবড়ো স্লিট ট্রেঞ্চে ক্ষতবিক্ষত ছিল। সেখানে নেমে লুকোচুরি ছাড়া কিছু খেলা হত না। তবে বর্ষাকালে, জল জমলে দারুণ ফুর্তি! কোমর পর্যন্ত কাদাজলে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি করে 'নদীতে চান' করা হত। যতক্ষণ না গোবিন্দকাকা কিংবা গুনিয়াভাইয়ের নজর পড়ছে! তারপর উড়িয়া বকুনির ফুলঝুরি, 'নড়া' ধরে ডাঙায় তোলা। বিকেল বেলায় আমরা রাস্তায় খেলতুম বলে গোবিন্দকাকা গুনিয়াভাইয়ের নজর

রাখতেই হত। আমাদের রাস্তায় অবশ্য তখন গাড়ি এত চলত না। হিন্দুস্থান পার্কে তো কোনো পার্ক ছিল না? পার্ক বলতে হয় ছোটোপার্ক (ত্রিকোণ পার্ক), নয় বড়োপার্ক (দেশপ্রিয় পার্ক)। আর ছিল লেকের চিলড্রেন্স পার্কে দোলনা, স্লিপ, আর সি-স। মাঝখানে ফোয়ারাওলা ছোটোদের সুইমিং পুলটা প্রায়ই নির্জলা শুকনো থাকত। কিন্তু সেসব জায়গায় যেতে হলেও ভরসা সেই গুনিয়াভাই, নয়তো গোবিন্দকাকা। অতদূরে তো একা একা যাওয়া যায় না? (না, তখনও 'বিবেকানন্দ পার্ক' তৈরি হয়নি!) লেক মিলিটারি ক্যাম্পের ভারী ভারী ট্রাকের চলাচলের চোটে আমাদের বেচারি পাড়ার রাস্তাগুলো তখন এতই খানাখন্দে ভরতি হয়ে গিয়েছিল যে খেলতে গিয়ে আছাড় খেতুম সব্বাই, হাঁটুর কাটাটা সারছে, তো কনুই কেটে রক্তারক্তি! তখন ওই গোবিন্দকাকা কিংবা গুনিয়াভাই শূন্য থেকে উদয় হয়ে গাঁদাফুলের পাতা চিবিয়ে আমাদের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেন। মাঠ যেটুকুনি ছিল, তাতে শেয়ালকাঁটা ঝোপ, আর বিছুটিবন ভরতি।

যতই সতর্ক হয়ে খেলি না কেন মাঝে মাঝেই কারুর না কারুর বিছুটি লেগে যেত— তখন আবার সেই গুনিয়াভাই আর গোবিন্দকাকাই ভরসা-অলা হলে সরষের তেল, বেশি হলে গোবর! বিছুটির যা জ্বলুনি, গোবরে আপত্তি করবে কে? করলেই-বা শুনছে কে? কিছুদিন বাদে অবশ্য আমাদের রাস্তা থেকে বাগানে প্রোমোশন হয়েছিল। 'মণিমেলা' বসল কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়ি 'ইলাবাস'-এর বাগানে। রাস্তায় কিত কিত, বুড়ি-বাসন্তী, চোর পুলিশ, পিট্টু খেলা আর নয়; এবার শুরু ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, 'চল কোদাল চালাই', 'কাউয়ায় ধান খাইল রে' এইসব— ব্রতচারী, জারি গানের নাচ, সারি গানের নাচ। তার চেয়েও আনন্দের কথা ওখানে জামরুল আর পেয়ারা গাছে খুব ফল ধরত। জামরুল গাছটায় চড়া যেত, কিন্তু নামা যেত না। নামতে হত ডাল ধরে ঝুলে বাগচিপাড়ার দক্ষিণের ছাদে লাফ দিয়ে পড়ে। এসবে আমি তো এক্সপার্ট! আর ছিল একটা বকফুলের গাছ। রোগাপটকা গাছ হলে কী হবে? অনেক সাদা বকফুল হত তাতে। আমি পেড়ে আনতুম ভেজে খাবার জন্যে।

ওই সময়েই 'জাগৃহি' বলে একটি মেয়েদের ক্লাব হয়েছিল এই রাস্তাতে। সেখানে ছিল কয়েকটা ফলন্ত খেজুর গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালি খেজুরের দিকে চেয়ে চেয়ে বড়ো মেয়েরা বলত, 'ইস নবনীতা কী দারুণ খেজুর গাছে চড়তে পারে, আমরা কেউ পারি না। এত শক্ত খেজুর গাছে চড়া, অথচ নবনীতা কী অবলীলাক্রমে—' আর কী? অবলীলাক্রমে নয়, সমস্ত হাত-পা বুক পেট ক্ষতবিক্ষত করে, ফ্রক ছিঁড়ে ফেলে আমি খেজুর গাছে চড়তুম, ওপর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল নীচে ফেলে দিতুম। নেমে এলে আমাকে তিনটে ফল প্রাইজ দেওয়া হত। 'একটা তোর, একটা তোর মা-র, একটা বাবার।' গুনিয়াভাই জানতে পেরে একদিন 'জাগৃহি' ক্লাবে ছুটলেন। গোবিন্দকাকার মতন ভালোমানুষ তো নন গুনিয়াভাই, খুব কড়া শাসন তাঁর। অন্যায় করেছ, কি মরেছ! কেবল মুখই তো নয়, হাতও চলত যে! কান মলাটা, থাবড়াটা—! ক্লাবে উপস্থিত হয়ে গুনিয়াভাই বললেন, 'মু এমিতি মার্‌অ মারিবি সব্বকু— খজ্জরঅ খাইবাকু আউ সাধঅ হবনি—' সেই থেকে বড়ো মেয়েরা আর আমার অপূর্ব খেজুরগাছে চড়ার প্রশংসা করত না। আমাদের কারুর এত বুকের পাটা ছিল না যে, গোবিন্দকাকা গুনিয়াভাইয়ের শাসন অমান্য করব। আজকালকার মতো মায়েরা তো ঘরের বাইরে গিয়েও ছেলেপুলেদের খবরদারি করতেন

না তখন। কোনো কোনো বাড়িতে অবিশ্যি বাবা, কি বড়োদাদারা এ কাজটা করতেন। আর গোবিন্দকাকা, গুনিয়াভাই এঁরা তো ছিলেন সারা পাড়ারই গার্জেন।

গরমের ছুটিতে মাঝে মাঝে চাঁদনিরাতে আমাদের রাত্রের খাওয়ার পরেও বাইরে খেলবার অনুমতি মিলত। বাড়ির সামনেই পথে খেলা করতুম আমরা— মা-মাসিরা দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প করতেন— সে অতি আহ্লাদের ব্যাপার ছিল। তখন গরমকালের কলকাতাতে সন্ধ্যার পর থেকে একটা মিষ্টি বাতাস বইত। খুব কম বাড়িতেই সিলিং ফ্যান থাকত তখন— টেবিল ফ্যান, আর তালপাতার হাতপাখা দিয়েই বেশির ভাগ সংসারেই দিব্যি সামলে যেত। এখন তো এ.সি. আর নাকি লাক্সারি নেই, নেসেসিটি হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সেই শীতল হওয়াটাও আর কিন্তু বয় না। কলকাতার মানুষের মতোই কলকাতার প্রকৃতিও এখন অনেক নির্মম হয়েছেন। পাড়ার বাবারা সবাই মিলে তখন বড়োরাস্তার মোড়ে কবিরাজমশাইয়ের দোকানের সামনে ফুটপাতে বেঞ্চি পেতে বসে গল্প করতেন। অফিস থেকে ফিরে— রোজ রাত্তিরবেলায়। কবিরাজমশাই হুঁকো খেতেন। আমার বাবাও কোবরেজমশায়ের আড্ডায় গিয়ে বসতেন সময় পেলেই।

আমাদের রাস্তায় তখন অনেক গঙ্গাজলের হাইড্র্যান্ট ছিল, তাতে অঢেল জলের প্রবাহ। তাইতে হোসপাইপ লাগিয়ে ভোরবেলায় রাস্তা ধোয়া হত। রাস্তার জল দেবার শব্দ শুনলেই বাবা-মা বুঝতে পারতেন এখন ভোর চারটে। বাবা উঠে পড়তে বসতেন। আমার ধারণা ছিল, রাস্তা ধোয়ার জন্যই পথে হাইড্র্যান্ট থাকে। অনেক পরে বিলেতে গিয়ে শিখলুম ওগুলো ইমার্জেন্সি 'ফায়ার হাইড্র্যান্ট', দমকলের জন্যে তৈরি। এখন আমাদের পাড়াতে আর কোনো হাইড্র্যান্ট নেই। আগুন লাগলে, দমকলকে লেক থেকে জল তুলতে ছুটতে হয়। অথচ এককালে গঙ্গাজল উপচে পড়ে, নর্দমা বেয়ে নদী বয়ে যেত, রীতিমতো স্রোতস্বিনী! পাড়ার ছেলেরা হাইড্র্যান্টের মুখে ইট চাপা দিয়ে চমৎকার ফোয়ারা তৈরি করত। আর অভিজাত পাড়া হিন্দুস্থান পার্কের বড়ো বড়ো বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা (তখনও 'ফ্ল্যাটবাড়ি' শব্দটা সম্ভ্রান্ত হয়নি, এ পাড়ায় উদ্‌বাস্তু ক্যাম্পও বসেনি) দু-হাত তুলে ভজ গৌরাঙ্গ হয়ে রাস্তায় সেই গঙ্গাজলের ফোয়ারাতে নেচে নেচে মহানন্দে ভিজছিলুম একদিন দুপুরে— যতক্ষণ না পান-খাওয়া দাঁত কিড়কিড় করতে করতে গোবিন্দকাকা আর গুনিয়াভাই ছুটে এসে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে যার যার বাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর শুরু হল মায়েদের ঘষামাজার কাজ। রগড়ে রগড়ে সাবান ঘষে গায়ের কাদা তুলে চান করানো। প্রচুর নরম তুলতুলে সাদা ধবধবে পলিমাটি মেশানো থাকত যে সেই হাইড্র্যান্টের জলে। ফুটপাতের ঠিক নীচেয় যে পাথর বাঁধানো নর্দমার মতো জায়গাটা, যেখান দিয়ে জলের ধারাস্রোত বয়ে যেত, সেইখানে পরে দেড় দু-ফুট চওড়া, আর ইঞ্চিচারেক পুরু ভেলভেটের মতো নরম পলিমাটির পরত পড়ে যেত। শুকনো হলে সেই মাটি কী মিহি, কী চিকন, কী সাদা, ঠিক মনে হত যেন ট্যালকম পাউডারের খনি আছে আমাদের রাস্তায়। কৌটোতে ভরে নিলেই হল। এমনি একটা গ্রীষ্মের ছুটির হাওয়া দেওয়া স্বাধীন চাঁদনিরাত মনে পড়ে। কৃষ্ণা, শুক্লা, আর আমি উবু হয়ে নর্দমার ধারে বসে মনের সুখে খেলা করছি, অর্থাৎ ওই নরম, মায়াময় পলিমাটি প্রাণভরে ঘাঁটছি, এমন সময়ে রক্তচক্ষু মেসোমশাই, অর্থাৎ কৃষ্ণা-শুক্লার বাবা এসে হাজির! তারপর আমাদের সে কী রাম বকুনি! বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণা-শুক্লার কপালে সে দিন উত্তম-মধ্যম জুটেছিল। আমার কেবল

গুনিয়াভাইয়ের বকুনির ওপর দিয়েই গিয়েছিল। চাঁদের আলোয় চাঁদনি রঙের গঙ্গামাটি যেন ঝলমলও করছিল সেদিন, আর তার মধ্যে অভ্রের কুচির মতন চিকচিক করছিল বালি। চাঁদের আলোতে ভেসে যাওয়া পিচের রাস্তাটা সেদিন যে আসলে ছিল সুবর্ণরেখা নদী, আর আমরা যে তারই বালুচরে খেলা করছিলুম, সে-কথাটা মেসোমশাইও জানতে পারেননি, গুনিয়াভাইও না!

গার্জেন কি শুধু ওঁরাই, যে লোকটা ঘাড়ে মই নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোস্টের গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যেত— আমাদের দেখতে পেলে সেও একবার রুটিনমাফিক তাড়া লাগাত; 'আলো জ্বলে গেচে খোঁকা-খুঁকুরা, সব এবার ঘরে যাওগে'— আমাদের লিমিট ছিল ওটাই। রাস্তায় আলো জ্বলে গেলেই খেলার বেলা শেষ। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ-না-কেউ ঠিকই ধমক দিতেন— 'কী হচ্ছে কী, তোরা বাড়ি গিয়ে পড়তে বসিসনি এখনও?' সব বড়োরাই সব ছোটোদের গার্জেন ছিলেন যে তখন। এখনকার মতন মায়েরা তেড়ে এসে ঝগড়া করতেন না তো?

আমাদের আরেক মহিমান্বিত গার্জেন ছিলেন আমাদের স্কুলবাসের ড্রাইভার। আমরা বলতুম 'নাজিরালির বাস' এবং গম্ভীর নাজির আলিকে ভীষণ ভয়ও পেতুম। একদিন সুচিত্রা সময়মতো বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিল না বলে বাস তাকে না নিয়েই চলে এসেছে। পরদিন সুচিত্রা যেই কমপ্লেন করতে শুরু করেছে— 'আমি তো দৌড়ে দৌড়ে তখুনি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলুম—' নাজিরালি স্টিয়ারিং থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'পাঁচমিনিট পেহলে আ কর খাড়া রহনা গেটপে, লেকিন এক মিনিট দেরসে নহিঁ আনা! সবকোইকো বারেমে খেয়াল রখনা চাহিয়ে— ঔর সবকো লেট হো যায়েগা এক স্টুডেন্টকে লিয়ে' নাজির আলির সেই শিক্ষায় পাঁচ বছর ধরে ফুল অ্যাটেনডেন্স হয়েছিল সুচিত্রার। আমি অবিশ্যি শিক্ষাটা গ্রহণ করিনি।

একটু যখন বড়ো হলুম আমরা, ফ্রক নয়, এবার স্কার্ট-ব্লাউজ, কেউ কেউ শাড়িও— পাড়ার দু-চারটি মেয়ে হয়তো দু-চারটি ছেলের সঙ্গে একটু খিলখিল একটু ফিসফাস করছে— তখনও কি কম ঝঞ্ঝাট? কবিরাজমশাই তো আছেনই সবসময়ে বেঞ্চি পেতে বাইরে বসে হুঁকো-হাতে পাহারাদার, তার ওপরে পানের দোকানের শ্যামঠাকুর? এখন যেটা চিন্তামণির দোকান, সেটা আগে ছিল তার কাকা শ্যামের। কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলেছে তো রক্ষে নেই। শ্যাম ঠিক তার বাড়ির কাউকে-না-কাউকে খবরটি পৌঁছে দেবে। দেখে মনে হবে পানপাতা ধুচ্ছে, পানপাতা কাটছে, আসলে চোরা চোখ দুটি চতুর্দিকে ঘুরছে। যেন সাদা পোশাকের পুলিশ!

না, রোমান্টিক জীবন কারুর কপালেই নির্বিঘ্ন ছিল না তখন। এই ধরুন আমার কথাই। পাড়ায় গুজগুজ করিনি বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে গিয়েই ধপাস করে প্রেমে পড়ে গেলুম। প্রথম প্রেম বলে কথা? ষোলো বছর বয়েস!

এদিকে স্যারেদের শ্যেনদৃষ্টি, ওদিকে ক্লাসমেটদের। আর মায়ের বারণ, ছেলেদের সঙ্গে কফি হাউসে যাবে না, সিনেমায় যাবে না, রেস্তোরাঁয় যাবে না, পার্কে যাবে না, লেকে যাবে না— তাহলে যাবটা কোথায়? কী আর করি? প্রেসিডেন্সি থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে আসি। এক একদিন এক একটা রুট ধরি। 'রাস্তায় হাঁটবে না' তো বলেননি মা। কিন্তু একদিন গোপালমামা ডেকে বললেন, 'খুকুভাই, তুমি পরশু ওয়েলেসলির ওখানে কী করছিলে? আর গত শুক্রবার

জোড়াগির্জের কাছে ট্রামলাইন ধরে কেন হাঁটছিলে?' মাথায় মনুমেন্ট ভেঙে পড়লেও এর থেকে কম অবাক হতুম। কেননা গোপালমামা জন্মান্ধ। তা বলে তিনি দৃষ্টিহীন নন। তুলসী আছে, তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপ, সর্বদার সঙ্গী। গোপালমামার নিজস্ব বিজ্ঞাপন সংস্থা ছিল। বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের কাজে সারা কলকাতা ঘুরতে হত তাঁকে। তুলসীই নিশ্চয় বলে দিয়েছে। 'ওই দেখুন দাদাবাবু— ওই যে, খুকুভাই যাচ্ছে।' গোপালমামা দেখতে পাননি, কিন্তু জানতে পেরেছেন।

'একদম ওসব পাড়া দিয়ে হাঁটবে না। বুঝেছ? মোটেই ভালো পাড়া না ওসব—' গোপালমামাকে ভয় পেতুম সবাই। অন্ধ বলে তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস ছিল না আমাদের। তিনি রাগী মানুষ ছিলেন। তারপরেই এল অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় প্রশ্নটি : 'তোমার সঙ্গে লম্বামতন ছেলেটি কে ছিল? দিদিমণি তাকে চেনেন?'

ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাই বলি। 'হ্যাঁ চেনেন। আমার ক্লাসের বন্ধু।' দিদিমণি, মানে মা। গোপালমামাও ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী।

এ জীবনে আমার গার্জেনভীতি গেল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াতে ঢুকলুম, তখন মনের ওপর খুব চাপ যাচ্ছিল ব্যক্তিগত পারিবারিক কারণে, দেবদাস-স্টাইলে তখন সিগারেট খাওয়া ধরেছিলুম। কিন্তু সে কি সোজা ব্যাপার? ভয়ানক ঝামেলা। লুকিয়ে-চুরিয়ে খাই। মা-র সামনে খাওয়া চলবে না, কাজের লোকেদের সামনে খাওয়া চলবে না (একেই দিদিমণির বর নেই, তায় সিগ্রেট খায়। এ-দিদি বদমাইশ না হয়েই যায় না!) ছাত্রছাত্রীদেরও সামনেও না— Injurious to health বলে কথা— তা ছাড়া সামাজিকভাবেও খুব injurious ছিল মেয়েদের ধূমপান। অতীব সাবধানে, দরজা বন্ধ করে খেতে হত— কেউ এলেই চটপট হাতের সিগারেটটা আর কারুর হাতে চালান করে দিতে হত। এখনকার মতন ছাত্র-অধ্যাপিকাদের সবার এমন খোলাখুলি ধূমপানের চল হয়নি তখন। (স্বাস্থ্যও কম নষ্ট হত নিশ্চয়ই!)

আমিই তখন বিভাগের একমেবাদ্বিতীয়া মেয়ে-মাস্টারমশাই। (একবার তো আমার তাড়াহুড়োর চোটে ফাদার আঁতওয়ান ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুবীরের দু-হাতে দুটো সিগারেট!) সিগারেট খাব কী, তার তোড়জোড়ই প্রচণ্ড জটিল ব্যাপার। কেউ ঢোকার আগে নিবিয়ে দিলেও রক্ষে নেই, ধোঁয়া-ওঠা চাপা দেব কেমন করে? তার ওপর আছে কেনার সমস্যা। বাড়িতে তো কাউকে কিনতে পাঠানো যাবে না। কলেজেই কলিগরা ভরসা। অমিয়, সুবীর, পান্না, প্রণবেন্দু। ভবানীও এনে দেয় (ভবানী আমাদের বিভাগের গোবিন্দকাকা) অমিয় সুবীরদের প্যাকেটের সঙ্গে। একদিন ভবানীকে ঘরে ডেকে যেই-না বলেছি— 'ভবানী, একটা প্যাকেট ভাজির'— ভবানী বলল, 'পারব না।' আমি তো থ। এও কি ইউনিয়নের বিদ্রোহ? 'ফাইল নাড়ব, খাবার জল দেব না', ইত্যাদি। তো-তো করে কোনোরকমে বলি,

'কে-ক্কেন? তুমি তো অমিয় সুবীরদের এনে দাও। দাও না?'

'তা তো দেই।' ভবানী নির্বিকার।

'তবে আমাকে কেন দেবে না?'

'উনারা তো নিজেরাও যাইয়া দোকানের থিক্যা ছিগ্রেট কিনেন। আপনে কিনেন? দোকান থিক্যা যেইটা কিন্যা খাইতে লজ্জা পান, সেইটা খাইবেন ক্যান?'

কত বড়ো শিক্ষাটা ভবানী কত সহজে আমাকে দিয়ে দিল!

এ সত্যটা এতদিন খেয়ালই হয়নি? একেই বলে চক্ষুরুন্মীলিতং যেন। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আরও কত তীক্ষ্ণ হবে?

ভালো করে সিগারেট খাওয়াটা ধরবার আগেই আমার ছাড়া হয়ে গেল। গার্জেনের কি অন্ত আছে আমার?

তাও তো বাড়ির গার্জেনদের কথা বলিনি। শিবু আছেন, কানাই আছেন, বিন্দু এবং দুই মেয়ে। সবাই মিলে কামড়ে দেবেন মুখ খুলেছি, টের পেয়ে।

১৯ অক্টোবর ১৯৯৬

বকুল বিছানো পথে

যেমন পচা নামকরণ, বিষয়বস্তুটা কিন্তু ঠিক ততটা পচা নয়। স্মৃতির বকুল গন্ধকে অনুসরণ করেই যে ভ্রমণ তাকে আর কোন নামে ডাকা যাবে? নস্টালজিয়া ব্যাপারটাই যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল! স্মৃতিমেদুর এই পিছন ফিরে হাঁটার পথকে বকুলবীথি ছাড়া আর কী নাম দেব আমি?

এবার নিমন্ত্রণ ছিল কয়েকটি মার্কিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর কয়েকটি বাঙালিদের আড্ডায়। না, বঙ্গ সম্মেলনে যাইনি। এ তার আগের কথা। আমার শরীর ঠিক নেই বলে সঙ্গী হয়েছিল আমার তিন নম্বরের মেয়ে, পুষ্যিকন্যেটি। তার এই প্রথম আমেরিকা দর্শন। অন্তরা নন্দনার এই অঞ্চল সবই চেনা। শ্রাবস্তীর কাছেই নতুন। আমার মনে হল এই সুযোগে ওকে আমার প্রিয় জায়গাগুলো কিছু কিছু দেখিয়ে আনি। বিনা খরচে যতটুকু দেখানো যায়। তা ঘোরাঘুরি মন্দ হয়নি!

কোথায় কোথায় গেলুম? সে তো অনেক জায়গায়! কোনটা আগে বলব, কোনটা পরে? বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন স্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্বাদে, বর্ণে আলাদা। বিভিন্ন নবনীতা ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ানো।

এদেশে আমি কবে এসেছিলুম, প্রথমবার? সেই যে, যে বছর বাতিস্তাবিজয়ী এক তরুণ ফিদেল কাস্ত্রো নিউ ইয়র্ক শহর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন? সেই বছরেই আমারও আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ। আমার বয়েস একুশ তখন। এলোমেলো স্মৃতি বেয়ে এলোমেলো ভ্রমণ, তার গল্পও হবে আজ এলোমেলো। কিন্তু কখনো আচম্বিতে, অতর্কিতে সুগোলও হয়ে যায় স্মৃতির বৃত্তরেখাটি— সেই কাহিনিও বলব।

যেমন ধরুন, এই মে মাসের সন্ধ্যাবেলায় নিউ ইয়র্কে, গ্রিনিচ ভিলেজের পথে হাঁটতে হাঁটতে শ্রাবস্তীকে বললুম, জানিস ছোটো, সেটা বোধ হয় ১৯৬০ কি ৬১ হবে, অমর্ত্য আর আমি এইখানে বেড়াতে এসেছি— ষাটের দশকের গ্রিনিচ ভিলেজ ভেবে দেখ— ফ্লাওয়ার চিলড্রেনদের সময়। বিট কবিরা রাজত্ব করছেন, বিটলরাও এল বলে! হিপিদের পাড়া ছিল এটা। বাতাসে গাঁজার গন্ধ পাওয়া যায় হঠাৎ হঠাৎ। এক জায়গায় দেখি এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ফ্রি উপহার বিলি করছে। আমি তো তক্ষুনি হাত বাড়িয়েছি, অমর্ত্য আটকে রাখতে পারেননি। ছেলেটি বিলোচ্ছে চমৎকার কালো রঙের সরু সিগারেট-হোল্ডার— তাতে সাদা রঙে লেখা BIZARRE! ব্যাপার কী? কিছুই নয়, ফুটপাথের ঠিক ওইখানেই একটি বেসমেন্ট-কাফে খুলেছে তার নাম BIZARRE, সেখানে গান-বাজনাও হচ্ছে। 'চলো, চলো'—আমি তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ি— দুজনেরই আগ্রহ ছিল কফি খেতে। নীচে গিয়ে দেখি, একটি সুন্দরী মেয়ে গিটার নিয়ে গাইতে উঠল। সাদা শার্ট আর সবুজ স্কার্ট পরনে, কালো চুল পিঠে খোলা। সে গাইল, 'হাশ মাই বেবি,

ডোন্ট ইউ ক্রাই'— আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল, কী অসাধারণ কণ্ঠস্বর! ওই গানটি আমার সেই প্রথম শোনা, জোন বায়েজের সঙ্গেও সেই প্রথম দেখা!

পরের ধাপ ১৯৬৪-তে, আমরা তখন বার্কলিতে। অমর্ত্য পড়াচ্ছেন, আমি পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট। আমার বন্ধুবান্ধবরা সে-মুভমেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত— উদ্যোক্তা বলাই ঠিক। মারিও সাভিও, বোটনা আপটেকর, মাইরা য়েহলিন, জেরি রুবিন আরও অনেকে। সেদিন 'স্প্রাউল হল' (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাট বার্কলি-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং) থেকে ৮০৬ জন ছাত্রছাত্রীকে মারতে মারতে গ্রেফতার করেছিল মার্কিন পুলিশ। তার আগে ছাত্রনেতারা সমস্ত বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের মাইকে নির্দেশ দিয়েছিল অধিকৃত হলটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে— (ছাত্ররা অধিকার করে নিয়েছিল স্প্রাউল হল— যেহেতু চ্যান্সেলর মশাই নির্দেশ জারি করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনীতি আলোচনা করা চলবে না। করলে তা বেআইনি কাজ বলে গণ্য হবে।) অন্য বিদেশি ছাত্রদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এসেছিলুম, নতুবা আমাদের ফেলোশিপ মারা যাবে এবং ডিপোর্ট করে দেওয়া হবে। তাই নেতারাই নির্দেশ দিল আমাদের বেরিয়ে যেতে। এবং বাকিদের বলা হল বাধা না দিয়ে, শরীরটাকে আলগা করে দিতে। 'পুলিশদের বাধা দিয়ো না— কিন্তু ওদের সঙ্গে সহায়তাও কোরো না। ওরা বরং আমাদের টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে যাক।' পুলিশের সেই হিঁচড়ে নেওয়া দেখেছিলুম বাইরে দাঁড়িয়ে— সিঁড়ি দিয়ে টেনে নামিয়ে আনা হচ্ছিল একের পর এক আইন অমান্যকারী ছাত্রছাত্রীকে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে হলের মধ্যে যে মেয়েটি গিটার হাতে গান গেয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করছিল, সেই মেয়েই BIZARRE-এ দেখা জোন বায়েজ। আগের রাতেই ওপন এয়ার অডিটোরিয়ামে তাঁর কনসার্ট ছিল, আমরা টিকিট কেটে ভিড় করে শুনে এসেছি। আজ তিনিই স্বেচ্ছায় বিনামূল্যে এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের প্রতিবাদ সভায়। আমরা তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছি 'কিপ ইয়োর আইজ অন দ্য প্রাইজ, হোল্ড অন'— সেদিনই সূচনা হল বাক্‌স্বাধীনতার জন্য প্রতিবাদ বিপ্লবের। ছাত্র অধ্যাপক প্রত্যেকের কেন স্বাধীনতা থাকবে না, মন প্রাণ খুলে কথা কইবার? বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ কি গণতন্ত্রের বাইরে? বার্কলিতে তখন ভিয়েতনামযুদ্ধ-বিরোধী প্রতিবাদ teach-in, sit-in ইত্যাদি সত্যাগ্রহের আকার নিয়েছিল। কর্মকর্তারা এঁটে উঠতে না পেরে স্বমূর্তি ধারণ করেছিলেন। গণতন্ত্রের সাধিকা হিসেবে সেদিন জোন বায়েজ ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। জোন বায়েজ-এর মানবতাবাদী রাজনীতির পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চাঁদা তুলে দিতে বন্ধু বব ডিলানের সঙ্গে যে কনসার্টটি করেছিলেন, তার জন্যেও আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধায় মনে রেখেছি। দুটো এল.পি.-তে সে-গান আমার কাছে আছে।

এই কাহিনির শেষ অধ্যায় ২০০৬-এর ক্যালিফোর্নিয়াতে। রুপু রিনি শ্রাবন্তী সাক্ষী।

এ যাত্রায় আমার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের, অর্থাৎ বন্ধুদের কাচ্চা-বাচ্চাদের ঘর-সংসার যথাসাধ্য দেখে আসা। বস্টনে সুনীলের (গঙ্গোপাধ্যায়) ছেলেবউ পুপলু আর বুইয়া, কবিতাদির (সিংহ) মেয়ে পরমেশ্বরী তার স্বামীপুত্রকন্যাসহ, দীপক-মিনির (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছেলেবউ ঝিমা-তুলি, আর নাতি সাশা। রাহুল-স্বপ্নার ছেলে দুটি বাবু-অবু (এত

বড়োও হয়েছে, অসামান্য গুণীও হয়েছে)— ওদের দেখে তৃপ্ত হয়ে এসেছি। নিউইয়র্কে ইরার (বিষ্ণু দে-র মেয়ে) ছেলেবউ বাম্বি-অর্পিতার ঘরকন্না, নিউ জার্সিতে মিমি-জ্যোতির (বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসুর মেয়ে-জামাই) ছেলেবউ নাতির সোনার সংসার, সরেজমিনে তদন্ত করে মুগ্ধ হয়ে এসেছি। জ্যোতি মিমির আবার বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল ২৭ মে, সেদিন আমি ওদের বাড়িতে। অর্ধশতাব্দী আগের ওই দিনটাতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োর সেই ঝলমলে মিলনোৎসবে, আমার মা-বাবার সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলুম। ওদের জীবনের একটি বৃত্ত পূর্ণ হল— অন্তত একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে। প্রেসিডেন্সিতে ওদের প্রণয়েরও সাক্ষী ছিলুম আমরা। বার্কলিতে তারাপদর (রায়) ছেলে তাতাই তার বউ আর যমজ কন্যা নিয়ে থাকে, তাদেরও দেখা হল। তাতাই বলেছিল একটিকে ভোঁদড়ছানার মতো, আর একটিকে বেড়ালছানার মতো দেখতে। গিয়ে দেখি দুটি দেবশিশু জগৎ আলো করে ওদের কোলে খেলছে। তা ছাড়া আমার কিছু গার্জেন আছে। ভাইঝি গিনুমা, গৌতম আর তনয়া লস অ্যাঞ্জেলেসে, আর আমার পুত্রসম অরুণ-পূরবীর (কাঞ্জিলাল) ছেলে-বউমা রুপু-রিনি থাকে সান হোসেতে। শুধু দুই ভাগনি শম্পা আর পুপুর সংসারও দেখার ইচ্ছে ছিল, আলাবামার টামকালুসায় আর সান ডিয়েগোতে, কিন্তু সাধ্যে কুলোল না।

রুপু-রিনিই বার্কলিতে নিয়ে গেল, তাতাই আর রাকার কাছে। রাকা ভারতীদির (রায়) মেয়ে— বার্কলিতে অধ্যাপনা করছে। বড্ড চমৎকার মেয়ে রাকা। বার্কলির ভিতরে সে আমাদের গাইড হল। আমি ঢুকেই চেঁচিয়েছি, ওই তো ইউনিয়ন বিল্ডিং! আমাদের আড্ডার জায়গা— আর, ওই তো স্প্রাউল হল— যেখান থেকে আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। রাকা স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে তাকায়।— 'তুমি ছিলে সেদিন? ওদের মধ্যে?'

'ছিলুম তো। আমি তখন এখানে ছাত্র।'

'তোমার সব মনে আছে?' রাকা মুগ্ধ।

'থাকবে না? কী ভীষণ কাণ্ড করল পুলিশে! ৮০৬ জনকে ধরেছিল!'

'তবে দেখবে এসো তোমরা কী করেছ'— হাত ধরে আমাকে স্প্রাউল হলের সিঁড়ির সামনের উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিল রাকা। তারপর রুপু, রিনি, শ্রাবস্তীকে বলল, 'দেখো তোমাদের মা-মাসিদের কীর্তি দেখো!'

পায়ের নীচের মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি, গোল কুয়োর মতো একটি বৃত্ত আঁকা হয়েছে। ইস্পাত দিয়ে বাঁধানো। তাতে লেখা আছে : 'এই বৃত্তটিতে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ এসে দাঁড়িয়ে, যেকোনো বিষয়ে কথা কইতে পারে। এই স্থানটিতে স্বাধীনভাবে মানুষের মনের কথা বলার পূর্ণ অধিকার আছে।' এই মুক্ত মৃত্তিকায় পা রাখার পরে আমার চোখ দুটো তো অশ্রু ছলছল না হয়েই পারে না! কিন্তু রুপু-রিনি-শ্রাবস্তীরও দেখি চোখে জল। রাকার তো লেখাটা পড়তে পড়তে গলা-ই বুজে গেছে। 'আজ এই বিন্দুটার অন্য এক উজ্জ্বলতর অর্থ হল আমার কাছে— নবনীতাদি, তোমার উপস্থিতিতে!' ঐতিহাসিকের উপযুক্ত মুগ্ধতায় রাকা বলে।

সেখান থেকে আমার বিভাগ। গ্রন্থাগার ইত্যাদি দেখে আমার ইচ্ছে করল, যাই তো প্রিন্স স্ট্রিটের বাড়িটা খুঁজে বের করি। যে বাড়িতে আমরা থাকতুম। ক-দিন আগে অমর্ত্য বলছিলেন

যে এমা ও অমর্ত্য দুজনে গিয়েছিলেন প্রিন্স স্ট্রিটটা খুঁজতে। কিন্তু ওকল্যান্ড অবধি চলে গিয়েও ওঁরা রাস্তাটা দেখতে পাননি। কী হল, গেল কোথায় পথটা?

রুপুর মহা উৎসাহ— 'চলো না যাই, আমরা খুঁজে দেখি তো রাস্তাটা পাই কি না?' রিনির ব্যাগ থেকে মুহূর্তেই ম্যাপ বেরুল। এই তো প্রিন্স স্ট্রিট তাতে চিহ্নিত রয়েছে! যদিও তখন অন্ধকার নেমে গেছে তবু আমরা অবশেষে খুঁজে পেলুম প্রিন্স স্ট্রিট এবং তার কোণে আমাদের সেই বাড়িটাও। আরে, আরে, এই তো! অমর্ত্যকে আজই বলতে হবে ফোন করে! প্রিন্স স্ট্রিট হারিয়ে যায়নি, আছে! আমরাই হারিয়ে গিয়েছি সেখান থেকে।

ঠিক এ-রকম আর একটা পুরোনো রাস্তা আর পুরোনো বাড়ি খুঁজে বের করেছি এবারে, এখানে আসার আগে, কেম্ব্রিজে। ১২ নম্বর প্রেন্টিস স্ট্রিটের যে চিলেকোঠাতে অমর্ত্য এবং আমার প্রথম সংসার পাতা। আমি হার্ভার্ডের ছাত্র, অমর্ত্য এম.আই.টি-তে পড়াচ্ছেন। ওই বাড়িতে থাকতেই আমাদের প্রথম গাড়ি কেনা। দেড়শো ডলার দামে, অপূর্ব এক নীল রঙের শেভ্রলে কিনে, তার গায়ে হেলান দিয়ে ছবি তুলে বাড়িতে পাঠিয়েছিলুম। যেন বাঘের পিঠে বাঘশিকারির বুটপরা পা। ওই বাড়িরই গল্প, 'সেদিন দুজনে'— সেই চাবি-খো-গয়ার কাহিনি। ফায়ার এসকেপ বেয়ে আমার তিনতলার ওপরে উঠে জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকার রোমহর্ষক গল্প— অমর্ত্যর সাহায্যে ট্র্যাশ ক্যানের ওপরে চড়ে, অতি কষ্টে ফায়ার এসকেপের নাগাল পেয়েছিলুম। এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী চিলেকোঠাসমেত গৃহ। সেই বাড়ি খুঁজে পেতে একটুও অসুবিধে হল না। বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফোটোও হল। তারপর সেই ছবি মনিটারে দেখে কান্না পেয়ে গেল। এ কে? এই মোটা, ধেড়ে গিন্নিটাই সেদিন এই বাড়ির ফায়ার এসকেপ দিয়ে তিনতলার উপরে উঠেছিল? সে তো ছিল একটা রোগা পাতলা মেয়ে। এই যাত্রায় আমাদের ড্রাইভার ছিল তুলি। তুলি আর শ্রাবস্তী সান্ত্বনা দিল, তুমি চেষ্টা করলেই এখনও ফায়ার এসকেপ বেয়ে চড়তে পারবে। মোটা তো কী? ইটস আ ম্যাটার অব স্পিরিট! বস্টনে সেই বাড়িটা দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। সামনে ম্যাস অ্যাভিনিউতে একটা চীনে আর একটা গ্রিক, দুটি সস্তা, রেস্তরাঁ ছিল, রাঁধতে যতদিন না শিখেছি, ততদিন তারাই খাইয়েছে। সেগুলো খুঁজে পেলুম না। কিন্তু ওষুধের দোকানটি— লিনিয়ার ফার্মেসি, আর 'গাল্‌ফ'-এর পেট্রোল পাম্প, সেই দুটো রয়েছে। ওগুলো দেখে মনে হল, আবার পুরোনো বন্ধুদের প্রিয় মুখ দুটি দেখতে পেলুম। তখন গাল্‌ফ বিজ্ঞাপন দিত, 'পুট আ টাইগার ইন ইয়োর ট্যাঙ্ক'— আর সঙ্গে ছবি থাকত আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। বাঘটাকে দেখলেই মনে হত আমার দেশের লোক।

নিউইয়র্কে একদিন পার্কে বেড়াতে গেছি বাম্বির সঙ্গে। শ্রাবস্তীকে দেখাচ্ছি— এই যে স্ট্রবেরি ফিল্ডস ফর এভার-এর স্ট্রবেরি ফিল্ড। এই যে সেই বাড়ি, যেখানে শেষকালে ইয়োকো ওনো আর জন লেনন থাকতেন। আর এই, যেখানে জন লেননকে তাঁর উন্মাদ ভক্ত খুন করেছিল। তারপর পার্কের ভিতরে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ওকে দেখাচ্ছি, ১৯৮৬-তে এইখানে আমরা ছ-জন ভারতীয় কবি এসে মাতৃভাষাতে ও অনুবাদে কবিতা পাঠ করেছিলুম। সুনীল, নবনীতা, অরুণ কোলাটকার, কেদারনাথ সিংহ ইত্যাদি। আমাদের সেই কবি-সভার সঞ্চালক ছিলেন কবি অ্যালেন

গিনসবার্গ। কোলে ছোট্ট একটি হারমোনিয়াম নিয়ে তিনি গান গেয়ে আমাদের তাঁর শান্তির কবিতা শুনিয়েছিলেন। সেবারে অ্যালেন নিজের হাতে নিরামিষ রান্না করে আমাদের কয়েকজনকে মধ্যাহ্নভোজ খাইয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

১৯৮৬-র পর ২০০৬, কুড়ি বছর পর আমি একবার গিনসবার্গের জন্য অন্য এক প্রিয় জায়গায় ফিরে গেলুম। সানফ্রান্সিসকোতে সেই বিখ্যাত সিটি লাইটস বুক স্টোরে। এইখানেই শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক বীট জেনারেশনের কবিতা বিপ্লব। বাইরের দোকান তো নয়, এটি ছিল নবীন কবিদের আখড়া, ছিল নতুন শিক্ষা ভাবনার আঁতুড়ঘর। লরেন্স ফার্লিংগেট্টি আর গ্রেগরি করসো, গ্যারি স্নাইডার আর রবার্ট ব্লাই, বব কাউফম্যান আর জ্যাক কেরুয়াক। কে ছিলেন না এই দোকানের নিত্য অতিথি? এখানেই গড়ে উঠেছিল ফার্লিংগেট্টির 'সিটি লাইটস (আন্ডারগ্রাউন্ড) পাবলিকেশনস'। যেখান থেকে প্রকাশিত হল অ্যালেন গিনসবার্গ-এর টালমাটাল করে দেওয়া কবিতার বই 'হাউল অ্যান্ড আদার পোয়েমস'।

নিউ ইয়র্কের ছোকরা অ্যালেন সানফ্রান্সিসকোতেই স্বজন খুঁজে পেলেন। পুবে নিউ ইয়র্ক আর পশ্চিমে সানফ্রান্সিসকো, এ দুটিই কেন্দ্রবিন্দু— আমেরিকার সাহিত্য শিল্পের নাড়ি যেখানে বাঁধা। সিটি লাইটস বুক স্টোর এক ঐতিহাসিক তীর্থভূমি, আমাদের অনেকের কাছেই। এই দোকানের বেসমেন্টে ছিল কবি-শিল্পী-গাইয়েদের আড্ডা। এখানে কবিতা পাঠ, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, যার যেমন খুশি কাজ চলত। এককোণে আপন মনে বসে বই পড়লে কেউ বিরক্ত করত না। এই ঐতিহ্য একদা সিটি লাইটস বুক স্টোরেই শুরু হয়েছিল, এখন আমেরিকার সব বড়ো বইয়ের দোকানেই যা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রাবস্থায় এখানে আমি প্রথম যখন এসেছি, তখনও বীট প্রজন্ম বিষয়ে এত কিছু জানি না। সদ্য গড়ে উঠছেন তাঁরাও। আমরা যখন বার্কলিতে প্রথম বার, সেই বছরেই (১৯৬৪-'৬৫) গ্যারি স্নাইডার অতিথি অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন ইংরেজি বিভাগে— অথচ ক্লাসিক্স বিভাগে আমি সেই খবরটি জানতুম না। অনেক পরে জেনেছি।

কিন্তু 'সিটি লাইটস' দোকানের নাম শুনেছিলুম। 'হাউল' বইটিও এই সময়েই কিনেছি, ছোট্ট, পকেট সাইজের বই, সাদাকালো রঙের মলাট। ওই সঙ্গে ওই সিরিজের আরও কয়েকটা বই কিনেছিলুম। জ্যাক কেরুয়াকের 'অন দ্য রোড' বই এবং আরও কিছু। 'হাউল' কবিতাটি মার্কিনি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন মোড়। এই বইয়ের জন্য ফার্লিংগেট্টিকে ও সিটি লাইটসকে প্রকাশক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অশ্লীলতার দায়ে। কিন্তু এক সৎ বিচারকের সুবিচারে তিনি ছাড়া পান। যে বইয়ের বিন্দুমাত্রও সামাজিক তাৎপর্য আছে, সেই বই কখনো অশ্লীল হতে পারে না, এই ঐতিহাসিক রায়ের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে অনেক বই (লেডি চ্যাটারলি'জ লাভার, নেকেড লাঞ্চ, ট্রপিক অব কেপ্রিকর্ন ইত্যাদি) নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে। শিগেকোকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ছাড়া পান।

আমি যখন প্রথম ওই দোকানে যাই এবং তার পরেও যতবার গেছি, ওই ঝুঁটিবাঁধা, কৃষ্ণ শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত, ফর্সা গাঁট্টাগোট্টা, লম্বা-চওড়া জাপানি (সামুরাই) যুবককে ক্যাশ কাউন্টারে দেখেছি। শিগ-এর বিষয়ে আমি তখন কিছুই জানতুম না। কিন্তু তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। কলকাতাতে অ্যালেনদের আসার ফলে যে হাংরি জেনারেশনের তরুণ কবিদের উৎপত্তি হয়েছিল

ষাটের দশকের শেষার্ধে, তাঁদের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে সিটি লাইটস বুকস একটি আধুনিক বাংলা কবিতার ক্রোড়পত্র বের করেছিল। সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে একটি চিঠি আমি লিখে রেখে এসেছিলাম অ্যালেনের নামে, ওই শিগেকোর হাতে। অ্যালেন তখন বৌদ্ধধর্মের অনুসন্ধানে পূর্ব এশিয়ার কোথাও, চীনে বা জাপানে ছিলেন। বছরখানেক বাদে অ্যালেনের কাছ থেকে সেই চিঠির উত্তর কলকাতার ঠিকানায় পেয়েছিলুম আমি। বোধ হয় মত্ত অবস্থায় লেখা। শুধুই অশ্লীল গালিগালাজে ভরতি। সেই চিঠি বাবাকে দেখাতেই ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বাবা বুঝতেও পারলেন না, কত মূল্যবান একটি নথি নষ্ট করে ফেললেন। অনেক পরে, আমার মেয়ের বিয়েতে অ্যালেন কিন্তু খুব সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে নিজের হাতে নানারকম ছবি এঁকে এবং আশীর্বাদ জানিয়ে। ততদিনে মানুষটির অনেক বদল হয়েছে।

সিটি লাইটসে ফিরে গিয়ে আমার সবচেয়ে কষ্ট হল পায়ের দুরবস্থার কারণে আর আমার সিঁড়ি বেয়ে বেসমেন্টে নামবার উপায় নেই। অথচ সেটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখনও সেখানেই গান-বাজনার যত বই, সিডি ইত্যাদি থাকে। বেসমেন্টে নামার সময়ে সিঁড়ির দেওয়ালে পোস্টবাক্স থাকত, যাঁরা নিয়মিত যেতেন, তাঁদের চিঠি আসত সেখানে। আমার হিংসে হত। আমাদের কফি হাউসে কেন এ-রকম চিঠির বাক্স নেই। তখন ওখানে একটা বড়ো নোটিশ বোর্ডও ছিল। কে জানে হয়তো এখনও আছে! তাতে বইয়ের প্রকাশনা থেকে শুরু করে গাড়িতে রাইড চাওয়া, ঘর ভাড়া চাওয়া, যোগশিক্ষা বা প্রণয় ভিক্ষা— সবকিছুরই নোটিশ দেওয়া যেত, ফ্রি। কবিতা পাঠ, নাটক মঞ্চস্থ করা, ছবি প্রদর্শনী, এসব খবর তো থাকতই। কলেজের নোটিশ বোর্ডের মতো।

এবার গিয়েই ক্যাশ কাউন্টারে শিগ-এর খোঁজ করি সবার আগে। ওর অভাবটা খুব চোখে লাগল। মস্ত বড়ো হয়ে গিয়েছে সিটি লাইটস বুকস— তবু চিনতে অসুবিধা হয় না। সেই একই মোড়ে তেকোনা মাথায় এটি জ্বলজ্বল করছে।

'হাউল' কবিতাটি লিখে গিনসবার্গ ২৫টি মিমিওগ্রাফড কপি করে কবি-বন্ধুদের বিলি করেছিলেন। 'মনুষ্য রক্তের বিনিময়ে দশ ডলার খরচ করে ছাপানো।' সেই কবিতাটি জ্যাক কেরুয়াকের প্রতি উৎসর্গিত। সেই কবিতা শুনে, লরেন্স ফার্লিংগেট্টি অ্যালেনকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। অবিকল যে ভাষাতে 'লিভস অব গ্রাস' পাঠ করে হুইটম্যানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এমার্সন, সেই ভাষা— 'এক মহান জীবনের শুরুতে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই।' এবং কবিতাটি নিজেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বই হিসেবে। সেসময়েও এই দোকানের ম্যানেজার ছিলেন শিগ, পঞ্চাশ বছর আগে।

আজ যে মেয়েটি কাউন্টারে ছিল, সে কিন্তু নাম শুনে চিনল না। না চিনলেও, সে গিয়ে ভেতর থেকে বয়স্ক একজনকে ধরে আনল। তিনি চিনলেন। একটি বই এনে তার পাতা খুলে, এক দঙ্গল বীট কবির ছবি দেখালেন। তাঁদের মধ্যেই ওই তো দাঁড়িয়ে শিগেকো। ওঁর নাম এত দিনে জানতে পারলুম। শিগেয়োশি মুরাও। বইটিতে অনেকেরই ছবি দেখলুম। করসো, ফার্লিংগেট্টি, গিনসবার্গ, ক্রিলি, কেরুয়াক, ব্লাই, স্নাইডার, অরলভস্কি— মার্কিন সাহিত্যের একটা যুগের ইতিহাস। ওদের সঙ্গে ছবিতে বব ডিলানকেও দেখলুম বার বার। এবং একগুচ্ছ শিল্পী

নারী, যাঁরা সমান যশস্বিনী হননি, যদিও সমানে সমানেই যাপন করেছিলেন শিল্পসর্বস্ব ঝোড়ো জীবন। আশ্রয় দিয়েছিলেন, সাহচর্য দিয়েছিলেন, অন্ন জুগিয়েছিলেন।

সিটি লাইটস বুক স্টোরে দাঁড়িয়ে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ছিল। একবার বার্কলি থেকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে বাসে করে সানফ্রান্সিসকো এসেছিলুম, আমাদের অতি প্রিয় এক লেখকের বক্তৃতা শুনতে। ব্ল্যাক আমেরিকান লেখকদের মধ্যে তিনি তখন শিখরে। তখন দারুণ তাঁর নামডাক। 'আফ্রিকান-আমেরিকান' এই নামকরণ তখনও হয়নি, ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল-এর যুগ সেটা। 'নিগ্রো' বলাটা চলছে না, কিন্তু 'ব্ল্যাক আমেরিকান' বলে আত্মপরিচয় দিতে অসম্মানিত হন না তাঁরা। সেদিনকার বক্তা জেমস বল্ডউইন। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু লেখার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত আমি। জভান্নি'স রুম, অ্যানাদার কান্ট্রি, ফায়ার নেক্সট টাইম। মহা উৎসাহে প্রিয় লেখক দর্শনে চলেছি। অমর্ত্য ব্যস্ত, তাঁর সময় হল না।

সানফ্রান্সিসকোর শেরাটন হিলটন হোটেলে বক্তৃতা, কত দিয়ে যে টিকিট কেটেছিলুম, এখন ঠিক মনে নেই। রিফ্রেশমেন্টস ছিল না, খুব খিদে পেয়েছিল, সেটা মনে আছে। খুব সুন্দর বললেন। সিভিল লিবার্টির বিষয় নিয়ে। বলা হয়ে গেলে শ্রোতাদের অনেকে সাজঘরে হানা দিলেন সই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। আমার ছোটো থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহের লোভ আছে, আমিও তাদের পিছু পিছু ঢুকে পড়ি।

বাসে গেছি, সেদিন পরনে শাড়ি নেই, জিন্‌স-কুর্তা। কিন্তু, কপালে টিপ। প্রথমেই আমার দিকে আজব জীব দেখার মতো তাকিয়ে রইলেন বল্ডউইন। আমি ভয়ে ভয়ে হাতের বইটাই তাঁর দিকে এগিয়ে দিই। যে বইটা আজ বাসে পড়তে পড়তে এসেছি। বইটা কিন্তু বল্ডউইন-এর লেখা নয়। হাত না বাড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, 'খাতা নেই? এটা কি আমার বই?'

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ি, 'না!'

যারপরনাই বিরক্ত মুখে তিনি বললেন, 'আমি আমার নিজের বইতে ছাড়া অন্যের বইতে সই করি না।'

হক কথা। অন্যায় কিছুই বলেননি। এখন তো আমিও মাঝে মাঝে বইমেলাতে এ-রকম বলে ফেলি। কিন্তু, তখন তো এত পাকা হইনি। কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে গেল আমার।

যদিও বুদ্ধি সান্ত্বনা দিল, একটু ডিফিকাল্ট লোক। তা, শিল্পীরা তো অমন একটু-আধটু গোলমেলে ব্যক্তিত্বের হয়েই থাকেন। বল্ডউইনের সাহসী লেখা পড়ে তাঁর সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স আমরা জেনে গিয়েছি। তখনও কিন্তু গে লিবারেশনের সময় আসেনি। একে তো সাদাদের দেশে কালো, তায় হেটেরোসেক্সুয়াল সমাজে গে, তায় লেখক মানুষ, তাঁর তো নিজেকে মাঝে মাঝে এ মরজগতে নির্বান্ধব, একা, শত্রু-পরিমণ্ডিত লাগবেই। তাঁর স্বভাব তো একটু খিটখিটে হতেই পারে।

বইটা সরিয়ে নিয়ে ঝোলাতে পুরছি, হঠাৎ কী মনে করে বল্ডউইন হাত বাড়ালেন, 'দেখি তো কী বই তুমি পড়ছিলে?' কণ্ঠস্বরের কঠোরতা হ্রাস পায়নি। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি আবার বইটি বাড়িয়ে ধরি। তিনি বইটি হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখেন। তার পরেই মুখশ্রী সম্পূর্ণ পালটে গেল তাঁর। বইটি সশ্রদ্ধভাবে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'ওঃ! এই বই? এখানে স্বাক্ষর করতে পারলে তো আমিই সম্মানিত হব।'

বইটা ছিল এডওয়ার্ড বেলামির লেখা ব্ল্যাক লিটারেচারের ক্লাসিক, লুকিং ব্যাকওয়ার্ড। বন্ডউইনের সই করা বেলামির বই আমার একটা সম্পদ। সই করলেন পিছন দিকে, সবিনয়ে।

সেদিনও শেরাটন হিলটন হোটেল থেকে বেরিয়ে, বাইরে সস্তা কিছু খাবার খেয়ে, আমরা দল বেঁধে এসেছিলুম এই সিটিলাইটস বুকস-এ, বন্ডউইনের কিছু বই কিনে নিয়ে যেতে। সকলের কথা মনে নেই, কিন্তু সেদিন সঙ্গে মাইরা ছিল, জুডিও ছিল। মাইরার সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন, তার মানবীবিদ্যার বইপত্তর পড়ি। শেষ খবর, রাটগার্সে পড়াচ্ছিল। মাইরার সঙ্গে আলাপ বার্কলিতে।

কিন্তু, জুডির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এদেশে প্রথম পা রেখেই, বিয়ের আগে একই হস্টেলের বাসিন্দা ছিলুম আমরা। আর, আমরা দুজনেই কবিতা লিখতুম। তার পরে আবার দেখা বার্কলিতে। দুজনেই তখন বিবাহিত। ক্লাসিক্স বিভাগে সে করছে পিএইচ.ডি., আমি পোস্ট ডক্টরাল। জুডির সঙ্গেও এবারে পুনর্মিলন হল, কত যুগ পরে, ওর খামারবাড়িতে, সবুজ নর্থ ক্যারোলাইনাতে। আমার বকুল বিছানো পথের এই গল্প বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার গল্প।

তবে, বৃত্ত কি জীবন থাকতে সম্পূর্ণ হয়?

নর্থ ক্যারোলাইনাতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েই ঠিক করেছিলুম জুডির সঙ্গে মোলাকাত করা চাই। এভান্সটনে অমর্ত্য আর আমি সেই যে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলুম, ১৯৬৯-এ, রামানুজনের বাড়ি থেকে, তারপরে আর ওকে দেখিনি। জানি, ও থাকে নর্থ ক্যারোলাইনাতে, কিন্তু, সঙ্গে ওর ঠিকানা নেই, ফোন নম্বর নেই। তাতে কী? ইন্টারনেটে খোঁজ করে ঠিক খপ করে ধরে ফেলা গেল নর্থ ক্যারোলাইনার কবি শ্রীমতী জুডি হোগানকে। ওর একটা ওয়েবসাইট আছে দেখে আমি চমৎকৃত। কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে সে। জুডির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল অ্যারিজোনাতে বসেই।

আমার মধ্যে যতটা উত্তেজনা, টেলিফোনে জুডির মধ্যে ততটা দেখা গেল না বটে, কিন্তু, তার পরে আমরা যখন কেরিতে, সকালেই জুডি চলে এল তার ছোট্ট ট্রাক নিয়ে মিতা-দিব্যেন্দুর বাড়িতে নীতার খোঁজ করতে। অর্থাৎ, ধরে নিয়ে যেতে। কাছেই ওর গ্রাম, কুড়ি মিনিটের রাস্তা। একগুচ্ছ মুরগির ছানা, একটা প্রচণ্ড তেজি মোরগ, আর তার অসংখ্য সাদা ঘাঘরা লাল টুপি পরা মুরগিদের হারেম, এ-ই জুডির ফার্ম।

অনেক জমি, গাছপালা আছে, বনজঙ্গল আছে, আর আছে একটি লাজুকলতা কুকুর, যে লোক দেখলেই দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে সিঁড়ির তলায় লুকোয়। (সে পালাল এবং একবারও বেরোল না)। এবং আছে ভীষণ মিষ্টি, ভাল্লুকের মতো লোমশ, মোটাসোটা এক বিল্লি, যে এসে পায়ে গা ঘষে ঘষে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাল। মোরগ বাবাজিই ও বাড়িতে পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করেন, দেখা গেল। পালক ফুলিয়ে কোঁকর কোঁ করে আমাদের তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল, যেন খাঁচা ভেঙে এসে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। জুডি সস্নেহে তাকিয়ে সগৌরবে বলল, 'ও বাইরের লোক একেবারে পছন্দ করে না, চলো আমরা ওদিকে যাই।'

জুডির ছোট্ট সাদা কটেজটি, একগাদা সবুজের মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। লম্বা একটা ঘর, একদিকে রান্না, একদিকে ঘুম, আর বাকিটা জুড়ে বই, ছবি, জামা, জুতো, বাচ্চাদের খেলনা

(জুডির নাতি-নাতনিরা আসা-যাওয়া করে), রেডিয়ো, রেকর্ড প্লেয়ার, ছাতা, পাখা কী নেই? হ্যাঁ, টিভি নেই। কিন্তু, গুচ্ছের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নির্বাচনের রাজনৈতিক পোস্টার পড়ে ছিল, গোটানো, খোলা, নানা ভঙ্গিতে। ওখানে ওগুলো বনবাদাড়ের শান্তির মধ্যে খুব বেমানান।

জুডিকে হারানো প্রাপ্তি বলা ঠিক। ফিরতি পথে ওর ফার্মের অর্গানিক খাদ্য সমৃদ্ধ মুরগিদের স্বাস্থ্যকর বাদামি রঙের ডিম, ওর বাগানের মধু, ওর বানানো আঙুরের রস, ওর তৈরি বাগানের ফলের জ্যাম, আর ঘরে তৈরি ব্রাউন ব্রেড নিয়ে ফিরে এলুম। শ্রাবন্তী অবশ্য বগলে জুডির সবগুলো কবিতার বই নিয়ে আসতে ভোলেনি।

ওখানে গিয়ে আশ্চর্য আরও একটা আবিষ্কারও হল। জুডির বন্ধু পল ফোরম্যানের সম্পাদনাতে 'হাইপেরিয়ন' নামে সানফ্রান্সিসকো থেকে যে সাহিত্যপত্র বেরোত, তাতে ১৯৭১-এ এবং ১৯৭৬-এ ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছিল আমার লেখা দুই গুচ্ছ কবিতা। একটি গুচ্ছ আবার বাংলাদেশের কবিতার অনুবাদ। আমাকে নাকি ওরা পত্রিকাগুলি পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি আগে দেখিনি। বই দুটির অতিরিক্ত কপি নেই। কাছাকাছি জেরক্সের দোকানও নেই। জুডি অবশ্য বলেছে জেরক্স করে পাঠাবে কোনোদিন। সে এক অন্য নবনীতা, যে বিদেশে থাকাকালীন ইংরিজি ভাষাতে কবিতা লিখত। তার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল জুডির কল্যাণে। শতবর্ষ পরে। বৃত্ত নয়?

অনেক বছর পরে জেমস বল্ডউইনের সঙ্গেও আমার আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমেরিকার পূর্ব কোণে, ম্যাসাচুসেটস-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার মেয়ে অন্তরা তখন স্মিথ কলেজে পড়ে। আমি ওই অঞ্চলে গিয়েছিলুম তখন হার্ভার্ডে আর কর্নেলে বক্তৃতা দিতে, স্মিথ কলেজেও রিডিং আছে। মেয়ের কাছেও ঘুরে আসছি। অন্তরা বলল, ওরা সপ্তাহে একটা ক্লাস করতে যায় আমহার্স্ট কলেজে, সেদিন জেমস বল্ডউইন পড়ান। শুনেই তো আমি নেচে উঠেছি, 'আমিও যাব, আমাকেও নিয়ে চল।'

'সে কী! তুমি তো নিজেই লেকচার দিতে এসেছ।'

'তাতে কী? শুনতে নেই? সানফ্রান্সিসকোর পরে ওঁকে দেখিনি।'

মেয়ে গাঁইগুঁই করেও শেষকালে নিয়ে চলল। আমেরিকাতে এসব সম্ভব, ধেড়ে ধেড়ে ছাত্রছাত্রী আসে ক্লাস করতে। সেদিন ক্লাসে আমাদের কিঞ্চিৎ তর্কাতর্কিও হল, আর্থ গডেস ও টেরিবল মাদারের কনসেপ্ট নিয়ে। দেখা গেল শক্তি, অর্থাৎ দুর্গা বা কালী বিষয়ে তখনও তাঁর সত্যি বলতে কী, ঠিকঠাক ধারণা ছিল না। দেবী যে টেরিবল মাদারও হতে পারেন, নির্লজ্জা নৃমুণ্ডমালিনী, কিংবা ছিন্নমস্তা, তবুও তিনি ডিমনেস নন, গুডেসই, পূজনীয়া, দেবীমাতৃকা, এ তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছিল।

ক্লাসের শেষে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল ভারতীয় লেখিকা হিসেবে। বল্ডউইন যারপরনাই ভদ্র মেজাজে ছিলেন। কিন্তু হায়, আমার সঙ্গে এবারেও ওঁর কোনো বই ছিল না। কফি খেতে খেতে আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম অনেকগুলো বছর আগের কথা, সেই যে একদিন একটি ভারতীয় মেয়ে এডওয়ার্ড বেলামির বইতে ওঁর স্বাক্ষর চেয়েছিল, সানফ্রান্সিসকোর ফাইভ স্টার হোটেলের অডিটোরিয়ামে। মনে পড়ে?

এরপরে তিনি যদি হেসে আহ্লাদে আমাকে জাপটে ধরে বলতেন, ও হো, তুমিই সেই সুন্দরী, যাকে আমি এতদিন ধরে খুঁজছি? তাহলে গল্পটা জমে যেত। সাধারণত, স্মৃতিচারণে এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু, কপালটা তো আমার? তাই আমাকে যারপরনাই দুঃখ দিয়ে তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না। (হায়, পুরুষ হতাম যদি, তাহলে কি আপনি আমায় মনে রাখতেন না?)

সানফ্রান্সিসকো বললেই আমার আর একজনকে মনে পড়ে। টিলি ওলসন। তাঁর সঙ্গে ভাব হয়েছিল নিউ হ্যাম্পশায়ারে 'ম্যাকডাওয়েল আর্টিস্টস কলোনি'তে যখন দুজনেই ফেলো ছিলুম। আমি তখন সবে পঞ্চাশের ঘরে, আর আশি পূর্ণ করে ওঁর মহাগর্ব! চার মাইল হেঁটে আসেন বরফের মধ্যে। আর অসামান্য কথা বলেন। এমন বয়সের এক তরুণী মেয়ে আমি দেশে-বিদেশে কোথাও দেখিনি।

সে-বছর খুব ঠান্ডা পড়েছিল, সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। টিলি একটুও ঘাবড়াতেন না অত শীতেও, আমাদের সঙ্গে সমানে সমানে হইচই করতেন। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর এবারে খোঁজ করিনি। কী জানি, আছেন কি না! কী জানি জরা তাঁকে জীর্ণ করেছে, কি না? কোনোটাই জানতে চাই না। টিলির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম আমরা।

ইউনেস্কোর হিউম্যান রাইটস-এর দাবির একটা ছোট্ট পকেট-বই উপহার দিয়েছিলেন আমাকে টিলি। আর, তাঁর বই, 'সাইলেন্সেস'। 'টেল মি আ রিডল' তাঁর বিখ্যাত মুক্তির ইতিহাসের বই। 'আই স্ট্যান্ড হিয়ার আয়রনিং' গল্পসংগ্রহ। অসামান্য প্রাণশক্তিতে ছোট্টখাট্ট শুভ্রকেশী টিলিকে একটা ফুলন্ত টগর গাছের মতো দেখাত। কিশোরীর কৌতূহল ছিল তাঁর জীবনের প্রতি, যদিও ঘোরতর বামপন্থী কর্মীর জীবন কাটিয়েছেন— সংঘর্ষময়, বিপ্লবে বিশ্বাসী।

আমাদের জন্য বিশাল এক সারপ্রাইজ উপহার অপেক্ষা করছিল। রিনি-রুপু ৬ জন ব্রুস স্প্রিংস্টিনের কনসার্টে আমাদের জন্যেও টিকিট কেটে রেখেছে। সেই যেবার সারা পৃথিবীর সংগীতজ্ঞদের নিয়ে ব্রুস স্যাটেলাইটে একটা পিস-কনসার্ট করলেন সেই থেকে আমি তাঁর ভক্ত। কনসার্ট হবে কংকর্ডে, সান হোসে থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

রিনি-রুপু খোঁজ নিয়ে জেনেছে পার্কিং লট থেকে অডিটোরিয়াম পর্যন্ত অনেকটা হাঁটা, খানিকটা চড়াইপথে ওঠা এবং সবশেষে গ্যালারিতে সিঁড়ি ভাঙা। কোনোটাই আমার দ্বারা হওয়ার না। অতএব তারা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করে ফেলল চোখের পলকে। এবং হুইলচেয়ার আরোহীদের সিঁড়ি ভাঙতে হয় না, নীচে, সামনেই তাদের আসন নির্দিষ্ট। বেচারি রুপু রিনি নিজেরা টঙে চড়ল। আমি বসলুম, নীচে, সামনে। শামিয়ানার তলায়। টিকিটের দাম একই। চেয়ার ঠেলার কল্যাণে শ্রাবস্তীরও ঠাঁই সেখানে।

আমার পাশে সবাই হুইলচেয়ারে। কত উৎসাহ এদেশে। কত সুবিধা প্রতিবন্ধীদের। গান শুরু হতেই উঠে দাঁড়িয়ে তালি বাজাতে আর তালে তালে নাচতে শুরু করল শ্রোতারা। আমার এপাশের হুইলচেয়ারে বসা মহিলাটিও এঁকেবেঁকে উঠে দাঁড়িয়ে তালে তালে দুলতে থাকেন, হাততালি দিয়ে। আমার মনটা ভরে গেল।

একটা পুরো পার্কিং লট নির্দিষ্ট আছে ভি.আই.পি.-দের জন্য এবং প্রতিবন্ধী শ্রোতাদের জন্য।

প্রতিবন্ধীরা এখানে ভি.আই.পি.। সমস্ত অডিটোরিয়াম গানের তালে দুলছে। তালি দিচ্ছে। কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচছে। না দেখলে সে-উত্তেজনা বর্ণনার নয়।

ব্রুস সিক্সটিজ-এর গান শুরু করলেন। এবার দেখি আমিও দাঁড়িয়ে পড়েছি এবং নেচে উঠেছি। আমি তো একটুতেই নেচে ফেলি, এটা আবাল্য আমার বদ স্বভাব। শরীরের মধ্যে একটা ছন্দে-দোলা সাপ আছে। সাপুড়ের বাঁশি শুনলেই সে অমনি নেচে ওঠে। গান জমে উঠেছে, এমন সময় ব্রুস হঠাৎই গান থামিয়ে দর্শকদের মধ্যে কাউকে লক্ষ করে, তাঁকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানালেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে ভাবছি কে তিনি? কে উঠবেন মঞ্চে?

উঠলেন একজন পরমাসুন্দরী ফ্যাশনবতী মহিলা। ছোটো করে ছাঁটা সাদা চুল, পরনে হালকা সবুজ সিল্কের পাজামা কুর্তা, গলায় ওড়নার মতো সবুজ চাদর দোলানো। মহিলা হাসলেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলমলে সেই হাসি আমাকে নিয়ে গেল এক মুহূর্তে চল্লিশ বছর পিছনে। তখন ব্রুস বলছেন, আমার মহা সৌভাগ্য, যে আজ আমার গান শুনতে এসেছেন স্বয়ং জোন বায়েজ! আমার উত্তেজনা, আমার আহ্লাদ ও বিস্ময় সহজেই অনুমেয়।

সেদিনের দীর্ঘ কালো মেঘের মতো কেশ এখন রজতশুভ্র। ইন্দিরা গাঁধী, সুচিত্রা মিত্রের স্টাইলে ছাঁটা। মুখে বয়সের চিহ্ন নেই। একই দৃপ্ত, মোহনরূপ, শানিত, বুদ্ধিদীপ্ত। যা মুগ্ধ করে, নম্রও করে। মঞ্চে উঠে দর্শকদের হল-ফাটানো সগর্জন অভিবাদন নত হয়ে গ্রহণ করলেন জোন। তারপর ব্রুসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠলেন 'উই শ্যাল ওভারকাম'।

অমনি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ফেটে পড়ল। সকলেই গলা মিলিয়েছে। সবার গলায় সেই শপথের সুর। সেই আত্মবিশ্বাস। চোখে স্বপ্ন, বুকে আকুলতা। সত্যিই তো, আজও তো ঘটেনি সেই উত্তরণ, আজও তো লঙ্ঘন করতে পারিনি সেই বিঘ্ন, যা মানুষকে মানুষের থেকে সরিয়ে রাখছে, দূরত্ব গড়ছে। আমার পাশের ভদ্রমহিলার বয়স আমার চেয়ে কম। হঠাৎ দেখি কখন যেন দুজনেরই রুমাল বেরিয়েছে, আমরা দুজনেই চোখ মুছছি।

বৃত্ত যে এভাবে সম্পূর্ণ হয় কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ শ্রাবস্তীকে যতটা দেখাতে পারব ভেবেছিলুম, তার চেয়ে অনেকটাই বেশি দেখানো হয়ে গেল এ যাত্রায়। কিন্তু বৃত্ত কি সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ হতে পারে? জীবনের গতি তো স্পাইরাল পদ্ধতিতে ঘোরে, চলমান সময়ের একটা মুখ খোলাই থেকে যায়, জীবন যতদিন। চক্র তো নয়, চক্রবৎ!

১৫ অক্টোবর ২০০৬

আমার বন্ধু শ্যামল

শ্যামল আর আমি ক্লাসমেট ছিলাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে প্রথম তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগটি শুরু হল। সেখানে শ্যামল আর আমি ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলাম। আমরা ফার্স্ট ব্যাচ। ওই ব্যাচে আর ছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব আর তরুণ মিত্র। শ্যামলকে আগে চিনতাম না। শ্যামল আমার থেকে বয়সে কিছুটা বড়ো। সে ১৯৩৩ সালে জন্মেছে, আমি ১৯৩৮ সালে জন্মেছি। সে একবার কেমিস্ট্রি, তারপর বাংলা পড়েছে, আবার কিছুদিন একটা কারখানায় কাজ করেছে। শ্যামল তখন গদ্য-টদ্য লেখে, আমি তখনও কোনো গদ্য লিখিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর শ্যামলের সঙ্গে আলাপ হল। আমাদের মধ্যে বেশ ভাবসাবও হয়ে গেল। খুবই আড্ডার সম্পর্ক ছিল। শ্যামল খুব ইয়ার্কি মারত। শ্যামলের মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি। দেখিনি বলছি এ কারণে যে শ্যামলের ইমাজিনেসন আর সেন্স অফ হিউমার সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। কারণ আমি এর আগে অত্যন্ত সিরিয়াস ধরনের ছাত্রদের সঙ্গে পড়ে এসেছি, এই ধরনের রসিকতা আগে দেখিনি। ওর রসিকতার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যেত না সব সময়, কিন্তু আমরা হেসে অস্থির হতাম। একদিন ও ধুতি-পাঞ্জাবি আর বুট জুতো পরে এল। তখন একটা নতুন ঘর তৈরি হয়েছিল, সেই ঘরে আমরা আড্ডা মারতাম। শ্যামল আমাদের বলল, তোমরা চল ওখানে, একটা জিনিস দেখাব। আমরা সেই ঘরে গেছি। শ্যামল কোমরে একটা হাত আর কপালে একটা হাত দিয়ে স্প্যানিশ ক্যাপ ডান্স দেখাল আমাদের। এই নাচ ও কোথায় দেখেছে, কি করে শিখেছে সেটা আমরা জানি না। খটাখট খটাখট বুটে বুট ঠুকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই শ্যামল সেদিন ভীষণ নাচল। আমরা আগে কোনোদিন ক্যাপ ডান্স দেখিনি।

মীরা বলে, একটি মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। সে সময় ও সারাক্ষণ আমাদের মীরার গল্প বলত। কেউ শুনতে চাইত না, খালি আমি বসে বসে শুনতাম। কারণ আমি ক্লাসে বয়সে সব থেকে ছোটো আর একমাত্র মেয়ে ছিলাম। ওর প্রেম কাহিনি শুনে খুব মজা পেতাম। অবশ্য ও মজা করেই বলত। ওর নিজস্ব কৌতুকের একটা রুচি ছিল। ওকে না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। প্রথমে বোঝাই যায় না যে ও রসিকতা করছে। কতটা সিরিয়াসলি বলছে, সত্য না মিথ্যা বলছে— কিছুই বোঝা যায় না। এই ভাবে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কখনো মনে পড়ে না যে শ্যামলের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে।

কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় এল, শ্যামল পরীক্ষা দিল না। ও কিন্তু দু-বছরই পড়েছিল। পরীক্ষা না দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। দিলে পাশও করত। ও যে আধখানা পড়েছে, বাকিটা পড়েনি তাও নয়। জাস্ট ওর মনে হল পরীক্ষা নেওয়ার দরকার নেই, ডিগ্রি নেওয়ার দরকার নেই— ও পরীক্ষা দিল না। আমরা দিলাম।

তারপর আমি বিদেশে চলে গেলাম। ১৯৬১ সালে শ্যামলের উপন্যাস 'বৃহন্নলা বের হল। এ রকম একটা বই আমরা আগে পড়িনি। লেখাই হয়নি তো আমরা পড়ব কি করে। বাংলা সাহিত্যে এ রকম বই আগে রচিত হয়নি। পরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঘুণপোকা বেরিয়েছে— অনেক পরে। শ্যামলের এই বইটা যে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে লেখা তাও নয়। 'বৃহন্নলা' পড়ে আমি অন্যরকম এক শ্যামলকে চিনলাম।

তখন আমি বিদেশে থাকি। শ্যামলের সঙ্গে খুব একটা যে যোগাযোগ ছিল তাও নয়। প্রতি বছর যখন একবার করে দেশে আসতাম, তখন যোগাযোগ হত। তারপর শ্যামলের বিয়ে হল। ইতির সঙ্গে আমার খুব ভাব হল।

এরপর যখন দেশে ফিরে এলাম তখন শ্যামলের দুটি মেয়ে— মলি আর ললি। একদিন দেখি শ্যামল মলির সঙ্গে খুব নাচছে, আর একদিন দেখলাম শ্যামল মলির ফ্রক পরেছে। এমন মজার মানুষ শ্যামল।

শ্যামল একবার সত্যি সত্যি একটা এরোপ্লেন কিনেছিল চার হাজার টাকায়। বলেছিল সেই এরোপ্লেনটাতে ও আমাদের সকলকে উঠিয়ে রাস্তা নিয়ে গাড়ির মতো চালিয়ে নিয়ে যাব। এরোপ্লেনটা আকাশে উড়বে না, কারণ ওড়ানোর জন্য পেট্রোল ও কিনতে পারবে না। তারপর ওটা বেহালা এয়ারপোর্টে পড়ে থাকল। তারপর যে কোথায় গেল জানি না। অনেকবার দেখতে চেয়েছি, কিন্তু সেই এরোপ্লেন আমি একবারও চোখে দেখিনি। কেউ কেউ বোধহয় দেখেছে। সবটা কিন্তু ওর বানানো নয়।

ওর পুরো জীবনটা অন্য রকম ছিল। একবার জমি কিনতে আমাদের সকলকে চম্পাহাটিতে নিয়ে গেল। ওর অনেক পরিকল্পনা ছিল। চম্পাহাটিতে ও গ্রাম বানাবে, অনেক কিছু করবে। সে সময়ও আমি এদেশে থাকি না, বিদেশেও থাকি। উৎসাহের সঙ্গে আমরা চম্পাহাটিতে গেলাম। কেউ কেউ জমি কিনল। আমারও কেনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি তো রোজগার করি না, আমার টাকা ছিল না। যাই হোক, আমার কেনা হল না। তারপর চম্পাহাটির ব্যাপারটা আর এগোল না, শ্যামলের যে রকম কল্পনা ছিল সে রকম আর হয়ে উঠল না। তারপর তো নিজেও থাকল না চম্পাহাটিতে।

শ্যামলের মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি। ওর সমসাময়িক যারা আছেন, তারা শ্যামলের মত নন। শ্যামল শহুরে মানুষ। শহরের মানুষ না হলে 'বৃহন্নলা'র মতো বইয়ের ভাবনা ওর মাথায় আসত না। সেই জন্যে আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে যে, ও কী করে একই সঙ্গে শহুরে আর গ্রাম্য। সে 'বৃহন্নলা' লিখতে পারে আবার 'কুবেরর বিষয়-আশয়'ও লিখতে পারে।

শ্যামল আমার সঙ্গে অনেক ইয়ার্কি মারত। যখন একসঙ্গে পড়তাম, শ্যামল আমাকে বলত, তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি বলতাম, না, আমি তোমাকে বিয়ে করব না। আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে শ্যামল আমাকে বলল, তুমি তো বিয়ে করে ফেললে। আমাকে করলে না। আমি বললাম, আমি কখনো বলিনি যে, তোমাকে বিয়ে করব। শ্যামল তার উত্তরে বলল, না, পঞ্চাশ বছর বয়সে তুমি আমাকে বিয়ে করবে।

শ্যামল নিজে বিয়ে করার পর ইতিকে বলত, ইতি, আমার পঞ্চাশ বছর বয়সে তোমার একটা সতীন হবে। আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হলে কিন্তু নবনীতাকে বিয়ে করব। ইতি বলত, হ্যাঁ কর

না। নবনীতার বয়েই গেছে তোমাকে বিয়ে করতে। পরে তো সত্যি সত্যিই আমার বিয়ে ভেঙে গেল।

তারপর পঞ্চাশ বছর বয়স হলে শ্যামল আমাকে ফোনে ধরেছে— ইতির সঙ্গে কথা বল। ইতি বলেছে, নবনীতা, তোমার বন্ধু বলছে এবার তো পঞ্চাশ বছর বয়স হল, তুমি ওকে বিয়ে কর। আমি বললাম, ইতি, তুমি তোমার জীবন দিয়ে বুঝেছ, ওকে বিয়ে করলে কি আমার কোনো উপকার হবে? ইতি বলল, আমি তো তা বলিনিদ। ও যা বলতে বলছে আমি তাই বলছি। আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি না। আমাদের মধ্যে এইরকম মজার সম্পর্ক ছিল। আমার একটা মুক্ত, সরল সম্পর্ক ছিল শ্যামলের পুরো পরিবারের সঙ্গে। ওর মেয়েদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। ওর বড়ো মেয়ে মলি যখন এখানে লেক গার্লস স্কুলে পড়ত, স্কুল থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝেই আমার সঙ্গে গল্প করে যেত। ললি যখন ডাক্তার হল আমার গর্বের সীমা ছিল না। ললির বিয়ে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়ায় আমার শ্যামলের ওপর রাগ ছিল কিন্তু ওর দুই জামাই ওর দুই পুত্র সন্তান হয়ে উঠেছিল।

আমার ভাবতে খারাপ লাগে যে, এখন আমি আর ওদের সঙ্গে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ রাখিনি। শ্যামল যতদিন অসুস্থ ছিল ছোটাছুটি করেছি। ললির বাড়ি গেছি, হাসপাতালে গেছি— সবই করেছি। কিন্তু তারপর না রাখি ইতির খবর, না রাখি মলি-ললির সঙ্গে যোগাযোগ। আমার কর্তব্যে নিশ্চয়ই ত্রুটি হয়, কিন্তু আমি আর পেরে উঠি না। অন্তত ইতির খবর আমার নিশ্চয়ই রাখা উচিত ছিল। কিন্তু ওদের কথা আমার মনে হয় ঠিকই।

আমরা ওর বন্ধু, ও জীবনের ভিতরের লোক নই, বাইরের লোক। আমরা শ্যামলকে টোটাল ব্যক্তিত্ব হিসেবেই ভালোবেসেছি। ওকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে, কাছে টানতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমার প্রতি ওর স্নেহ আর ভালোবাসা ছিল, ব্যবহারের মধ্যে মজা ছিল; শ্যামলের কাছ থেকে আমি কোনোদিন কোনো আঘাত পাইনি।

শ্যামল পুরোপুরি পারিবারিক মানুষ ছিল। বাড়ি অন্ত প্রাণ। মা, বাবা, ভাই, মেয়েদের অসম্ভব ভালোবাসত। ইতিকে ভীষণ ভালোবাসত। ইতিকে ও নিজের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিল। ও সর্বদা পরিবারের সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে থাকার, একসঙ্গে সব কিছু করার চেষ্টা করত। ইচ্ছা করলে ও করিৎকর্মা হতে পারত। ব্যবসাবুদ্ধিও ওর ছিল। কিন্তু সে সব দিকে ও মনোযোগ দেয়নি। দিলে কিন্তু ও সেদিকেও উন্নতি করতে পারত। ওর নানা ধরনের কল্পনাশক্তি ছিল। সেই সব কল্পনাশক্তিকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে অনেক কিছুই হতে পারত।

শ্যামলকে আমি একজন খুব জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ আর একক শিল্পী বলে মনে করি। ওর সঙ্গে তুলনীয় কোনো শিল্পী শুধু পঞ্চাশের দশকে কেন, আগে ও পরে, কখনোই আমি দেখিনি।

ওর একটা দোষ ছিল। একটা লেখা ও যত যত্ন করে শুরু করত, তত যত্ন করে শেষ করত না। ওর অনেক লেখাতেই এটা আমার চোখে পড়েছে। যেভাবে লেখাটা শেষ করা উচিত ছিল, সেভাবে ও শেষ করত না। হয়ত ধৈর্যচ্যুতি বা অন্য কিছু হত। কিন্তু ওর ইমাজিনেসন, ভিসন, শব্দ ব্যবহার, সাহস বা দুঃসাহস সবই— যা ওর মধ্যে দেখেছি, সেটা তুলনাহীন।

শ্যামল খামখেয়ালি ছিল। অবশ্য খামখেয়ালি তো আমরা অনেকেই আছি। তবু কতকগুলো বেসিক সামাজিক নিয়ম, সৌজন্য মনে চলি। কিন্তু শ্যামল সেটা করত না। তার কারণ শ্যামলের

ট্যালেন্টটাই ছিল লাগামছাড়া। তাহলে একটা বিশেষ জায়গায় এসে লাগাম আসবে কোথা থেকে। এটা আশা করা যায় না। ওর কোনো লাইন-টানা ব্যাপার ছিল না। এটা করা যায়, ওটা করা যায় না— এসব ও মানত না। জীবনেও মানেনি, লেখাতেও মানেনি। এর জন্য ওকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আনন্দবাজারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণ এটাই। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে রকম। এই স্বেচ্ছাচারটা শ্যামলের ট্যালেন্টের সঙ্গে যুক্ত একটা দিক। শ্যামলকে বাংলা কথাসাহিত্যের শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলা যায়।

বাংলা কবিতায় শক্তির যে ইম্প্যাক্ট পড়েছে, বাংলা কথাসাহিত্যে শ্যামলের ইম্প্যাক্ট পরবর্তী প্রজন্মের লেখায় ক্রমশ ফুটে উঠেছে। এ ধরনের শিল্পীদের জন্য অনিঃশেষ সময় অপেক্ষা করে। আশি-নব্বইয়ের দশকে বেশ কিছু শক্তিমান গদ্য লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের লেখায় গ্রামের কথা উঠে আসছে। এদের লেখায় শ্যামলের লেখার প্রভাব দেখা যায়।

জীবদ্দশায় শ্যামল তাঁর প্রাপ্য সম্মান পায়নি বটে, কিন্তু বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হবে আর শ্যামলের কথা থাকবে না, এটা হতে পারে না। ও যে পুরস্কারগুলো পেয়েছে সেগুলো যদি নাও পেত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। কেননা বাংলা সাহিত্যে ও একটা নতুন দিক এনেছে, যেমন করে ওর আগে কেউ লেখেনি। শ্যামল সব কিছুই ভিতর থেকে দেখতে জানত। ওর সেই অর্ন্তদৃষ্টি ছিল। ওর লেখার ফলে, অনেক বছর বাদে, অনেক নতুন লেখক লিখতে শুরু করেছেন যাদের উপর ওর লেখার প্রভাব পড়েছে। এটা ভুললে চলবে না 'বৃহন্নলা'র অ্যান্টিহিরে 'বিবর' এবং 'ঘুণপোকা'র আগে জন্ম নিয়েছে।

শ্যামল বিদেশি সাহিত্য যা পড়েছে, ভালো করেই পড়েছে। রেজারেকসন ওর খুব প্রিয় বই ছিল। আমাকে শ্যামল বিভূতিভূষণ আর দস্তয়েভস্কির কতা বলত। ওর উপর দস্তয়েভস্কি প্রভাব যে নেই তা বলা যাবে না। শ্যামল বলত ওর ওপর তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব আছে। ওঁদের কাছে শ্যামল শিখেছে নিশ্চয়ই। ওঁরা শ্যামলকে গ্রামজীবন চিনিয়েছেন কিন্তু শ্যামল জীবনকে দেখেছে একেবারে আলাদা এক নিজস্ব দৃষ্টিতে। সেটা শ্যামলের বৈশিষ্ট্য। তুলনামূলক বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্যামলের তবু যদি কিছু মিল পাওয়া যায়, বিভূতিভূষণের পৃথিবী, এমনকি তারাশঙ্করের পৃথিবী আর শ্যামলের পৃথিবী এক নয়।

জীবিতকালে সাহিত্য রসিকদের কাছে শ্যামল যথোচিত স্বীকৃত পায়নি। স্বভাবতই তার স্বভাবদোষে যে চতুর্দিকে শত্রু তৈরি করেছিল। না পেয়েছে যথেষ্ট অর্থ, না সম্মান। যা যা ওর প্রাপ্য ছিল, তা সে পায়নি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যামল যখন চলে গেছে, তখন ওর যাওয়ার সময় হয়নি। শ্যামল তো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। তাই আমার মনে হয়, শ্যামল বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে বাংলা সাহিত্যের অনেক লাভ হত। ও আরও লিখতে পারত, বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দিতে পারত।

শ্যামলকে আমি মিস করি।

মিমি আর জ্যোতি

১। কবিতা ভবন

মিমি-রুমিকে চিনি কবে থেকে, 'কবিতা-ভবনে'। কিন্তু মিমি-জ্যোতিকে চিনি ১৯৫৪ থেকে, আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে গেলুম। কো-এড কলেজে পড়ার প্রথম শিক্ষা, ভর্তি হয়েই মেয়েদের কমন গ্রুপের গল্পে শুনলুম, কলেজে কয়েকজন প্রখ্যাত সাহসী প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল আছেন, সমীর-মনীষা, সুপ্রিয়-রিক্তা, জ্যোতি-মীনাক্ষী। তখন কলকাতা শহরে মধ্যবিত্ত জীবনে খোলাখুলি প্রেম প্রণয়ের চল ছিল না, সুযোগ তো নয়ই। আমরা তো জানতুম ভালো মেয়ে আর মন্দ মেয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য, ভালো মেয়েরা প্রেমে পড়ে না। বা পড়লেও, বেচারী মা বাবা মুখ চেয়ে তা চেপে যায়। অক্লেশে প্রেম ঘোষণা করে শুধু খারাপ মেয়েরা। এ-হেন সামাজিক আবহাওয়ায় আমরা কিশোরী থেকে যুবতী হচ্ছি।

আজ বলতে অসুবিধে নেই, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত পাড়ায় 'কবিতা-ভবন' বাড়ির ভারি নিন্দে ছিল, ওবাড়ির মেয়েরা একটু পুরুষ ঘেঁষা। ঘরে অত সুন্দর মেয়ে, আর অল্পবয়সি ছেলেরা ওখানে সারাক্ষণ যাতায়াত করছে। আরও নিন্দের কথা, এ নিয়ে ওদের মা বাবা কিছুই বলেন না। মুক্ত মঞ্চ। ওখানে ছেলেতে মেয়েতে মেলামেশায় বাধা নেই। রাখ ঢাক নেই, সব খোলাখুলি। তাই, ও-বাড়িতে গেলে ছেলেদের তো বটেই, বিশেষ করে মেয়েদের স্বভাব চরিত্তির ঠিক থাকা কঠিন! বিয়ে থা দিতে হবে তো? পাড়ার এই খবরটা সব বাড়িতেই চাউর ছিল, আর আমার মা জানতেন না, এমনটা আমার মনে হয় না। কিন্তু তিনি পাড়ার অন্য মায়েদের মতো আমাকে বারণ করেন নি ওবাড়িতে যেতে। মীনাক্ষী সেই কবিতা-ভবনেরই মেয়ে। সবচেয়ে বড়ো মেয়ে। মিমি। রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মা বাবার সঙ্গে তার ছবি আছে। ওর নামই তাঁরই দেওয়া।

এদিকে কিছুদিন কলেজে গিয়ে আমি দেখলুম যে, যে সকল মন্দ মেয়ের গল্প শুনেছিলুম, যা নাকি প্রেমে গদগদ হয়ে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নির্লজ্জের মতো যতো রাজ্যের পুরোনো বই ঘাঁটে, তাদের সঙ্গী গুলিকে কেউই 'খারাপ ছেলে' বলে না। মেয়েগুলিও স্বাভাবিক, ভদ্র, সভ্য। সকলেরই আচরণ অভিজাত। সমীর-মনীষা, সুপ্রিয়-রিক্তা চারজনেই সিরিয়াস টাইপের ছেলেমেয়ে। প্রেম করলে কী হবে, দুর্দান্ত ভালো ছাত্র ছাত্রী, মাথা ঠান্ডা। মীনাক্ষীও তাই। শুধু সমস্যা ওই জ্যোতিকে নিয়ে। গুজব, ওরা নাকি এখন বিয়ে করতে চায়। হ্যাঁ, বিয়ে! মাথা খারাপ ছাড়া আর কী? কেউ কিছু করে না, পড়াও সমাপ্ত হয়নি। জ্যোতির্ময় দত্ত ছেলেটা শুনলুম প্রচণ্ড ব্রিলিয়ান্ট, অল্প বয়সে বেশি বেশি পড়ে ফেলেছে এবং একেবারে পাগল। মীনাক্ষী বসু ব্রিলিয়ান্ট হলেও একেবারেই পাগল নয়। ছেলেটার চেয়ে বয়সে খানিকটা বড়ো বলে, নিজেই নিজেকে ওর গার্জেন বানিয়ে ফেলেছে মীনাক্ষী। ওর পাগলপনা অনেকটাই সামলে রাখে। এই সংবাদ পেলুম মেয়েদের কমন রুমে। ছাত্রীরা বলাবলি

করছিল, 'আহা, এই ক্ষ্যাপা ছোকরার সঙ্গে প্রেম করে' তো মীনাক্ষীর অবস্থা কাহিল— জ্যোতির জন্যে উদ্‌বেগে, ওকে সামলাতে সামলাতে, মীনাক্ষীর চেহারা কেমন দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে দেখেচিস? আগে কতো বেশি সুন্দরী ছিল।' সময়টা ১৯৫৪। কিন্তু আমি তো মীনাক্ষীকে অনেকদিন দেখছি। কই তেমন কিছু 'দড়ি পাকানো' চেহারা তো দেখলুম না মিমির? হ্যাঁ একটু বুঝি বিষণ্ণ, একটু চিন্তিত, আপন মনে অন্যমনস্ক হয়ে কমনরুমের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতেই সে তন্বী মেয়ে। আমার তো বাপু মিমিকে সব সময়েই পরমা সুন্দরী মনে হোতো, সেই ছোটোবেলা থেকেই। কলেজেই তাও, আজও। এখনও, এই ২০১৩-তেও, মিমিকে একই রকম মনীষা-উজ্জ্বল রূপবতী মনে হয়। চুলের সেই ঢাল এখনও রয়েছে। হয়তো মাঝে মাঝে একটু ক্লান্ত, কিন্তু অসুন্দর কদাচ নয়। তার মায়ের মতো, বোনের মতো, স্বভাবসুন্দরী মেয়ে সে। মিমির প্রতি আমার আবাল্য অবিচল শ্রদ্ধা— প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা ইত্যাদি সব মিলিয়ে পর্বতপ্রমাণ মুগ্ধতা। আমি ছোটোবেলাতে রুমির বন্ধু ছিলুম, আর মিমির অ্যাডমায়ারার। মিমি ছিল আমার বন্ধুর দিদি। বড়ো হয়ে, যে বয়েসে সব মেয়েই সমবয়সিনী, কখন যেন আমি নিজের অজান্তেই মিমিরও বন্ধু হয়ে গিয়েছি এবং জ্যোতিও। জ্যোতি অন্তরে অন্তরে শিল্পী আর শিরায় শিরায় বুদ্ধিজীবী, কৃশকায়, একমুখ ঝলমলে হাসি, আর একমাথা উথালপাথাল চুল, বই আর ছবি নিয়ে মেতে আছে, একদম পাগলা জগাই, পুরো নায়ক মেটিরিয়্যাল। মিমি তার বিপরীত। তার ব্যালান্স কিছুতেই নষ্ট করা যায় না। জীবন নানাভাবে চেষ্টা করে হার মেনেছে। সে শালগ্রাম শিলার মতো স্থির থাকে।

আমার জন্ম ঠিক দুই বোনের মাঝখানে, মিমির চেয়ে ছোটো, আর রুমির চেয়ে বড়ো আমি। মাসিমা প্রতিভা বসু তাই আমাকে আদর করে ডাকতেন 'আমার মেজো মেয়ে', পাপ্পাও বলত ইয়ার্কি মেরে আমাকে তার 'মেজদি'। জ্যোতি মিমির গল্প লিখতে বসে কেবলই মনে আসছে তাদের মুখ, যারা আর আমাদের মধ্যে নেই। আর থাকলেও এইবই তাদের চোখে পড়বে কিনা সন্দেহ। তাদের নিয়েই আমার ওবাড়ির সব স্মৃতি, সব স্বপ্ন দেখার শুরু। মিমি আর জ্যোতি আমার কাছে জুটিবাঁধা খণ্ডিত অস্তিত্ব নন, ওঁদের সঙ্গে গেরো বেঁধে অনেক মানুষজনের মুখ ভিড় চলে আসে মনের মধ্যে। কবিতা-ভবনের আড্ডা সবাইকে মিলিয়ে। খুদে পাপ্পা, আরও খুদে কুশু। বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, নরেশ গুহ, অশোক মিত্র, অরুণ সরকার, অম্লান দত্ত, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাগরময় ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ। এদের মধ্যে আমাদের আশীর্বাদ করতে আছেন কেবল অশোকদা! আর ওই বাড়িতেই ওপরতলায় ছিলেন কবি অজিত দত্ত, কাকিমা, তাঁদের ছেলেরা বাবুলদা, শঙ্কু, টুটু, ছোটো কুশু আর শ্যামলা সুন্দরী মেয়েটি, ঝুমা। ওদিকে ওই দুই কামরার মধ্যেই হই হই করে মহানন্দে এসে বাস করে মিলি মহুয়া মল্লিকা লালারা, রুমির মামাতো ভাইবোনেরা। প্র-ব তাদের মায়ের মতো করে যত্ন করতেন, তিনিই তাদের অভিভাবিকা ছিলেন। বু ব-কে যারা 'পিসেমশাই' না ডেকে 'বন্ধু' ডাকতো। বয়েসে সব চেয়ে বড়ো, স্নেহপ্রবণ ও দায়িত্বপূর্ণ স্বভাবের গুণে মিমি ছিলেন এদের সকলের লিডার। দিদি বলতেই সম্ভ্রমে সবাই খাড়া। যেন আর একটি মা। মিমির চেয়ে বড় ছিল শুধু বাবলুদা। জ্যোতির প্রথম উল্লেখযোগ্য স্মৃতি মনে পড়ছে, রুমির ১৬ বছরের জন্মদিনের উৎসবে, জ্যোতি সুশ্রী খাঁচায় ভরে ১৬টি কলকাকলিরত চিনিয়া মুনিয়া পাখি উপহার দিয়েছিলেন। রথের মেলার জিনিস, জ্যোতি জানুয়ারি মাসে কোথা থেকে যে পেলেন! আর সেদিন একটা দুষ্টু খেলা হয়েছিল

জ্যোতির বুদ্ধিতে, একজন করে অতিথিকে ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া হবে, তা পরে ঘরের লোকেরা তাঁর বিষয়ে খুশিমতন ভালোমন্দ মন্তব্য লিখবেন কাগজে। ঘরে ফিরে এসে মন্তব্যগুলো শুনে তাঁকে বলতে হবে কে কোনটা লিখেছেন। খুব হুল্লোড় হয়েছিল, সকলেই মজার মজার মন্তব্য লিখেছিলেন। নরেশদা চিরদিন খুব সুন্দর পোশাকপত্তর পরে সেজেগুতে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর বেলায় আমি চিমটি কেটে লিখেছিলুম, 'শ্রীযুক্ত নরেশ/সুকবি তাঁহারে বলি কি না বলি/বলবো সুবেশ!/' নরেশদা কেন, কেউই ভাবতে পারেননি অষ্টাদশী আমিই এর পাজি লেখক। রুমির ১৬ বছর পূর্ণ মানে তার ঠিক চারদিন পরেই আমার ১৮ বছর পুরবে। মিমির ২০/২১ হবে অক্টোবরে।

কবিতা-ভবনে কত লেখক, সম্পাদক,-অধ্যাপক আসতেন, সব আলোচনাই হত লেখালেখি নিয়ে, বইপত্র নিয়ে, নতুন লেখা, নতুন বই-এর আলোচনা। নিজেদের এবং অন্যদের। নতুন নাটক, সিনেমাও থাকতো না তা নয়। বু-বর ঘরের সেই সব আলগা আলোচনা কানে গেলেও আমাদের সারাক্ষণই বিদ্যার্জন হত, কোনো না কোনো নতুন জিনিস শেখা হত রোজ।

২। ব্রড স্ট্রিট

ব্রড স্ট্রিটে জ্যোতিদের বাড়িতে ছিলেন আর একদল হুল্লোড়ে মানুষ। জ্যোতির বাবা, মা-ও খুব লোকজন ভালোবাসতেন, স্বভাবত অতিথিপ্রবণ মানুষ ছিলেন। বাড়ি ভর্তি ছিল ছেলেমেয়েতে। জ্যোতি। আলো। দিদিরা। বোনেরা। ভাইয়েরা। ফ্রেড! একজনের পরে একজন। কত মানুষ যে তখন প্রাণের কাছাকাছি ছিলেন, কত মানুষকে যে হারিয়ে ফেলেছি। কোনো আপতিক কারণে, যে সরু লাল আলতাপেড়ে, সবুজ, নরম খুব পুরোনো শাড়িটা পরে লিখছি, সেটা আমাকে দিয়েছে পাপ্পা। সে কিনে রেখেছিল ভাইফোঁটার জন্যে, তিন বোনের তিনটে শাড়ি। কিন্তু তাকে ভাইফোঁটা দেওয়ার সুযোগ মিমি, রুমি বা আমি আর কোনোদিনই পাইনি। মিমি চোখভরা জল নিয়ে ভাইফোঁটার আগে এসে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন এই শাড়িটা।

আমার মা বাবার সঙ্গে আমিও জ্যোতিমিমির বিয়েতে গিয়েছিলুম ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োয়। সৌরীন সেনের ব্যবস্থাপনায় বিয়ের সভা আলো দিয়ে ফুল পাতা দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল। এরকম খোলামেলা 'বিয়েবাড়ি' আগে কখনো দেখিনি। এই প্রথম দেখলুম, বরবউ একজায়গায় থিতু হয়ে বসে নেই। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে অতিথিদের মধ্যে। স্টুডিয়োতে যে সত্যিকারের বিয়েও হয়, জানতুম না। তখনকার দিনে কিন্তু বিয়েবাড়ি ভাড়াও নেওয়া হত না। নিজের বাড়িতে জায়গা না থাকলে, আত্মীয় বন্ধু, চেনাশোনা আর কারুর বাড়ির ছাদে; কি উঠোনে, কিংবা বাগানে, অথবা কারুর ফেলে রাখা জমিতে ম্যারাপ বাঁধা হত, ভিয়েন বসত। সবাই সাহায্য করতেন। সেই প্রথম এরকম বাড়ির বাইরে বিয়ের উৎসব দেখলুম। প্রগাঢ় বিস্ময় এবং মুগ্ধতা জেগেছিল। সেই প্রথম বিয়েবাড়িতে শুনলুম শুধু সই করে বিয়ে হবে। বিয়ে বাড়িতে আধুনিকতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। বু-ব, প্র-ব-র কাছে আমি অন্তরে-বাইরে আধুনিকতার অনেক কিছু শিখেছি, আধুনিকতায় হাতেখড়ি আমার ওই বাড়িতে। আজ যে মানুষটি হয়েছি আমি, তার অনেকখানিই বু-ব-র নিজের হাতে গড়ে দেওয়া। ভালো দিকগুলির প্রতিটির জন্যেই দায় তাঁর, আর আমার মায়ের, মন্দ দিকগুলো আমার নিজস্ব।

মিলি মল্লিকা লালা মহুয়াদের 'পিসেমশাই' সম্বোধন থেকে মুক্ত দিয়ে নিজেকে 'বন্ধু' ডাকতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু জ্যোতির ছেলেমানুষী ঔদ্ধত্যে কিঞ্চিৎ হতচকিত হয়ে পড়েননি কি বু-ব? এ কেমন জামাই, কোনো নিয়মই মানে না? শ্বশুরক সম্বোধন করে 'বু-ব' বলে, আর শ্বশ্রুমাতাকে 'প্র-ব'? শুনেছি তিনি নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ওয়েইট, আয়াম গোইং টু গিভ য়ু হেল!' সুপরিপক্ক জামাই তার উত্তরে হাস্যবদনে বলেছিলেন, 'বাট য়ু হ্যাভ অলরেডি গিভন মি হেভেন, বাই গিভিং বার্থ টু মীনাক্ষী!'

এত অল্পবয়সি বর-বউও আমি আগে দেখিনি কিন্তু। স্বভাবে অসম্ভব পাকা হলেও নেহাৎই কচি বয়সের বিয়ে জ্যোতি-মিমির, ১৮/২০? বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে, প্রেম করতে করতেই একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে দুজনে। বড়ো হতে হতেই বিয়ে তো, হয়তো তাই শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা জ্যোতি-মিমি দুজনেই যারপরনাই সহৃদয় ছিল। দুই বাড়িতেই তারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল, দুই পক্ষেই ছিলেন দেহে-মনে তরুণ, উদার, স্নেহপ্রবণ শ্বশুর শাশুড়ি। দুজনেই পরস্পরের পরিবারকে সম্পূর্ণ নিজের করে বুকে ভিতরে টেনে নিয়েছিল, যার সহজ প্রমাণ আমার সঙ্গে মিমির শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলির হৃদয়ের যোগ তৈরি করে যাওয়া।

'কবিতা-ভবনের' মতো করে নয় বটে, কিন্তু মিমিরই সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে বাঁচার স্বভাবের কল্যাণে জ্যোতির মা বাবা ভাই বোনেদের সঙ্গে এক সময়ে আমার নিজেরও যথেষ্ট ভাব ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। মিমিদের ছোট্ট পরিবারের ঠিক বিপরীত ছিল জ্যোতিদের বিপুল পরিবার, ওরা পরপর অনেকগুলি ভাইবোন, বিভিন্ন বয়েসের, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গী। আমার যে কী ঈর্ষা হত ওদের অমন ভাইবোনে থইথই পরিবারটিকে! আমার বাড়িতে ছোটো বলতে তো আমিই, এমন একলাটি টিম টিম করছি, আর ওদিকে জ্যোতির বাড়িতে কমবয়সি সদস্যদের গুণে শেষ করা যাচ্ছে না! স্নেহের সম্পদে এতই ঐশ্বর্যবান ওরা! শুধু তো ওরাই নয়, বাড়িতে ওদের দিদিদের বাচ্চারাও ছিল। ও বাড়ির সবাইকেই বিভিন্ন কারণে আমার খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হত। প্রত্যেকেরই মানুষ হিসেবে আলাদা চরিত্র, আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবা খুব ব্যস্ত, কিন্তু পরিবারকে জড়িয়ে বাঁচেন। ওদিকে কোল ভর্তি অত সন্তান নিয়েও সখ মেটেনি মাসিমার। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে মুগ্ধ একটি মার্কিন ছেলে, ফ্রেড ডেভিসকেও সন্তানস্নেহে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। তাকে ডাকতেন 'বড় ছেলে' বলে। (কাউকেই অবাক না করে!) ফ্রেড হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার জামাই। দত্তবাড়ির জামাই হওয়া নাইবা হল? ফ্রেড এখন নিউ ইয়র্কে ভারতীয় সংস্কৃতির বিখ্যাত স্কলার। কলকাতার ভাই বোনদের প্রতি বড় ভাইয়ের পারিবারিক দায়িত্ব তিনি ভালোবেসে পালন করে গিয়েছেন বিদেশ থেকেও। জ্যোতির এক বোন চলে গেলেন জার্মান ছেলে (নাম বোধ হয় ক্লাউস)-কে বিয়ে করে জার্মানিতে। সেই মেয়ে কখনো সুইজারল্যান্ডে কখনো হৃষীকেশে উপস্থিত হয়ে যেতেন কোনো হিন্দু আশ্রম। আর এক দিদির শ্বশুরঘর হল ইসলামধর্মী। বড়ো দিদির যমজ মেয়ে। এই দিদিকেই বউ করার ইচ্ছে ছিল ফ্রেডের, কিন্তু বড়দির ছিলেন অন্য প্রণয়ী, উনি তাঁকেই বিয়ে করেছিলেন। তবুও ফ্রেডের সঙ্গে ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোনো দিনই কমেনি। জ্যোতির্ময় তো এই বাড়িরই ছেলে! জ্যোতির ছোটো ভাই আলোকময় ছিলেন জ্যোতির মতোই স্বভাবশিল্পী, একসময়ে কলকাতার উচ্চকোটির মানুষদের বাড়িতে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে তাঁর খুব যশলাভ হয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

বসার ঘরটির দেওয়াল কারুকাজ করা পোড়ামাটি টালি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন আলোই। আমার ননদ মঞ্জু (সুপর্ণা দত্ত)র সঙ্গে একসময়ে বেশ বন্ধুত্ব ছিল আলোর।

দাদার মতোই আলো-ও বিয়ে করলেন। ওই ২০২ 'কবিতা-ভবন' বাড়িরই আর এক রূপবতী কন্যা, কবি অজিত দত্তের একমাত্র মেয়ে ঝুমা-কে। খানিকটা ছোটো বলে একটু অবহেলিত হলেও মিমি রুমির সঙ্গে ঝুমাও ছিল আমাদের কৈশোরের সাথী। সেই ঝুমাই সবাইকে তাক লাগিয়ে হয়ে উঠেছেন আজকের বিশ্ব-কাঁপানো সিদ্ধনারী, প্রথম ভারতীয় পুরুষের ফ্যাশন ডিজাইনার, শর্বরী দত্ত। তার স্বামী আলো আর নেই। পড়া খালি করে সবাই পালাতে শুরু করেছে যে। ওদিকে ঝুমার ভাই, ছোটো কুণ্ডও নেই, রামভক্ত হনুমানের মতো পাপ্পার একান্ত ভক্ত শিষ্য ছিল সে, পাপ্পার পিছু পিছু সেও পলায়ন করেছে আমাদের ছেড়ে। সবার আগে গেলেন ঝুমার দাদা, মিমির ছোটোবেলার খেলার সাথী বাবলুদা। ২০২ ফাঁকা করে এক দল অল্পবয়সি মানুষ চলে গিয়েছে। কেউ কেউ স্বর্গে, কেউ কেউ ভূস্বর্গে। রুমির প্রথম বয়ফ্রেন্ড, ও আমাদের বন্ধু শঙ্কু চলে গিয়েছেন কানাডায়, সংসার পেতে বসেছেন, এ জন্মের মতো। কলকাতায় শুধু টুটু আছেন, চিত্ররথ দত্ত, বাবার কাগজপত্র আগলে। কি সুন্দর ভরা বাড়ি ছিল, কত আড্ডা! সকলের কথাই মনে পড়ে, বু-ব-র পুরোনো কাজের লোক গনেশের কথাও। আর মাসিমার আদরের কুকুর, বাঘা। গণেশ অনেকদিন নেই। এখনও আছেন, কার্তিক। কলেজ স্ট্রিটের সুপরিচিত মুখ, দে'জ এর কার্তিকদা।

জ্যোতির বড়ো দিদিরাও যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন, ছোটো ভাইরাও তেমনি স্নেহ পরবশে আমার সঙ্গে সহজে মিশে গিয়েছিল। আমি শুধু ওদের ব্রড স্ট্রিটের বাসাতেই নয়, মিমি-রুমির সঙ্গে বীরভূমে জ্যোতির বাবার আহমেদপুরে বাসাতেও গিয়েছি। ওদের বাবা সেখানে বড়ো চাকরির কল্যাণে কোয়ার্টার হিসেবে বিশাল বাড়ি পেয়েছিলেন, সপরিবারে বসবাসের জন্য। দশ বারোটি সন্তান, তাদের স্কুল কলেজের জন্য সবাই তো এসে থাকতে পারত না আহমেদপুরে, কিন্তু ছুটি পেলেই অগণন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে চলে আসত। যারপরনাই আদর করে সবাইকেই সমানেই আতিথ্য দিয়েছেন তাঁরা। খুব চমৎকার, স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন জ্যোতির বাবা, তেমনি মিষ্টি তার চিরহরিৎ মা। দিদিরা, বিশেষ করে বড়ো, মেজো, সেজো, অবিকল মায়ের মতোই দেখতে, মায়ের মতোই স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাদের মেয়েরাও ছিল সকলের বড়ো আদরের। জ্যোতির ছোটো ভাইগুলি ছিল আমার বিশেষ স্নেহের বস্তু। ওরা হয়ে উঠেছিল আমারও ছোটো ভাই। জ্যোতির পরে আলো, সমীর, খোকন, গুলু, তারা বড়ো হয়েছে, নিজের নিজের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, খবর পেয়েছি, কিন্তু যোগাযোগ নেই। এখন ভাবতে অবাক লাগছে, এত ফাঁকা কবে হয়ে গেল জীবন? কোথায় চলে গেল জ্বলজ্বলে জীবন্ত সম্পর্কগুলো, অথচ ওদের সক্কলের সঙ্গে একদা কত ভাব ছিল আমার। সত্যিকারের ভাব। যতদূর মনে পড়ে খোকন আর গুলুকে (কুশকেও), রসা রোডে প্রতিভা বসুর শুরু করা শিশুদের ইশকুলে রুমি মিমির সঙ্গে আমিও কিছুদিন পড়িয়েছিলুম, নিজেদের পড়ার ফাঁকে। ওরা এতটাই শিশু ছিল, আমি যখন যুবতী। আজ পাপ্পা নেই, ছোট্টো সমীরের বয়েস ছিল পাপ্পার চেয়েও অল্প। কিশোর পাপ্পা সমীরকে খোলাখুলি ঈর্ষা করেছিল, যেদিন হাফ প্যান্ট পরা বছর বারোর লিকলিকে সমীর, শাড়ি পরা এম.এ.-র ছাত্রী আমাকে তার সাইকেলের হাতলে বসিয়ে চাঁদনি রাতে আহমেদপুরের

খোলা মাঠে হাওয়া খাইয়ে এনেছিল। শিল্পীর সমীর দত্ত মিডিয়াতে সুপরিচিত নাম এখন। বিয়ে করেছেন আমার এক আদরের ভাইঝি, রীতাকে, কাকাবাবু তুষারকান্তি ঘোষের নাতনি, বড়ো গুণী মানুষ, বড়ো সৎসাহসী মেয়ে, রীতা। বড়দার জোড়া মেয়ে রাজলক্ষ্মী-শুভলক্ষ্মীর একজনের বর দেবজ্যোতিকে অনেকদিন চিনি, তাই শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে আমার মাঝেসাঝে দেখা হয়। এই ভাবে জ্যোতির, আর মিমির, দুই বাড়ির সঙ্গেই আমার সম্পর্কগুলো পরতে পরতে লতায় পাতায় স্মরণের গ্রন্থনায় জড়িয়ে রয়েছে— অথচ থেকেও নেই। দেখা হলে চোখে আহ্লাদে জল আসে। কিন্তু দেখা হয় কই।

এখন হঠাৎ কোথায় ওদের দেখলে চিনতে পারব তো? বোধ হয় না।

কি ভাগ্যি জ্যোতিমিমির সঙ্গে সম্পর্ক কোনোদিনই দূরত্ব হয়ে যায়নি! দূরে দূরে বসবাস করলেও, বিচ্ছিন্নতা আসেনি।

ওদের এবং আমাদেরও, জীবনে এই ষাট বাষট্টি বছরে অনেকরকমের টানাপোড়েন গিয়েছে। কখনো কাছাকাছি, কখনো দূরে দূরে। হয়তো সেভাবে কাজে লাগতে পারিনি কেউ কারুরি, কিন্তু বুকের মধ্যে কেউ কাউকে দূরে সরাইনি। সবটা সময়েই কোনো না কোনোভাবে মিমি আর পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগে থেকেছি, সুখেও দুঃখেও। একসঙ্গে বড়ো হয়েছি, বুড়ো হচ্ছি সবাই আলাদা আলাদা। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িনি, প্রাণের সূত্র ছিন্ন হয়নি। রুমির জীবনও নানা পথে বিভিন্ন ধারায় বয়েছে, তবু তারই মধ্যে আমাদের যোগাযোগ থেকেছে, রয়েছে, অনেক ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা সকলেই। এই সবের মধ্যেই দেখতে না দেখতে দিদিমা ঠাকুমা হয়ে গিয়েছি কখন।

৩। তিতির

১৯৫৯, আমি আর প্রণবেন্দু তিন সপ্তাহ ধরে জাহাজে চড়ে বহু সমুদ্দুর পেরিয়ে আমেরিকার পথে ইংলন্ডে চলেছি, বিদেশ প্রথম উচ্চশিক্ষার পাঠ নিতে। লন্ডনে নেমে প্রথমেই দৌড়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে হাজির হলুম দেশের চিঠিপত্র খুঁজতে। সেটাই জাহাজের ভারতীয় যাত্রীদের লন্ডনের ঠিকানা ছিল। প্রথম চিঠিটাই জ্যোতির কাছ থেকে পিকচার পোস্ট কার্ড। তখনকার যুগে আন্তর্জাতিক পত্রাবলিতে এই বস্তুটির খুব চল ছিল। জ্যোতি মহা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, মিমির কোলে গত ৬ জুলাই তিতিরের জন্ম হয়েছে। আমাদের আহ্লাদ দ্যাখে কে? বন্ধুমহলে তিতিরই আমাদের প্রথম সন্তান স্নেহ শিখিয়েছে!

সেই তিতির এখন প্রসিদ্ধ লেখিকা এবং সম্পাদিকা, কংকাবতী দত্ত। তার দাদু, দিদিমা, মামা, মাসি, মা ও বাবার কলম ধরার ঐতিহ্য সে উজ্জ্বল রেখেছে। এক সময়ে নিজেই মা হয়েছে নিশানের। জ্যোতি-মিমির নাতি নিশানের এখন যে বয়েস, জ্যোতির সেই বয়েসে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নিশান এখনো কিশোর, ছাত্র বয়সে যেমনটি থাকা কথা, তেমনিই। আর চোখ বুজলেই তিতির আজও আমার কাছে সেই ছোট্টো তিতির! জীবনে অনেক ওঠন-নামনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর ওকে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ওর হাতের মুঠোটা কোনোদিনই ছেড়ে দেননি। তিতিরের কচি মুখ, আর মুখের মিঠে হাসিটি বজায় রেখেছেন চিরটাকাল। তার মা মাসিদের মতোই ডাকসাইটে সুন্দরী হয়েছে তিতির। আর ভালো মানুষ।

কিন্তু তিতিরের চেয়েও কচিমুখ আর কচি চেহারা ছিল তার পূজনীয় পিতৃদেবের। একবার, তিতির তখন আমাদের যাদবপুরের ছাত্রী (হ্যাঁ, গোগো-ও ছাত্র ছিল, তু-সা-বি-র, কিন্তু ওই খাতাতেই! কেউ তার মুখ দেখিনি ক্লাসে!)। আমরা সুবীরের সঙ্গে আড্ডা মারছি, হাঁপাতে হাঁপাতে, কোঁকড়া চুল ঝিলিমিলি করে, ঘরে ঢুকে তিতির বলল, 'জান, আজ কী হয়েছে? বাবা আর একটু হলেই মবড হয়ে যাচ্ছিলেন! আমরা গড়িয়াহাটে ছিলাম, ট্রাম থেকে নেমে যাদবপুরের বাসে উঠতে ছুটছি, ভিড়ের মধ্যে বলে বাবা আমাকে পিঠে হাত দিয়ে আগলে সাবধানে উঠিয়ে দিচ্ছেন বাসে, একদল ছেলে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করল, বাবাকে টেনে নামাবে তারা, বাবাকে মারবেই। কেন ওই ছোকরা মেয়েদের গায় হাত দিচ্ছে? বাবা যত বলে, 'আরে ছোকরা নই, আমি ওর বাবা!' তারা বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অমন বাবা ঢের দেখেছি, আয় তোকে বাবা দেখিয়ে দিচ্ছি!' আমি ভয় পেয়ে 'বাবা! বাবা!' বলে কেঁদে ফেলায় ওরা অবাক হয়ে থামল। আমি বাবাকে ধরে বললাম, 'প্লিজ বিশ্বাস করুন, উনি আমার সত্যিকারের বাবা হন!' এই তো গেল জ্যোতির বালকোচিত আচরণের ও রূপবান কিশোরের চেহারা থাকার অসুবিধের দিকটা। সুবিধের দিকটা আমার বলে না দিলেও চলবে! সে নিয়ে কম হ্যাটা পোহাতে হয় না গোটা পরিবারকে!

আমাদের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে মিমি-জ্যোতি যদিও ছাত্র ছিলেন না, রুমির মতো, আমাদের বিভাগের গড়ে ওঠার সাক্ষাৎ সাক্ষী ওঁরা। বুদ্ধদেবের বিভাগ গড়ে তোলার সময়ের উচ্ছল আনন্দের মুহূর্তগুলি এবং বিভাগ ত্যাগ করার সময়ে তাঁর গভীর বিষাদ, দুটোই তাঁদের চোখের সামনে ঘটেছে। প্র-ব-র বিভিন্ন জায়গায় বারবার জমি কেনা, বাড়ি তৈরি করার স্বপ্ন, জ্যোতিকে সেখানেও মহানন্দে যোগ দিতে দেখেছি। মহা উৎসাহে সদলে বৈকুণ্ঠপুরের জমি দেখতে যাওয়া হচ্ছে, ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে লাইন করে আমরা অনেকজনে চলেছি, মাথায় রোদ নিয়ে, জ্যোতির হাতে একটি গাছের কচি ডাল, সেটা পতাকার মতো ধরে আমাদের সোৎসাহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন! যতদূর মনে পড়ে পরনে হাফ প্যান্ট জাতীয় সাহসী বস্তু!

'কবিতা' পত্রিকা, আর তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রশ্রয়ে তিল তিল করে গড়ে উঠেছি আমরা অনেকেই। প্রণবেন্দু, মানবেন্দ্র, তরুণ, শ্যামল, অমিয়, নবনীতা। ও বাড়িতেই চিনেছি আমাদের প্রিয় বন্ধু সুবীরকে। প্রথমে জ্যোতি মিমিরই বন্ধু ছিলেন তিনি। চিনেছি তারাপদকে। দীপক মজুমদারকেও। জ্যোতি মিমির বন্ধু তিনিও। সবাইকেই ওবাড়িতে দেখেছি। কেতকী কুশারী অবশ্য ছিলেন বু-ব-র বন্ধুকন্যা। আমি সেই পরিচয়েই ওঁকে চিনি, বাবা অবনী কুশারীর সঙ্গে এসেছিলেন, কবিতা-ভবনে। আমরা তো প্রাত্যহিক অতিথি। অমর্ত্য মৃণাল মিমি জ্যোতির ক্লাসের বন্ধু ছিলেন, ২০২-তে মাঝে মাঝে আসতেন। ওদের সুন্দর সাজানো সংসারে, ৭নং কর্নফিল্ড রোডের বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের জমজমাট শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী ও বিদেশী অতিথিচর্চিত পার্টিগুলোর একটা রহস্য জড়ানো খ্যাতি ছিল অল্পবয়সীদের মধ্যে, মদের ও বেলেল্লাপনার জায়গা বলে। হ্যাঁ, পানীয় থাকত, বেলেল্লাপনা তো কই দেখিনি। সেখানেও অমর্ত্য, মৃণালকে দেখেছি। ব্রিটিশ ও মার্কিন কনসুলেটের তরুণ সাহেবরাও অনেকে সেখানে আসতেন। অশোক মিত্র তাঁর নতুন বউ গৌরীকে নিয়ে (ব্যাঙ্কক থেকে ফিরে, বা যাবার পথে) একদিন ওবাড়িতে এলেন, আমি দরজা খুলে দিয়েছিলুম। সত্যি মিথ্যে জানিনা, এক সময়ে কলকাতরর জোর গুজব ছিল, মীনাক্ষীর জন্যে নরেশ গুহ আর অশোক মিত্র, এঁদের মধ্যে নাকি যে-কোনো একজনকে

জামাই করার ইচ্ছে ছিল বু-ব, আর প্র-ব'র। সেদিন পাত্রদের মনের ইচ্ছে যা-ই থাকুক, মিমির ইচ্ছে নদী বইছিল অন্য খাতে। কার্যকালে ওঁদের দুজনের জীবনের খাতায় নাম উঠতে দেখা গেল আমাদের অন্য দুই প্রিয় দিদি, চিনুদি, আর গৌরীদির। ভাগ্যিস! স্পষ্টই জ্যোতি আর মিমি হলেন 'মেড ফর ইচ আদার!' ওদের পাশে আর অন্য কোনো মুখ মানায়?

মণিমেখলার ডিঙি নৌকো নিয়ে সাগরচেঁছা পাগল জেদ, মায়া আর আজিজুলকে নিয়ে সেই অজানা সমুদ্দুরে ঝাঁপিয়ে পড়া, কৈশোরের 'শ্রীহর্ষ', কিংবা যৌবনের 'কলকাতা' পত্রিকা, এমার্জেন্সির সময়ে দুর্ধর্ষ কাণ্ডকারখানা করে গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে ফাটক-বাস, কিংবা গঙ্গাবক্ষে 'কন-টিকি' রেস্তোরাঁ (ব্যবসার বদলে প্রধানত বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়াই যার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল) খোলা, ওঁর আগ্রহ যাতেই হোক, আমরা সবাই তাকে চোখ বুজে সাপোর্ট করেছি। এত বড়ো জ্যান্ত রোমান্টিক আমি আর দুটি দেখিনি, এমনকি নীললোহিতের মধ্যেও এতটা প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল না অজানাকে জয় করবার। আমি লক্ষ্য করেছি, জ্যোতি যখনই যেটা করেছেন, মিমির দেখাদেখি ওঁদের সব বন্ধুরাই, প্রায় চক্ষু বুজিয়া সেটা সাপোর্ট করেছেন। কেননা জ্যোতি যতই ক্ষ্যাপা হউন গিয়া, মিমিকে চিরকাল সৎসাহসী আর সুবুদ্ধি বালিকা বলে বিশ্বাস করেছি সবাই। বিভিন্ন সময়ে, বিবিধ প্রকারের কাজকর্ম করে, ঘরে বাইরে অসীম পরিশ্রম করে, অন্ন বস্ত্র উপার্জন করে যেভাবে হোক সুষ্ঠু ভাবেই স্বামী-সন্তানদের ভরণপোষণ করে সংসার চালাতেন মিমি, এটা তাঁর মায়ের কাছে পাওয়া শিক্ষা! আমাদের মনে হত, মিমি জ্যোতিকে দিয়েছিল স্বপ্ন দেখা স্বাধীনতা। এক সময়ে মাসিমাকেও দেখেছি প্রচুর পরিশ্রম করে রুজি-রোজগারের ভার নিজের মাথায় নিয়ে হাসিমুখে বু-ব-কে লেখাপড়ার সময় সুযোগ করে দিয়েছেন। সংসার, কল চালিয়ে রুমি মিমির জামা কাপড় তৈরি, আর উপন্যাস রচনা একই সঙ্গে চলেছে, সেই সঙ্গে আমাদের অত্যাচার সওয়া। মিমির আর একটা বৈশিষ্ট্য, ঠিক স্ত্রী হয়ে নয়, পুরো ঠানদি হয়ে চোখ বুজে আশ্রয় দিয়ে বরের কিছু সাধ-আহ্লাদ তিনি একাই স—ব মেটান। সারাটা জীবনই এভাবে চালিয়ে গেলেন, আজ পর্যন্ত তার অদল বদল দেখিনি। জ্যোতির খামখেয়ালিপনার ন্যায়-অন্যায় বিচারের মধ্যে মিমি কক্ষনো যান না বলেই শেষ রাউন্ডে সর্বদাই মিমিরই জিৎ হয়েছে।

(চুপি চুপি যদি বলি, 'তোমার নিজের সাধ আহ্লাদের কথা, মিমি, তুমি কাকে বলো? কাউকেই বলো কি?' ঝলমল হেসে মিমি বললেন, 'আবার কাকে? জ্যোতিকেই বলি।')

সেই ট্রাডিশন এখনও চলিতেছে। দূর থেকে আমি যতটুকু দেখি, যেটুকু জানি, এমন দাম্পত্য আমি আর দুটি দেখিনি। হ্যাঁ, বেশ কয়েকটি আদর্শ জুটি, যেমন আমার মা-বাবা, বু-ব, ও প্র-ব, এবং জ্যোতির মা বাবা, তাঁদের কথা মনে রেখেই বলছি। সবার ওপরে, তুলনাহীন জুটি এঁরা দুজনে। ঈশ্বর আছেন, তিনিই এদের এমন সুন্দর করে আগলে রেখেছেন। জীবনের পথটা ওদের সরল ছিল না, বরং বন্ধুরই ছিল। সংসারের নানা সমস্যার সামনাসামনি হয়েছেন দুজনে, নানা বিচিত্র পতন-অভ্যুদয়ের মাঝখান দিয়ে অদ্যাপি চলেছেন। সে এমার্জেন্সিই হোক, যা আর্থিক অনিশ্চয়তা, অথবা সম্পর্কের টালমাটাল, কিংবা সাময়িক অস্থিরতার উদ্বেল তরঙ্গ,... সমস্যা যেটুকু আসুক, হাসিমুখে জীবনের বিবিধ পরীক্ষা দুজনে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে সসম্মানে উৎরে এসেছেন জ্যোতি-মিমি। পরিস্থিতি যেমনই হোক, কোনোদিন কাউকে ওঁদের বিষয়ে বলতে শুনিনি. 'আহা'।

৪। কেসাং-গোগো-ঘরসংসার

আর বলবেটাই বা কে? তার জন্য তো শত্রুপক্ষ চাই! বন্ধুরা তো সকলেই উচ্চণ্ড ভালোবাসায় আপাতত অন্ধ। ঝগড়ার যোগ্যতা কারুর তেমন নেই। কিন্তু শাশুড়ি-বউ-এর মধ্যে তো চিরাচরিত শত্রুতা থাকার কথা ছিল? একমাত্র পুত্রের একমাত্র বউ! তথা শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস (এমনকি জায়গাটা আমেরিকা!), হায়, তাও অশান্তি হল না? এমনই কপাল ওদের, জগতে মিমির গভীরতম মুগ্ধ ভক্ত তাঁর পুত্রবধূ কেসাং, আর কেসাং-এর অসামান্য চারিত্রিক গুণাবলির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপক তার শ্মশ্রুমাতা। আমাদের আর বিদেশে বসে, পায়ের ওপরে পা তুলে ফরাসি ওয়াইন চাখতে চাখতে আরাম করে একটু মিমির নিন্দে, আর একটু কেসাং-এর নিন্দে শোনা হল না! সত্যি, গোগো-র মতো কপাল করে কোনো ছেলে আসেনা! কোথায় দুজনে চুলো চুলি করার কথা, আশানুযায়ী, তা নয়, যেমন অখাদ্য মা, তেমনই বাজে বউ! দুজনের কী ভাব!

কেসাংকে প্রথম দেখেছিলুম বু-ব-র মৃত্যুর পরের এক ৩০ নভেম্বরে, নতুন কবিতা-ভবনের উৎসবে। গোগো তখন ক্লাস টেনে, কিন্তু কেসাং পড়ছে ডেন্টিস্ট্রি। আলাপ হল গোগোর গার্ল ফ্রেন্ড বলেই। সেদিন যেমন প্রেম প্রণয়ে উচ্ছল দেখেছিলুম দু জনকে, আজও অবিকল তেমনিই দেখি। ভিতরের ছবিটিও ঈশ্বর ওদের চিরকাল এমনিই রাখুন।

গোগোর কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। সে ছেলে বাপের বাড়ি, মামার বাড়ি উভয়পক্ষের ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, খাস আমেরিকার মাটিতে। তার নানাদিকে জন্মগত ক্ষমতা, নানাদিকে মন। চির চঞ্চল চিত্ত তার, শিল্পীর স্বাভাবিক অস্থিরতা ফুটন্ত গোগোর শিরায় শিরায়। সত্যিই অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে গোগার। আছে অসীম কল্পনাশক্তি। নেই পার্থিব কাণ্ডজ্ঞান। কিছুটা হয়তো তার পৈতৃক উত্তরাধিকার। কিন্তু সবটা নয়। তার স্ত্রী কেসাং আবার ঠিক গোগোর বিপরীত, স্থির, নির্ভরযোগ্য, আত্মস্থ। ডাক্তারের যেমনটি হওয়া উচিত! শাশুড়ি বউতে সাধে এমন ভাব? মিমির সঙ্গে এইখানে কেসাং-এর মিল। আত্মস্থ, বিশ্বস্ত, অবিচল সঙ্গিনী। এই দুই কাণ্ডারীর হাতে থাকলে যে কোনো সংসার তরণীর পালে হাওয়ার অভাব হবে না কোনোদিন।

এই দুজন মেয়েকে ঈশ্বর কোনো বস্তু দিয়ে গড়েছিলেন জানিনা। বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ এরাই করেছেন বটে! 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব' আশীর্বাদ দুজনের প্রতিই প্রযোজ্য। কেসাং-এর মা-কেও দেখেছি ওদের নিউ জার্সির বাড়িতে অতিথি হতে। বয়েস হয়েছে, কিন্তু দেবীপ্রতিমার মতো রূপ তাঁর, হিমালয়ের মতো শান্ত মুখশ্রী। সিকিমের মানুষ। মিমির সঙ্গে তাঁর খুব ভাব-সাব দেখেছিলুম।

আমি জানি না আমেরিকাতে এমন কতগুলি পরিবার আছে যেখানে তিনটি প্রজন্মের এক ছাদের নিচে এক অন্নে বসবাস? দুই রোজগেরে গিন্নির এক সংসার কেউ দেখেছি?

বেশ কয়েকবার বিদেশের বিভিন্ন শহরে মিমি জ্যোতির নানা ধরনের বাসায় গিয়ে আতিথ্য নিয়েছি। প্রত্যেকবারই আনন্দে, উষ্ণতায় আপ্লুত হয়ে ফিরেছি। বাসাগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছে, আরও আরও বেশি অতিথি সমাগমের সুবিধের জন্য। মিমি তো বটেই, কিন্তু জ্যোতিও বয়স হয়ে দারুণ সংসারী হয়ে পড়েছেন। স্নেহশীল, অতিথিপরায়ণ মানুষ। রান্নাঘরে অনেক সাহায্য করেন, একা একা পুরে রান্না নামিয়েও ফেলেন। অনন্তকাল বিদেশে থেকেও আমাদের

প্রজন্মের অধিকাংশ বং পুং দের যেটা আজও অভ্যেস হয়নি। নতুন প্রজন্ম অবিশ্যি তেমন নয়। তারা গৃহকর্মে পারদর্শী। একবার জ্যোতি মিমিদের নিউ জার্সির পুরোনো বাড়িতে লেখক শংকর এসেছিলেন, সেদিন আমিও ছিলুম। নানান রকমের রান্না হয়েছিল, নিউ জার্সির বাঙালিরা অনেকেই এসেছিলেন। জ্যোতি মিমি কেসাং সকলেই রান্না করেছিলেন কিছু কিছু। প্রচুর আড্ডা বসেছিল। করবী মণিদাই বোধ হয় সেদিন শংকরকে এনেছিলেন। আর একবার করবী আর মণিদার স্কার্সডেলের সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে জ্যোতি আর আমি যুগলে প্রচণ্ড উল্লাসে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে সে কি যথেচ্ছ রবীন্দ্র নৃত্য নেচেছিলুম! গাইয়ে যে সে নয়, গান গেয়েছিলেন স্বয়ং রুবিদি, অর্থাৎ বনানী ঘোষ এবং করবী। সেটা অবিস্মরণীয়। আর করবী শত্রুতা করে তার ছবিও তুলে রেখেছেন! রুমি থাকলে আমাদের সঙ্গে ঠিক নেচে দিত। মিমিকে নাচানো যায়নি।

গত বছরে আমার কন্যা নন্দনার ব্রুকলিনের নদীতীরের নতুন কেনা অ্যাপার্টমেন্টের গৃহপ্রবেশ উৎসবে মিমিজ্যোতি কষ্ট করেও এসেছিলেন তাঁদের এক বাংলাদেশী বন্ধুর সঙ্গে। মিমির নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী ছাত্রদের বাংলা পড়ানোর সুবাদে, আর জ্যোতির প্রবাসী খবরের কাগজে কাজের সুবাদে, বাংলাদেশী অনাবাসীদের সঙ্গে ওঁদের দুজনের খুব বন্ধুত্ব। বাড়িতে বাংলা বইয়ের প্রকাশক, লেখকদের যাতায়াত। ওদের বন্ধু হাসানালের সঙ্গে একবার আমি চলে গেলুম তাঁদের কাছে দু দিন বেড়িয়ে আসতে। গিয়ে দেখি কেলেংকারী, কোনো থানা থেকে এক বিশাল কুকুর ধরে এনেছেন নাতিবাবু, আহা, ওর কী হবে? সেই কুকুরকে পুষতে না পেরে তা মনিব পরিত্যাগ করেছেন কোনো কারণে, সেই নির্মম ত্যাগ সইতে না পেরে নাতিবাবু তাকে ঘরে এনে তুলতে চান। 'প্লীজ, দাদা, তুমি এসে গাড়ি করে তাকে নিয়ে এস এক্ষুনি সেখান থেকে।' জ্যোতিও গেলেন, কুকুর এলেন। বাড়িতে খুবই গোলমাল চলল। মনের দুঃখে সেই কুকুর শুধু কাঁদে আর কিছুই খায় না এবং সে অতিরিক্ত বিপুল বপু। অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে থাকে। তাকে যে ঠিক কোথায় রাখলে তারও ভালো লাগবে, বাড়ির লোকেদেরও ভালো লাগবে, সেটা ঠিক করা যাচ্ছে না। তাই তাকে মাঝে মাঝে বাড়ির পিছনে, সুইমিং পুলের ধারে, ছায়ায়, আর মাঝে মাঝে সামনে, গোলাপ বাগিচার পাশে, রোদ্দুরে, বেঁধে রাখা হচ্ছে, বিপুল লম্বা দড়ি দিয়ে। লোকজন দেখলেই কিন্তু সে ডুকরে কেঁদে উঠছে।

পরের বারে সংবাদ পেলুম সব ঠিকঠাক, জ্যোতি তাকে তিন বেলা বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, মিমি তাকে দু বেলা কোলে করে খাওয়াচ্ছেন, সে দিব্য ফূর্তিতে আছে। বাকি সময়টা বসার ঘরের ভিতরে বড়োসড়ো নরম সোফায় শুয়ে টিভি দ্যাখে বা গান শোনে। লোকজন এলে না কেঁদে, সে কুকুরের কর্তব্য করে, পেল্লায় হাঁকডাক শুরু করে দেয়।

গোগো-কেসাং-এর এই পুত্রটি হয়েছেন এক বালক সন্ন্যাসী, নামে নিষাদ, ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট, আর মাথায় বালক দৈত্যাকৃতি হলে কি হবে? সবদিক থেকেই তিনি করুণার অবতার। স্কুলপড়ুয়া নাতি 'ভেগান' হয়ে গিয়ে বাড়িসুদ্ধু লোককে নিদারুণ যন্ত্রণায় ফেলেছেন। 'ভেগান'-রা সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের আদর্শবাদী নিরামিষাশী। তারা পশুপক্ষীর প্রতি এতই মমতাময়, যে ডিম দূরে থাক, দুগ্ধজাত দ্রব্যও ভোজন করে না, ঘি, মাখন, চীজ, ছানা সব বাদ। পশু-শরীরের স্পর্শ এবং শাবকদের নির্দয় বঞ্চনা তাতে মিশে আছে। পশুদের প্রতি যত মায়া, সে তুলনায় নিজের মা ঠাকুমার প্রতি কিন্তু তার মায়ামমতা একটু কম, তার বাড়ন্ত দেহের জন্য উপযুক্ত

বাল্যান্সড পথ্য যোগাতে তাঁরা ইন্টারনেট ঘেঁটে হিমসিম! ভেবে ভেবে আকুল! সে ছ-ফুট বাড়িয়ে বেড়ে চলেছে। কোনোদিন যদি শুনি, জ্যোতিও নাতিকে মদত যোগাতে নিজে 'ভেগান' হয়ে গিয়েছেন, আমি আশ্চর্য হব না! এক, জ্যোতি নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করেন। আর দুই, ছেলেপুলেদের সখ সাধের প্রতি ওদের অমিত মমতা। তার প্রমাণ আমি আগেও পেয়েছি, কষ্ট স্বীকার করেও মিমি জ্যোতি ছোটোদের নতুন প্রয়াসে অনুপ্রেরণা যোগান। নন্দনার অভিনীত বিভিন্ন সিনেমা দেখতে একাধিক বার দৌড়ে দৌড়ে এসেছেন ম্যানহাটানে তার মিমিমাসি-জ্যোতিমামা। বছর দশেক আগে নন্দনার মঞ্চ-অভিনয় দেখবার জন্যে ওঁরা নিউ জার্সি থেকে ম্যানহাটানে এসেছিলেন, একা নয়, মণিদা-করবী, নূপুরকে, আরও কাদের যেন বগলদাবা করে এনেছিলেন। অফ ব্রডওয়ে নাটক 'মোদিগ্লিয়ানি'-তে নন্দনা নায়িকা বিয়াত্রিচের ভূমিকায় ছিল। আদর কাড়তেও তাঁরা যেমন ওস্তাদ, আদর দিতেও তেমনি।

৫। ভরা থাক

আমার প্রাণঢালা আদর, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং আনন্দ-উজ্জ্বল আয়ুষ্কামনা রইল মিমি আর জ্যোতি, এই দুই অদ্বিতীয় দিব্যোন্মাদের জন্যে। হ্যাঁ, দিব্য প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু উন্মাদ তো বটেই। (আসলে দু-জনেই। কেবল মিমির পাগলামিটি কেউ ধরতে পারে না। এতটা সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া কি পাগলামি নয়? 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে' বলা সোজা, কিন্তু কাজে করে দেখানো?) বিশ্বাস না হয় তো নূপুরকে জিগ্যেস করুন, তিনি তো মনের ডাক্তার? ওঁদের গভীর বন্ধু। পড়শী বললেই হয়। কথায় কথায় হলুদ রং-এর হুডখোলা টু সিটার আলফা রোমিও চালিয়ে চলে আসেন তোমাদের কাছে, নতুন কবিতা, গান, খাদ্য, কিংবা পানীয় নিয়ে। বিশ্ব জোড়া প্রাণের ফাঁদ পেতেছ তোমরা, মিমি আর জ্যোতি। সমুদ্রের একপারে রয়েছে আদরের মেয়ে— জামাই-নাতি, অন্যপারে ছেলে-বউ-নাতি, আর দুপারেই গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন।

ভালো সময় অনেক কাটিয়েছি আমরা। এখন সময়টা ভালো নয়। আলো নিবে আসছে। আগে শুধু গুরুজনকেই বিদায় দিতুম। এখন সমবয়সী বন্ধুরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন, কনিষ্ঠদেরও সত্তর পেরিয়েছে। এই একটি ব্যাপারে দেখলুম 'প্রস্তুতি' বলে কিছু হয় না, প্রতিটি বন্ধুরই বিদায়কে নিতান্ত আকস্মিক, আর নেহাৎ অসময়ে বলে মনে হয়। প্রতিবার বুকে ধাক্কা লাগে।

শেষ যেদিন মিমি জ্যোতিকে নিয়ে আমরা কয়েকজন আড্ডা মেরে, রাতে খেতে বসেছিলুম এই 'ভালো-বাসা' বাড়িতে, এসেছিলেন আমাদের আরও দু-জোড়া পুরোনো বন্ধু, জ্যোতিমিমির প্রেসিডেন্সির সতীর্থ সুনীতি ভোস, আর স্ত্রী দীপান্বিতা এবং কৃত্তিবাসের সতীর্থ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর স্ত্রী স্বাতী। আমি তো দুটোতেই আছি। দারুণ আড্ডা জমেছিল আমাদের, অনেক রাত অবধি। ঠিক হল, পরের বারে জ্যোতিমিমি এলে আবার এইরকম আড্ডা হবে, এবাড়িতে। ওরা ফিরে যাচ্ছিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই। পুরোনো আড্ডাগুলোর সঙ্গে এদিনের জরুরি একটি তফাৎ ছিল, সুনীল কিন্তু পান করলেও, গান করেননি। গান করার মতো ভালো লাগছিল না শরীরটা। তা থেকে আমরা কোনো ইঙ্গিত পাইনি বজ্রপাতের।

ভাবতে ভালো লাগছেনা, সেদিনকার পরে এক মাস যেতে না যেতে, প্রথমে সুনীল। সেদিন

ছিল মহানবমী। তারও কিছুকাল পরে সুনীতি। দুজনেই উধাও হয়ে গেলেন পর পর, বিনা নোটিসে, অকস্মাৎ। অত তাড়াহুড়ো করে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কী দরকার ছিল? যাত্রাকালে সুনীতি সদ্য আশি ছুঁলেও একটুও বুড়ো হননি, উচ্চশির যৌবনের ঝলমলে প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আর অসুস্থ হলেও প্রায় উনআশিতে সুনীল তো তরুণ লেখকদের হৃদয়ের চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর জীবনেরশেষ নিশ্বাসটি অবধি। কিন্তু মিমি, ভেবে দেখো, আমরা তো কবেই হারিয়ে ফেলেছি ছোটো পাপ্পাকে। তার পরে আরও ছোটো, কুশ-কে। কতই বা বয়েস ছিল ওদের তখন! আলো-ও চলে গিয়েছে। সেদিন হারিয়ে গেল, জ্যোতির কোলের ভাই, ছোটোতম, খোকন। এমনিই চলে খেলা। ওদের মুখগুলো না-দেখা, কণ্ঠস্বর না-শোনা, সবই তো সহ্য হয়ে যায়। খুব শক্তপোক্ত মনপ্রাণ আমাদের। তবুও আমার বিচ্ছেদকে ভয় করে, কে জানে কোথায় কীভাবে লেখা হয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যতের গল্প? কে ভেবেছিল, সেদিনকার সেই নৈশভোজই হবে আমাদের কজনের শেষ বার একসঙ্গে বসে পানাহার, প্রাণ খুলে আড্ডা দেওয়া!

প্রতিটি বন্ধুর মৃত্যুতে, আমার দেহ মন গর্জন করে ওঠে, 'মানছি না, মানব না!' কেননা ওরা তো জানে, তার বদলে ওই পুষ্পশয্যায় আজ আমিও পারতুম শুয়ে থাকতে!

৬। বয়েসের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও

শোনো মিমি, জ্যোতি, মন দিয়ে শোনো। আমাদের দাবি সামান্যই: কোনো অবস্থাতেই তোমাদের বুড়ো হওয়া চলবে না। ব্যস এইটুকুই।

তপনদা আর হাসিদি যেমন শুভায়ুর ব্র্যান্ড আম্বাসাডার, তোমরাও তেমনি শুভ যৌবনের! সত্যি, বেশ অসূয়াকাতর হয়ে পড়তে হয় তোমাদের চিরযৌবন প্রত্যক্ষ করে। তাই তোমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দাঁত কিড় মিড় করে আমরাও যে যার ভিতরে ভিতরে যথাসাধ্য যুবক যুবতী থাকতে চেষ্টা করি।

আমি জানি তোমরা ঈশ্বরের নিজের লোক, দুঃসময়, জরা, বিফলতা কোনোদিনই তোমাদের কাবু করতে পারবে না। চিরদিন রস-রঙ্গ করে, প্রেম-প্রণয় (সাবধানে!) করে, গল্প লিখে, ছবি এঁকে, চিংড়িমাছের মালাইকারি রান্না করে, বাগানে লাল গোলাপ ফুটিয়ে বেঁচে থাকো দুজনে।

কাগজ কলম, রংতুলি, কুকুর, গাছ আর মানুষ নিয়ে, অনেক মানুষ নিয়ে, অনেক ভালোবাসা নিয়ে এই স্বপ্নময় অশ্রুময় ধরিত্রীর রাজা রাণী হয়ে বেঁচে থাকো তোমরা।

ঈশ্বর করুন, কি রাজদ্বারে, কি শ্মশানে, প্রেমের দুর্ভিক্ষে, কি রাষ্ট্রবিপ্লবে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের যৌবনবেলার এই বন্ধুতা যেন ধরে রাখতে পারি আমরা, আয়ু যতদিন।

ভালোবাসে আড়াল থেকে

'তপন সিংহ জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!' বলে রাস্তায় রাস্তায় ঝাণ্ডা নিয়ে শোভাযাত্রা করা উচিত হয় আমাদের। তাঁর যতটা সম্মান যতটা কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য ছিল আমাদের কাছে তিনি তার ভগ্নাংশ মাত্র পেয়েছেন। এত দেরিতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন যে, তখন সে প্রাপ্তি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ উৎসব করার মতো শরীর নেই তাঁর আর। আমরা ছাত্র বয়সে তাঁর কাছ থেকে আলো বাতাস বৃষ্টির ধারার মতো নিতান্ত সহজভাবে পেয়েছি একটির পরে একটি অসাধারণ ছবি। তাদের যেমন বিষয় বৈচিত্র্য তেমনি তাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা। তিনি আমার মতো দর্শকের কাছে এত সহজে ধরা দিয়েছেন বারবার (মনে আছে, 'অতিথি'তে সেই 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি'?) যে আমরা টেরই পাইনি কার সঙ্গে দেখা হল আমাদের। আমি চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছুই জানি না, বিশেষত আজকের দিনে, যখন চারদিকেই আমরা চলচ্চিত্র বিশারদদের দ্বারা পরিবৃত তখন এ সব নিয়ে মুখ খোলা দুঃসাহস ভিন্ন কিছুই না। কিন্তু আমি তো চিরকেলে দুঃসাহসী। ভালো লাগা খারাপ লাগা মোটামুটি খোলাখুলি বলি। তবে হ্যাঁ, সমাজে বাস করতে হলে খারাপ লাগার বেলাতে খানিকটা সতর্ক হয়ে শব্দচয়ন করতে হয়, যাতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না। মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে তো লাভ নেই? আমিও সেই চেষ্টা যথাসাধ্য করে থাকি। সাকসেস রেট সকলের সমান হয় না এ কথা সবারই জানা। আর ভালো লাগার কতা বলতে কোনো হিসেব মানার দরকার নেই। তাতে পরশ্রীকাতরদের ছাড়া আর কারুর মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তপন সিংহের ছবির বিষয়ে আমি হিসেবের মধ্যে থাকতে চাই না। তিনি আমাদের কোনো হিসেব না কষেই অনবরত নানাভাবে আনন্দ দিয়েছেন। কখনো হাসিয়ে, কখনো কাঁদিয়ে, কখনো ভাবিয়ে। একই পরিচালকের এত রকমের বিভিন্ন রসের কাজ সচরাচর চোখে পড়ে না আমাদের, বিদেশে কিংবা স্বদেশে। কত যে তাঁর স্বাদের বৈচিত্র্য! রীতিমতো ফিস্টি করেছি আমরা তপন সিংহের ছবিতে। এত বৈচিত্র্যময় চিত্রপঞ্জি আর কোনো চিত্রপরিচালকের কাছে কিনা জানি না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আমাদের সঙ্গে তাঁর চেনা। শুরু হল অঙ্কুশ দিয়ে। ওরকম বাংলা ছবি আমরা তার আগে দেখিনি। বছরটা ১৯৫৪। সত্যজিৎ এবং মৃণাল সেনকে আমরা পেয়েছি ১৯৫৫তে। শুরু হল বাংলা সিনেমার সোনার সময়। তপন সিংহ আমাদের খেলতে খেলতে ভাবতে শিখিয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্রে প্রধান হয়ে দেখা দেয় বিনোদন, যার মূলে আছে জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের গল্পকে চলচ্চিত্রের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তপন সিংহ। কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭) দিয়ে যার শুরু। তারপর এসেছে ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০), অতিথি (১৯৬৫)। সূক্ষ্ম সংবেদনশীল উপস্থাপনা।

কাবুলিওয়ালার আগের ছবিটি টনসিল (১৯৫৬), খোলামেলা কমেডি ছবি। পরেরটি লৌহ

কপাট (১৯৫৮), জেলের জীবন। একই বছরে বেরিয়েছে কালামাটি, কয়লা খনির কাহিনি। কাবুলিওয়ালা আর মিনি সেইসময়ে বাঙালির ক্রেজ হয়ে গিয়েছিল। তেইশ বছর বয়স্ক এক তরুণ যখন যাদবপুরে অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান হয়ে যোগ দিলেন, তাঁর ছাত্ররা পয়লা এপ্রিলের লিস্টে টিঙ্কু ঠাকুর বলে ক্ষেপিয়েছিল তাঁকে।

তপন সিংহ একটির পর একটি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিককে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যার শুরু, জরাসন্ধ, শরদিন্দু, তারাশঙ্কর, সমরেশ বসু, বনফুল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র পর্যন্ত সকলকেই তিনি চলচ্চিত্রে এনেছেন। কী বই-এর পাতা থেকে কী থিয়েটারের মঞ্চ থেকে। ছোটদের জন্য তপন সিংহ যতগুলো ছবি উপহার দিয়েছেন,, অতগুলো ছবি ছোটোরা আর কারও কাছে পেয়েছে কি? যিনি সফেদ হাতি (১৯৭৮), টনসিল (১৯৫৬), কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭), অতিথি (১৯৬৫), আজ কা রবিনহুড (১৯৮৭), সবুজ দ্বীপের রাজা (১৯৭৯), গল্প হলেও সত্যি (১৯৬৬), ও বাঞ্ছারামের বাগান (১৯৮০)-এর মতো ছবি বানিয়েছেন, তিনিই বানাচ্ছেন তীব্র সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি আপনজন (১৯৬৮), আতঙ্ক (১৯৮৬), আদালত ও একটি মেয়ে (১৯৮২), এক ডক্টর কি মউত (১৯৯১) ইত্যাদি। বানাচ্ছেন জতুগৃহ (১৯৬৪) ও নির্জন সৈকতের (১৯৬৩) মতো ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি। আদালত ও একটি মেয়ে যখন তৈরি করেছেন (১৯৮২), তখন ভারতবর্ষে মানবীবিদ্যা চর্চার অ আ ক খ রচিত হচ্ছে। অতদিন আগে তপন সিংহ গ্যাং রেপ নিয়ে ছবি বানিয়েছেন, ভয়ঙ্কর, যা দেখতে বসে গায়ে কাঁটা দেয়, ওঁকে আমরা নারীবাদী চলচ্চিত্রকার বলব না? শতাব্দীর কন্যা (২০০০) চলচ্চিত্রায়িত করার কথাও তিনিই ভেবেছেন। হুইল চেয়ারের মতো ছবি, যা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার এক আশ্চর্য উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরে। ওঁর বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রাগের ছবিগুলো একটি অন্যটির চেয়ে যতই আলাদা হোক, একটি আলোর রেখা সবগুলিকে ধরে রেখেছে। সেটি দিয়ে আমরা তপন সিংহের ছবি চিনতে পারি— মানবিক চেতনায় অপরাজেয় বিশ্বাস। তার মানে এই নয় যে তিনি চোখ বুজে থাকেন, তাঁর চোখে ধরা পড়ে সব কলঙ্ক, সব যন্ত্রণা, মানবতার সব পরাজয়। সেদিকে তিনি আমাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভিতর বাহিরের সেই বাধা কাটিয়ে ওঠাই তপন সিংহের মূল ম্যাজিক।

সমাজের প্রতিটি কোণে যাঁর তীব্র নজর ঝলসে উঠেছে বারবার, তিনি কিন্তু নিজেকে অন্তরালে রাখতেই ভালোবাসেন। তাঁর ছবিগুলো গত পঞ্চাশ বছরে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, আমরা সাধারণ মানুষরা তাঁর ছবিগুলিকেই মূল প্রাধান্য দিয়ে মনে রেখেছি, ছবির স্রষ্টাকে হয়তো অনেকসময় মনে রাখি না। সত্যজিৎ রায়ের ছবির ক্ষেত্রে যেমন ছবির আগে স্রষ্টার নামটি মনে আসে, আমরা 'সত্যজিতের ছবি' দেখতে পাই। তপন সিংহের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো, আমরা দেখতে যাই ছবি— 'টনসিল', 'জতুগৃহ', 'সাগিনা মাহাতো', 'আতঙ্ক', 'গল্প হলেও সত্যি'। তারপরে প্রশ্ন করি— কার ছবি?

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে, ভালোবাসে আড়াল থেকে— তাঁর নাম কি তপন সিংহ?

দাদা ফাদার-ভাই ফাদার

'দাদা-ফাদার', 'ভাই-ফাদার'

গোলাম মহম্মদ রোডের মধ্যে আরও একটি সরু গলি, তার মধ্যে ওঁদের শান্তিভরা আশ্রম, তেতলা লাল রঙের বাড়ি। সেখানে দুজন সাহেব ফাদার থাকতেন, তাঁদের কাজ ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে আর কলেজে পড়ানো। তাঁদের দেশ ছিল সুদূর বেলজিয়াম-এ, মাতৃভাষা ফরাসি। মিশনারি হয়ে এদেশে এসে তাঁরা বাংলায় এম.এ., সংস্কৃতে এম.এ.। সোজা কথা? সুন্দর কথ্য বাংলা বলতে শিখে নিয়েছিলেন। ফাদার দ্যতিয়েনের বাংলা লেখায় যার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। এক সময়ে তিনিও ওই 'শান্তিভবন'-এরই আশ্রমিক ছিলেন। (আমার দুঃখু, আমি কোনোদিন তাঁকে চোখে দেখেছি বলেও আমার মনে পড়ে না।) ফরাসি ভাষা শিখতে চেয়ে কেউ 'শান্তিভবন'-এ তাঁদের কাছে গেলে, তাঁরা আদর করে তাঁকে মিনি মাগনায় ফরাসি শেখাতেন। খ্রিস্টান করে ফেলতেন না। কিশোরী কালেই আমার বাবার কল্যাণে 'শান্তিভবন'-এর সঙ্গে আমার চেনাশুনো শুরু।

দুজনকে প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যেত। দুই ফাদারের মধ্যে একজন লম্বা, বয়স্ক। আমি তাঁকে মনে মনে ভাবতুম, 'দাদা-ফাদার', তিনি আবার বাবার পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাংলা জ্ঞান অত্যন্ত সড়গড়, উচ্চারণেই যা ফারাক বোঝা যেত, জিভ থেকে সাহেবিয়ানার আড়টুকু সরেনি। কলকাতার সাহিত্য সমাজে তিনি মোটামুটি পরিচিত মুখ, ফাদার ফালোঁ তাঁর নাম। এক ডাকেই সবাই চিনতেন। শুভ্রকেশ, কৃশকায়, দীর্ঘদেহী, পরনে ধবধবে পাদরির পোশাক, একটু ঝুঁকে পড়েছেন, সাদা লম্বা দাড়ি, দেখতে অনেকটা মুনিঋষিদের মতো, পিঠে বইপত্রের ঝোলা, চোখে সোনালি ফ্রেমের গোল গোল চশমা, শুকনাসা, হাসি হাসি মুখ, ফাদার ফালোঁকে প্রায়ই দেখতে পেতুম আমাদের রাস্তায়। যেতে যেতে দেখা হলে সাইকেল থামিয়ে কুশলপ্রশ্ন করতেন। সারা কলকাতা শহর চষে বেড়াতেন দু-চাকার সাইকেলে। কখনো অন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে দেখিনি ফাদারদের। সাইকেল চালাতে চালাতে তাঁদের বোধহয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, পোস্ট পিওনদের মতো।

অন্যজন ছিলেন মাথায় ছোটোখাটো, অল্পবয়স, সুপুরুষ, কালো ব্যাকব্রাশ করা চুল, শিরদাঁড়া সিধে, হাসিখুশি, মসৃণ গাল, চনমনে, মোটা কালো শেল ফ্রেমের চশমার পিছনে তেজি চাউনি, ব্যক্তিগত কাজের সময় কিংবা আড্ডার সময় হাতে সিগারেট। পাদরির পোশাকেই স্মার্ট। মোটামুটি ইনি 'দাদা-ফাদার'-এর বিপরীত। পাশাপাশি তাঁদের সারাক্ষণই কাজ করতে দেখতুম, সারাক্ষণই তফাৎটা বোঝা যেত। আমি তাঁকে মনে মনে বানিয়ে নিয়েছিলুম দাদা-ফাদারের ভাই-ফাদার। একজন চিরদিনের বুড়ো মানুষটি, আরেকজন চিরদিনের যুবক পুরুষ। তাঁর বাংলাও খুব ভালো, সংস্কৃত আরও ভালো। তাঁর নাম ফাদার আঁতোয়ান। তিনিও অক্লেশে সাইকেল চালাতেন, কিন্তু

পরের দিকে চালাতেন একটি বাইক। তখন তিনি যাদবপুরে আমাদের সহকর্মী। কিন্তু চিরদিনই আমার মাস্টারমশাই। প্রথমে ফরাসির, পরে এপিকের। ছোটোভাই বটে, কিন্তু আয়ু কম ছিল, তিনি দাদা-ফাদারকে পিছনে ফেলে আগেই চলে গেলেন ক্যান্সারে। আমৃত্যু যৌবন উজ্জ্বল ছিল তাঁর দেহে মনে, বয়স যদিও ক্যালেন্ডারে পৌঁছেছিল বার্ধক্যের ঘরে।— (আহা, সে ঝামেলা তো আমাদের সবাইকেই পোহাতে হচ্ছে। হচ্ছে না? পুরোনো হিসেবটা এইবারে নাকচ করে দিতে হবে। আর মিলছে না। শ্রীমান মৃণাল সেনের মতো যুবক আমি ক-টা পাব আজকের ভারতবর্ষে? কিন্তু ক্যালেন্ডার বলছে ৯০, তার মানেই নাকি বার্ধক্য। দূর দূর। সব ঝুট হ্যায়!)— 'ভাই-ফাদার', ফাদার আঁতোয়ান ছিলেন স্কলার মানুষ এবং অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা ছিল তাঁর। কোনো কাজেই লাগাননি সেই প্রতিভাকে। যিশুর গান তিনি গাইতেন, রবীন্দ্রব্রহ্মসংগীত খুব ভালো গাইতেন। শেষ জীবনে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের গঠনতত্ত্ব নিয়ে একটি জরুরি গবেষণার কাজও শুরু করেছিলেন। ফাদার আঁতোয়ান দারুণ ফুটবল খেলতেন, বেলজিয়াম-এর হয়ে একদা কোথায় যেন বড়ো খেলা খেলেছিলেন, আমার এক্ষুণি মনে আসছে না। কিন্তু আমার মনে আছে, যাদবপুরের ছাত্র বনাম শিক্ষকের ফুটবলে ফাদার আঁতোয়ানের অবিস্মরণীয় ফুটবল খেলা! সেই খেলায় প্রণবেন্দুও খালিপায়ে বল ড্রিব্‌ল করে খেলেছিলেন নিদারুণ।

ফাদার-ফালোঁ, অর্থাৎ 'দাদা-ফাদারের' মতো সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মানুষের কুশলসন্ধান করে বেড়াতে দেখিনি 'ভাই-ফাদার'-কে, মিশনারি ফাদারদের যেটা ছিল মানবহিতার্থে অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলোর অন্যতম, পল্লির মানুষের ভালোমন্দের খোঁজ রাখা। তার বদলে নিজের ঘরে কাজে ডুবে থাকতেন বেশির ভাগ সময়ে। মানুষের ভালো সেইভাবেও তো করা যেতে পারে, সবার পথ কি এক? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর মুখ বড়ো একটা দেখা যেত না। বাঙালি সমাজে তাই ব্যাপক পরিচিতি ছিল ফাদার ফালোঁরই। তিনি উদ্যোগ নিয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর এই সাংস্কৃতিক চেতনার দিকটি সবার সঙ্গে মিলিয়েছিল তাঁকে, সবার সামনে তাঁকে ধরে রেখেছিল। 'শান্তিভবন' প্রধানত ফাদার ফালোঁরই নামে চেনা ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের শুরুর সময়ে পার্ট-টাইম অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন দুজনেই। ফাদার ফালোঁ একেবারে গোড়ায়, বিভাগ শুরুর সময়ে, সমানেই পাশে ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর। সেই সময়টা ছিল খুব কঠিন, বুদ্ধদেবের চতুর্দিকে নতুন বিষয় ঘিরে নানা শত্রুতা, বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের মধ্যে 'দাদা-ফাদার' প্রচুর মনোবল যুগিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু পরের দিকে কিছু কিছু বিষয় পরস্পরের অমনোমতো হওয়ায় বিভাগের সঙ্গে তাঁর তেমন সম্পর্ক ছিল না আর। প্রথমদিকে অতি-প্রকাশিত না থাকলেও, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের শুরু থেকে নিজের মৃত্যু অবধি দীর্ঘদিন বিভাগের সঙ্গে পূর্ণ সময় অধ্যাপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িয়ে ছিলেন কিন্তু ফাদার আঁতোয়ান। কালক্রমে জনচক্ষুর আড়ালে-থাকা ভাইয়ের নামই বেশি হয়ে বেড়ে উঠল, তুলনামূলক সাহিত্য পড়াতে পড়াতে অনেকগুলো জরুরি বই লিখলেন ফাদার আঁতোয়ান। তৈরি করলেন অনেকগুলো ঝকঝকে ছাত্রছাত্রী, বিভাগটাকে জগৎসভায় স্থান করে দিতে এগিয়ে গেল যারা। ফাদার আঁতোয়ানের কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে।

আমি যতদূর জানি, ফাদার ফালোঁর কাজ রয়ে গেল মূলত কলকাতা শহরের মানুষের হৃদয়ে,

প্রতিবেশীদের, ছাত্রছাত্রীদের উষ্ণ প্রীতিময় স্মৃতিতে। নিশ্চয়ই তাঁর আরও অনেক জরুরি কাজ আছে কিন্তু আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমার সঙ্গে ঠিক ততটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না তো?

তখন, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে, কলকাতায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের উপস্থিতি সত্ত্বেও ছেলেবুড়ো অনেকেই যেতেন 'শান্তিভবন'-এ সন্ধেবেলায় ফরাসি শিখতে, হপ্তায় তিনদিন। একে তো ফ্রি। তায় কাছাকাছি, হাঁটাপথে। আমি তখন চোদ্দো, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পরে তিন মাসের ছুটিতে আছি, বাধ্যকরী শর্টহ্যান্ড আর টাইপরাইটিং শিখতে ভর্তি হয়েছি ট্রামলাইনের ওপারে, মিষ্টির দোকানের পাশে, পাড়ার ইশকুলটায়। এবারে কলেজে ঢুকব, ক্লাসে নোটস নিতে হবে না? শর্টহ্যান্ড না জানলে চলে? আর টাইপ রাইটিং তো মাস্ট, সেই শর্টহ্যান্ডগুলোকে ভালো করে ফেয়ার করে লিখতে হবে না? ঈশ্বর কিন্তু আমাকে অতটা দয়া করেননি, আমার শর্টহ্যান্ডও শেখা শেষ হয়নি, টাইপরাইটিং-ও না। চিরটাকাল ক্লাসের নোট্স উদাসচিত্ত বন্ধুদের দয়ামায়ার ওপরেই নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে বাবা একদিন জানালেন ফাদার ফালোঁর ফ্রেঞ্চ ক্লাসের খবর। ইচ্ছে করলেই আমিও যোগ দিতে পারি সেই ক্লাসে। বাবার কাছে ফরাসি শিক্ষার প্রাথমিক বই, অভিধান, সব কিছু ছিল। জার্মান শিক্ষারও বইপত্তর ছিল বাবার কাছে। বাবা ভাষা শিখতে আগ্রহী ছিলেন। তখন সুযোগ ছিল না, স্বশিক্ষিত হয়েছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন আমি যথাযথ উপায়ে ভাষা শিখি। তার বছর দুই আগেই আমরা ইউরোপে গিয়েছিলুম ছ-মাসের জন্য, তখন মুখে মুখে আপনা-আপনি ফরাসি ও জার্মান অল্প অল্প কাজ চালানোর মতো শিখে ফেলেছিলুম আমি, ছোটোরা যেমন পারে। তাই বাবা চাইলেন আমার ভাষাশিক্ষাটা ঘুচে না-গিয়ে নিয়মানুবর্তী হোক।

ফাদারদের কাছে প্রথম প্রথম বেশি ছাত্র ছিল না, যে কজন ছাত্র ছিল, সবাই পূর্ণবয়স্ক, বালক-বালিকাদের আসতে দেখিনি তখনও। গোড়ার দিকে মেয়ে বেশি দেখিনি, বুদ্ধদেব বসুর মেয়ে মিমি আসত, জ্যোতির্ময় দত্তর সঙ্গে। পরে তাদের শুভপরিণয়ে গিয়েছি। আমিই একটু ছোটোমতো, স্কার্ট পরা মেয়ে। (তখনও তো বড়ো হয়ে যাওয়া বাঙালি মেয়েরা ফ্রক পরত না?) পরে আমার মতো আরও এসেছিল। ক্রমশ অনেক ছাত্রছাত্রী হল, ফাদার ফালোঁর ফরাসি ক্লাসটি দক্ষিণ কলকাতায় ভাবুকমহলে সবার মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ভিড় জমতে লাগল শিক্ষার্থীর। আর কয়েক বছরের মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ শুরু হওয়ার পরে তো ফাদারদের ক্লাসে যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীর ধুম পড়ে গেল।

আমার ক্লাসে বোধহয় আমরা বিভিন্ন বয়সের জনা আষ্টেক ছাত্র-ছাত্রী ছিলুম, খুব সুন্দর করে আমাদের ফরাসি শিক্ষা দেওয়া হত। পড়াতে পড়াতে শিক্ষকরা নিজেরাই বুঁদ হয়ে যেতেন ফরাসি ভাষার প্রেমে। খেলা হত, গান হত। 'ভাই-ফাদার' ফরাসি ক্লাসে ভাষার সঙ্গে শেখাতেন ফরাসি গান। 'দাদা-ফাদার' গানের দিকে নেই, ব্যাকরণে আছেন; আহ্লাদে নেই, নিয়মে আছেন। তিনি একটু গোমড়া স্বভাবের। আর কিঞ্চিৎ শাশুড়ি টাইপের খুঁত-ধরা প্রকৃতির ছিলেন। ওঁকে সবাই ভয় পেতুম। 'ভাই-ফাদার'ও দেখতে গম্ভীর, গলার স্বরও খুব গম্ভীর, খুব নিয়ম মানেন, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে হাসিতে কৌতুকে টইটুম্বুর। ওঁকেও খুব মানতুম আমরা। 'ভাই-ফাদার'-এর শেখানো অনেকগুলো ফরাসি গান আমরা তখন গাইতে পারতুম। ফরাসি শেখার মধ্যে উচ্চারণের জায়গাটি খুব জরুরি, গানের মধ্য দিয়ে আমাদের ফরাসি ভাষা উচ্চারণের সঙ্গে ফরাসি সংস্কৃতির

চমৎকার এক আলাপ-পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা। শিশুদের ঘুমকাড়ানি গানও তার মধ্যে ছিল, আবার গোটা দুই প্রেমের গানও। (কলেজ জীবনে কাজে লেগেছে!)

আমরা যখন এম.এ. পড়ি, আমাদের এই গানের মাস্টারমশাই, মহাপণ্ডিত ছোটোভাই-ফাদার আমাদের, এপিক পড়িয়েছেন যাদবপুরে। আবার আমি যখন পড়াচ্ছি যাদবপুরে, ফাদার আঁতোয়ান আমাদের সহকর্মী হয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়িয়েছেন অনেকগুলো বছর। অধ্যাপক হিসেবে উনি ছিলেন অসামান্য, আর সহকর্মী হিসেবে অতুলনীয়। ছাত্রদের (এবং সহকর্মীদের) শুধু বইপত্তর ধার দিতে, দুরূহ জিনিস বুঝিয়ে দিতেই নয়, পড়াশোনার বাইরেও যে কোনো মুশকিলে ফাদারের কাছে ছুটে গেলে, সদুপায় থাকলে আসানের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কারও বিপদে আপদে সৎভাবে আন্তরিক সহায়তার চেষ্টা ফাদার ফালোঁও সর্বদা করতেন। (অসদুপায়ের তো ঠাঁই ছিল না তাঁদের কাছে!) 'শান্তিভবন'-এর আশ্রমবাড়িতে গিয়ে দেখেছি ফাদার আঁতোয়ান নিজের ঘরের মধ্যে মেঝেতে ডেস্কে বসে লিখছেন, পাশে বইয়ের রাশ, আর টেবিল ল্যাম্প, একটা নিচু তক্তাপোশের ওপরে মাদুর বিছানো। সেইখানেই আমাদের বসতে দিতেন, আর সেইখানেই তাঁর নৈশ আস্তানা। এত কষ্ট করে ঘুমোন কেন? কৃচ্ছ্রসাধন যে সন্ন্যাসের ধর্ম, সেটা বলতেন না, বলতেন, 'আমার পিঠের ব্যথার পক্ষে এটই সবচেয়ে ভালো বিছানা।' তাঁর বিনয়ের কোনো তুলনা হয় না। বাল্মিকী রামায়ণের গঠনশৈলীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা নিয়ে যে গবেষণার কাজটা আমি অনেকদিন ধরে কেমব্রিজে করেছিলুম, তারপরে দিল্লিতে এসে কিছুদিন কাজ করার পরে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সেটি ছিল নানান দিক থেকে নতুন ধরনের কাজ। ফাদার আঁতোয়ানের খুব আগ্রহ ছিল কাজটির প্রতি। অনেক বছর পরেও সেটা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ফাদারের মনে অশান্তির অন্ত ছিল না। তখন থামার কারণ যা-ই হোক, পরেও হাত দিইনি আলস্যবশত। সন্তান, সংসার নিয়ে মেতে ছিলুম। আমার ভিতরে কেন আলস্যের শয়তান মাঝে মাঝে ভর করে জানি না, এরকম আমি প্রায়ই করে থাকি, নিজের মূল্যবান কাজ শেষ না করে ফেলে রেখে সব সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে ফেলি। আরও বহু উদাহরণ আছে। আমাকে অনেক বকুনি দিয়েও কাজটাতে ফেরাতে পারেননি ফাদার। শেষে নিজেই শুরু করলেন ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত নিয়ে নতুন এটি বিশ্লেষণী কাজ, আমার সেই অসম্পূর্ণ কাজের ধাঁচে। ভূমিকায় উদার স্বীকৃতি দিলেন এই সামান্য ছাত্রীকে— 'আমার ছাত্রীর রামায়ণের গঠনশৈলীর বিশ্লেষণের কাজটি এই ক্ষেত্রে মৌলিক ও প্রাথমিক কাজ, কিন্তু কাজটি সে শেষ করেনি, আমি তাই তারই পরিকাঠামোটি অনুসরণ করছি'— লিখে। কত বড়ো মন হলে সামান্য ছাত্রীকে অত বড়ো সম্মান দেয় মানুষ? কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বিশ্লেষণের কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, হঠাৎ সময় ফুরিয়ে গেল। ফাদার ফালোঁর কাছে আমি মূলত ভাষা পড়েছি,ফাদার আঁতোয়ানের কাছেই সাহিত্য, দুজনেই মনোযোগী মাস্টারমশাই ছিলেন, পরিশ্রম করে, যত্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। তুলনামূলক সাহিত্যের প্রসারে আগ্রহ ছিল তাঁদের দুজনেরই। তবে দাদার চেয়ে ভাইয়ের সঙ্গেই আমাদের ভাব ভালোবাসা জমেছিল বেশি, সেখানে আমরাও নিখাদ ভালোবাসার স্পর্শ পেতুম। তাঁর যন্ত্রণাময় অসুস্থতায়, তাঁর অসময়ের মৃত্যুতে আমাদের অন্তরাত্মা শোকার্ত হয়েছিল। আমি একা নই, আমরা বন্ধুরা অনেকেই এখনও তাঁকে মিস করি।

দাদা-ফাদার ছিলেন গুরুতরজন, আমাদের মধ্যে তাঁর তেমন মুগ্ধ পূজারীগোষ্ঠী দেখিনি,

ভাই-ফাদারের বেলায় যেমন। সবাই দাদা-ফাদারকে ভয়ভক্তি করত, আর একটু দূরে দূরে থাকত। যেহেতু তিনি বাবার পূর্বপরিচিত, আমাকে আবাল্য দেখেছেন বলেই হয়তো তিনি আমাকে খুব এটা সিরিয়াসলি নিতেন না, আর সেই কারণেই আমি ওঁকে অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নিতুম। একটু রাগী মানুষ ছিলেন! আর আমি কবেই বা লক্ষ্মী মেয়ে ছিলুম? কাজেই—

শেষকালে একটা অন্য গপ্পো বলি। সেই যুগে আমাদের বাড়ির একটি আত্মীয়ের বিয়েতে ওই দুজন ফাদারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল হিন্দু বিয়ে দেখে যেতে। ওঁরা খুব আনন্দ করে এসেছিলেন। সাহেব অতিথি বলে কথা, ওঁদের দেখে সবাই ধন্য। বর-কনে দেখার যত উৎসাহ নিমন্ত্রিতদের, সাদা চামড়ার অতিথি দেখা আগ্রহও ততই। এ মাত্র ষাট/পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। এখন শুনে অ্যাবসার্ড লাগে, নিজের কানেই কথাটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একদম সত্যি। তখন তো এত অলিতেগলিতে, বাজারেহাটে অগুন্তি সাহেব-মেম ছড়ানো-ছিটানো ছিল না এই শহরে। হিন্দুদের বিয়েবাড়িতে হঠাৎ ক্রিশ্চান পাদরিদের ডাকা হবেই না কেন? কী করবেন তাঁরা সেখানে? এ এক কিম্ভূত কাণ্ড। কথাও উঠেছিল এই নিয়ে। ওঁদের এলে ভালো লাগবে ভেবে এখানে আদর করে ওঁদের ডেকে ফেলেছিলেন, আবার কে? আমার বেহিসেবী বাবা। তখন মানুষের স্বাধীনতা ছিল আত্মীয়বাড়িতে নিজের লোকজন ডাকার। গোধূলি লগ্নে বিয়ে নেমন্তন্নপত্রে লেখা আছে, অতএব নিমন্ত্রিতেরা চলে এসেছেন। কিন্তু বাবা নিজে যে তখনও সেখানে আসেননি। এবারে ওঁদের কী লাগবে না লাগবে, তার ভার, তাঁদের যথাযোগ্য আতিথ্য দেওয়া আমারই দায়িত্ব হয়ে গেল। 'তুই-ই তো ওঁদের চিনিস।' আমি তো ভীষণ মুশকিলে পড়েছি, কী করি, কোথায় বসাই, মাস্টারমশাই বলে কথা, তার ওপরে সাহেব মানুষ! কীভাবে অতিথি সৎকার করি? কেমন করে দেখাশোনা করি? কেমন করে দেখাশোনা করি? বরযাত্রীদের বসার জায়গায় নিয়ে যাই? ওখানেই তো শ্রেষ্ঠ আসনের বন্দোবস্ত। কিন্তু দেখা গেল ওঁরা খুব সহজ অতিথি, পুঁটুদিদির দেওয়া শরবত খেলেন, সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদের ওপরে, ধোঁয়ার মধ্যে চোখ লাল করে, ভাঁজ করা কাঠের চেয়ারে বসে, মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ে দেখলেন, পুরুতমশাইয়ের দুর্বোধ্য বাংলা উচ্চারণে বীভৎস সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ শুনে সহ্য করলেন। আর, বারে বারে যে লোকজনে এসে বিয়ে দেখার নাম করে তাঁদেরও দেখে যাচ্ছে সে কি আর তাঁরা টের পাননি? উপরোধে শুধু ফিশফ্রাই আর লুচি-মিষ্টি দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, সবাইকে তৃপ্ত করে, দাদাটি আর ভাইটি দু'জনে দু'টি সাইকেল চালিয়ে সোনামুখ করে লেক মার্কেটে ফিরে গেলেন। তারিখ, বছর আমার কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু ঘটনা মনে আছে। আজ আমাদের পাশে সেই দাদাও নেই, সেই ভাইও নেই, তাঁদের নিমন্ত্রণকর্তাও নেই। যতই সেদিন বাবার বদলে আমার ওপরে সম্মানিত বিদেশি অতিথি সৎকারের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হোক, আমি তখনও যথেষ্ট বড়ো হইনি বোধহয়। তা না হলে কেন বেজে উঠছে বুকের মধ্যে আবার আমার সেই উদ্‌বেগের দুরুদুরু?

গৌরীদি

হঠাৎ চলে গেলেন গৌরীদি— গৌরী মিত্র— অশোক মিত্র-র স্ত্রী। সন্ধেবেলায় গিয়েছিলেন গান শুনতে, শরীর খারাপ লাগছিল বলে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন— ভোরবেলা চলে গেলেন— এই দশই এপ্রিল অশোকদার আশি পূর্ণ হয়েছে, কয়েকমাস পর গৌরীদিরও হত। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে একসঙ্গে জীবনযাপন করার পর একজন যখন চলে যান তখন অন্যজনের বাঁচাটাই কতখানি বদলে যায়, তা আমরা কেবল কল্পনাই করতে পারি মাত্র— সকালে উঠে একা এককাপ চা, খাবার টেবিলে একটা থালা—

অথচ যুক্তি দিয়ে বিচার করলে আমরা জানি, একজনকে আগে যেতে হবে, আরেকজনকে পরে। কার পাশার দান আগে পড়বে, কেউ জানে না। আমার মা সবসময়ে চাইতেন, বাবা যেন আগে যান। মা আগে গেলে যদি বাবার সেবাযত্নের অসুবিধে হয়! বাবা চলে যাওয়ার পর মা একগুচ্ছ সনেট লিখেছিলেন, '...আবার সমুদ্র এলো দু'জনার মাঝে।/এপারে ওপারে দু'টি বিচ্ছিন্ন হৃদয়।/কুটিল কল্লোলে নাচে অপার সময়,/ মনে হয়, এ সময় শেষ হবে না যে।/...' আমাদের দেশে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক বলে আশীর্বাদ করা হয়, কিন্তু অনেক মহিলাকেই মা'র মতো করে ভাবতে শুনেছি। মেয়েরা সংসারকে জড়িয়ে থাকে বলে সংসারও মেয়েদের জড়িয়ে রাখে। কিন্তু কর্মব্যস্ত পুরুষ যেন বহির্জগতের মানুষ— সে সংসার চেনে না, সংসরাও চেনে না তাকে। কিছুদিন আগে আমাদের বন্ধু অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন। তার পরেপরেই চলে গেলেন আমাদের বন্ধু জয়া চট্টোপাধ্যায়। দীপকের স্ত্রী নির্মলা নিজের কাজকর্ম, ছেলে-বউ সংসার সবকিছু আঁকড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু জয়ার স্বামী নিমাই সম্পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন— তাঁর নিজের ভাষাতেই, প্রায় বছর ঘুরতে চলল অথচ এখনও রাতে ঘুমোতে পারেন না।

অশোকদা আর গৌরীদি ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। অশোকদার অবসর গ্রহণের পর থেকে তাঁরা ছিলেন অত্যাগসহন সঙ্গী। একমাত্র গৌরীদির বাজার করতে যাওয়ার সময় এবং অশোকদার ভাষণ দিতে যাওয়ার সময় ছাড়া ওঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না। অশোকদার স্টাডিতে গেলে দেখতাম— দু'জনে পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছেন, বসে খবরের কাগজ পড়েছেন, খাবার টেবিলে দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসেছেন। স্বজনবন্ধুর বাড়িতেও যেতেন দু'জনে একসঙ্গে।

গৌরীদিকে প্রথম দেখেছিলাম অশোকদার সঙ্গে পঞ্চাশের শেষের দিকে, কবি বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ 'কবিতা ভবনে'। কেউ দরজায় এসেছেন শুনে আমি দরজা খুলতে গেলাম, দরজার ফ্রেমে দেখলাম অশোকদা আর চাঁপা ফুল রঙের কাঞ্জিভরম শাড়ি পরা গৌরীদি। ওঁদের তখন নতুন বিয়ে হয়েছে। সেই ছবিটা এখনও আমার চোখে ভাসে— শুনলাম, ওঁরা ব্যাঙ্ককে চলে যাচ্ছেন।

গৌরীদির বাপের বাড়ি কিন্তু ছিল আমাদেরই পাড়ায়— আমাদের বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি পরে কেয়াতলা রোডে। গৌরীদিরা তিন বোনই ছিল ডাকসাইটে ছাত্রী। গায়ত্রীদি আর গীতাদি দু'জনেই ইংরেজির আর মাঝখানে গৌরীদি ফিলসফির। ওঁদের বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন— তবু মেয়েদের কী লেখাপড়া, কী গানবাজনা— কোনোটাতেই কমতি ছিল না। আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম তখন গীতাদি ছিলেন কিংবদন্তি ছাত্রী, যদিও আমরা ওঁকে পাইনি। গায়ত্রীদি যাদবপুরে আমার সহকর্মী ছিলেন অনেকদিন। আমি বিদেশে থাকতাম, কলকাতায় ফিরলে গৌরীদির মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতাম। ওঁর মায়ের কাছেও অনেক স্নেহ পেয়েছি; প্রসঙ্গত অনেক স্নেহ পেয়েছি অশোকদার মার কাছে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটেও, নিউ আলিপুরের বাড়িতেও।

অশোকদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছি, উনি যখন অলকানন্দা দাশগুপ্ত ও আই জি প্যাটেলের বিয়ের জন্য দু'টি আঁকা পিঁড়ি আমার কাছ থেকে নিতে এসেছিলেন। অলকানন্দার আবদারে পিঁড়ি দুটি আমি এঁকেছিলাম। ওদের বিয়ে হয়েছিল বেনারসে— সেখানে যেতে পারিনি কিন্তু অশোকদার সঙ্গে পিঁড়ি দুটি গিয়েছি। পরে পিঁড়ি দুটিকে আমি এঁকেছিলাম। ওদের বিয়ে হয়েছিল বেনারসে— সেখানে যেতে পারিনি কিন্তু অশোকদার সঙ্গে পিঁড়ি দুটি গিয়েছিল। পরে পিঁড়ি দুটিকে আমি টি-পয়ের আকারে ওয়াশিংটনেও দেখেছি, দিল্লিতেও দেখেছি, বরোদাতেও দেখেছি। গৌরীদির সঙ্গে আমার ভালো করে ভাব হল আমার বিয়ের পর আমেরিকাতে। গৌরীদি আমাকে একটি তিনতলা ট্রলি উপহার দিলেন যাতে করে খাবারদাবার রান্নাঘর থেকে খাওয়ার ঘরে আনা যায়। যতদিন আমার সংসার ছিল গৌরীদির দেওয়া সেই ট্রলিটিও সেই সংসারে খুব কাজে দিত। বিয়ের সময় আমি গৃহকর্ম কিছু জানতাম না। আমাকে যাঁরা রান্নাবান্না, ঘরকন্না শিখিয়েছিলেন— তাঁদের মধ্যে গৌরীদি আর তপনদার স্ত্রী হাসিদি ছিলেন প্রধান! সুখময় চক্রবর্তীর স্ত্রী ললিতা আর ঢাকার আনিসুর রহমানের স্ত্রী ডোরাকেও বাদ দেওয়া যায় না। হাসিদি আর গৌরীদির কাছে বকুনি আর আদর দু'টোই কেয়েছি মহানন্দে— আদরটাই বেশি। হাসিদি ছাড়া আমরা সবাই ছিলাম ইকোনমিস্টের বউ। ইকোনমিস্টরা একসঙ্গে হলেই ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলে। অশোকদাই একটু আলাদা— সাহিত্য, কবিতা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন— তাই ওঁদের কাছে আর হাসিদি তপনদার কাছে গেলে নিজেকে উজবুক মনে হয় না। তাঁদের স্নেহের পরিমণ্ডলের মধ্যে আমার বিভিন্ন অজ্ঞতা প্রশ্রয় পেত। যেহেতু আমি বয়েসে ছিলাম দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

গৌরীদি যেমন সুন্দর রান্না করতে পারতেন তেমনি সুন্দর গানও গাইতে পারতেন। সুন্দর করে ঘর সাজাতে ভালোবাসতেন। দর্শনশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণি থাকলে কী হবে! অধ্যাপনার জীবন ছেড়ে দিয়ে গৃহিণীপনার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গৌরীদির মনে কখনও কোনো ক্ষোভ দেখিনি। অশোকদা মানুষজন ভালোবাসেন, গৌরীদিও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাই তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া খাওয়াদাওয়া লেগেই থাকত। বছর দশেক আগে অবধি গৌরীদি নিজেও হাতে রান্না করতে ভালোবাসতেন। কলকাতায় এসে ওঁর রান্নার অভ্যেস কমে গেলেও অতিথিসেবার অভ্যেস কমেনি। আমাদের প্রিয় অ্যালিস থর্নার যতদিন বেঁচেছিলেন প্রত্যেকবছর কিছুদিন প্যারিস থেকে এসে গৌরীদির সংসারে কাটিয়ে যেতেন। এরকম আরও

অনেকেই গৌরীদির সংসারের অঙ্গ ছিলেন। গৌরীদি মানুষটি খুব সোজা সিধে ঋজু প্রকৃতির, মনরাখা কথা বলা তার স্বভাব ছিল না। নিজে যেটা ভালো বুঝতেন সৎভাবে সেটাই বলতেন, সেটাই করতেন। অপ্রিয় কথা বলতেও পিছপা হতেন না একেবারেই।

অশোকদা শ্মশানে যাননি। আলিপুরের বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁকে ঘিরে রয়েছি আমরা অনেকে। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, অশোকদা রাঁধুনিকে বললেন, 'বেশি করে চাল নিও' আমাদের দিকে চেয়ে বললেন 'আজ খাওয়াদাওয়ার একটু অসুবিধে হবে তোমাদের, ঘরে সেরকম কিছু নেই। আজ তো শুক্রবার, শুক্রবারই গৌরীর বাজার করার দিন।'

০৩.০৫.০৮

নায়ক

গতকাল সন্ধেবেলাতে আমরা গঙ্গার ধারে বসে চা খেলুম তার পরে খোলা চাঁদের বার-বি-কিউ হল এবং অসীম আড্ডা।

কার সঙ্গে? সে এক নায়কের সঙ্গে। আর তাঁর নায়িকা। গঙ্গার ধারটা ইস্ট লন্ডনের এক বহুতলের ছাদে, পেন্টহাউসে বসে পশ্চিমে তাকিয়ে দেখা গেল লালচে সোনালি আকাশে সূর্যাস্ত থমকে আছে, যেমন থাকে এদেশে। তার সোনালি গোলাপি মায়া ঝলসাচ্ছে নীচের নদীজলে, নদী একটি বাঁক নিয়েছেন এইখানে। টেমস বলে চেনা যায় না যেন। রবিশংকর বললেন, চলুন আমরা যাই, গঙ্গার ধারে বসি। খুব কিছু ভুল বলেননি।

চায়ের কাপ হাতে করে বাইরে গিয়ে বসি। তিনি পনেরো মাসের ডলপুতুল নয়নিকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন। তাতে নিয়ামনির কোনো আপত্তি নেই। অনেক নীচে অন্যান্য বাড়ির ছাদ। এই পাড়া আগে গরিবপাড়া ছিল এখন ধনীপল্লি হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ খৌ খৌ করে বকাবকি করে উঠল সু কি। সে সুকন্যার সুখী কন্যা লাসা আপসো পুতুল কুকুর। এতক্ষণ দিব্বি আমার সঙ্গে ভাব পাতাচ্ছিল। আকাশমুখো হয়ে কাকে বকছ? সু কি? ওই যে আকাশে প্লেন যাচ্ছে, তাকে। সু কি কাক দেখলে তাড়া করে। প্লেনটাকে বড়ো মাপের কাক ভেবেছে। আমরাও কি সারা জীবন এইরকম ভুল করি না? প্লেনকে কাক, আর কাককে প্লেন ভেবে বসি।

সুকন্যা চায়ের সঙ্গে নানা রকমের জাপানি মুখরোচক নোনতা চুরমুরে জিনিস দিয়েছিলেন। এবারে এসে দেখছি এই জাপানি আর কোরিয়ান ঝাল নোনতা ডালমুটের মতো বস্তুর দারুণ চল হয়েছে বিলেতে। অক্সফোর্ডে সংযুক্তাও দিয়েছিলেন। রবিশংকর প্রথমেই বললেন আমার কুম্ভমেলা ঘোরার কথা। তারপরে হাসির গল্পের কথা। তিনি আগেও অন্যত্রও বলেছেন তিনি আমার লেখা পড়তে ভালোবাসেন, আজ তার প্রমাণ দিলেন, নব-নীতাতে ন'রকমের রচনা আছে সে কথা বলে, সৃজনশীলতার বৈচিত্র নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্য। এত কাজ, এত ব্যস্ততার মধ্যে কবে কী পড়েছেন মনে রেখেছেন। আরও অবাক করে দিয়ে বললেন 'আপনাকে ক্যালকাটা ক্লাবের বাজানোর দিন ইনভাইট করেছিলাম, কিন্তু আপনি অসুস্থ ছিলেন, আসতে পারেননি, সেদিন বাজানো খুব জমেছিল। প্রচুর শ্রোতা এসেছিলেন।'

অত বড়ো শিল্পী, কত লোককেই তো আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কে এল কে এল না মনেও রাখতে পারেন, সত্যি! আমি তো মুগ্ধ!

সুকন্যা হঠাৎ এসে বললেন, 'তুমি কিন্তু আজ রাতে এখানেই খেয়ে যাবে, আমি বার-বি-কিউ করব। মুরগি ভেজানো আছে, নো প্রবলেম।'

কিন্তু আমি তো একা নই, আমার সঙ্গে মামণি আর নিখিল আছে, আছেন আমার নাতনি দিদি

নয়নিকা, আর সুজাতা। নৃত্যশিল্পী সুজাতা ওঁদের ঘরেরই মেয়ে। সুকন্যা তাঁর স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্যবদনে বললেন, 'শোনো, আমাকে দিয়ে জোর করে কাউকে এন্টারটেন করানো যায় না, আমি যদি নিজে না চাই। আমার তোমাকে খুব ভালো লেগেছে তাই তোমাদের জন্যে রান্না করব। যারা কুকুর-বিড়াল ভালোবাসে তারা লোক ভালো।'

গল্পে গল্পে অনেক সময় কেটে গেল। রবিশংকরের কন্যা অনুষ্কার সদ্য পুত্রসন্তান হয়েছে, জুবিন শংকর রাইট। তাঁর বাবা জো রাইট খ্যাতনামা তরুণ ব্রিটিশ ফ্লিম ডিরেক্টর। তাঁরা থাকেন ফ্যাশনেব্‌ল পল্লি ব্রিক লেনে। সে কি? ব্রিক লেনে তো গিয়েছি মাছ কিনতে। সে তো বাংলাদেশের মানুষদের বাজারের পাড়া, রাস্তার নাম বাংলায় লেখা দেখেছি, দারুণ মাছের দোকান, দিশি সবজির বাজার। সে আবার ফ্যাশনেব্‌ল হল কবে?

'এখন হয়েছে। আগে ওইরকম ছিল, এখন পালটে যাচ্ছে। আমি বুঝি না, কেন এত ফ্যাশনেব্‌ল হয়েছে ওই পাড়ার সব পুরোনো ইঁটের বাড়ি। তিনতলা উঁচু, উঁচু উঁচু সিঁড়ি, ভিতরে ঘরগুলো বড়ো বটে। আমার ভালো লাগে না। সরু সরু গলি, দু'দিকে দু'টো গাড়ি পার্ক করলে একটার বেশি গাড়ি যাবে না। কেন যে ওই পাড়া অল্পবয়সিদের এত পছন্দ হয়েছে, ইয়াপ্পিদের বাসস্থান হয়েছে, বোঝা শক্ত। আমার একটুও পছন্দ নয় ওই পাড়া, কিন্তু তরুণদের ওটাই পছন্দ। মেয়ে-জামাই এখানেই থাকে। এখান থেকে গাড়িতে কুড়ি মিনিট।'

সম্প্রতি অনুষ্কা আর তাঁর স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে সুকন্যা একটি উপহার তৈরি করে দিয়েছেন, যেরকম উপহার জগতে কেউ কোনোদিন কারওর জন্য বানিয়ে দেয়নি। একটি নামহীন রান্নার বই। নিজে রান্না করে প্রতিটি রান্নার ছবি তুলে, প্রিন্ট করে, বাঁ-পাতায় লাগিয়েছেন। সামনে ডান-পাতায় নিজের হাতে তার রেসিপিটি লিখে দিয়েছেন, এরকম গোটা কুড়ি রেসিপি। সবগুলো পাতা দু'দিকে ল্যামিনেট করা, প্রতি পাতায় একটু ছবি আঁকা। এক জায়গায় বালিকা অনুষ্কাকে তার মা খাইয়ে দিচ্ছেন, সেই ফোটো, আর এক জায়গায় নাতিকে আদর করছেন দিদিমা, তার ফোটো। স্পাইরাল বাঁধন, ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত, আরও পাতা যোগ করা যাবে।

'একটা পাতা আমি পড়ে শোনাতে চাই' বইটি হাতে নিয়ে চোখ তুলে বললেন রবিশংকর। তারপরে পড়লেন— 'সুস্বাদু রান্নার সব চেয়ে জরুরি মশলা হল ভালোবাসা। যাদের জন্য রান্না করছ তাদের খাইয়ে তুমি খুশি হবে তো? তা যদি না হও ওদের নিয়ে রেস্তোরাঁতে যাও। ভালোবেসে না রাঁধলে রান্না সুস্বাদু হবে না। পরিচ্ছন্নতা খুব জরুরি হাত ধুয়ে রান্না করবে, পরিষ্কার রান্নাঘরে রান্না করতে করতে কথা না বলাই ভালো, খানার মধ্যে থুতু ছিটনোটা ভালো নয়।'— আমার খুব মনের মতো কথা সবগুলোই। মেয়েকে মায়ের উপদেশ। সুকন্যা লিখেছেন ইংরেজিতে, আমি বাংলায় লিখলুম।

উদয়শংকরের সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুতা ছিল জানতুম। তাঁর শ্বশুরকেও চিনতেন। ওঁদের বিয়ের চিঠিও আমাদের বাড়িতে। তাঁদের বিয়েতে বাবার লেখা পদ্য আছে অমলাশংকর মাসিমার কাছে, আমাকে তার একটা কপি দিয়েছেন। রবিশকংর বললেন তিনিও অল্পবয়সে আমার মা-বাবাকে চিনতেন। বাবার সঙ্গে হরেন গোষের অফিসে অনেক দেখা হয়েছে। বাবার বন্ধু ছিলেন হরেন ঘোষ। তখনকার দিনের বিখ্যাত ইমপ্রেসারিও। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় খুন হয়ে গেলেন, বাবার সেই শক আমার মন আছে, আমি তখন বেশ ছোটো হলেও। বাবাকে ওরকম

স্তম্ভিত দেখিনি কখনও। রবিশংকর অনেক লেখকের গল্প করছিলেন, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল। মৈত্রেয়ী দেবীর ফরাসি সিনেমা হওয়া বইটির খবর নিলেন, সেটা এখনও পড়া হয়? মহাশ্বেতা দেবীর স্বাস্থ্যের কথা বললেন। জানতে চাইলেন বাণী রায় বেঁচে আছেন কিনা? তিনি অন্য ধরণের লিখতেন। সমরেশ বসুর 'বিবর' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'রাতভোর বৃষ্টি'-র মামলা নিয়ে কথা তুললেন, সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলুম তাঁর আগ্রহ এবং স্মৃতিশক্তি দেখে। মহান শিল্পী বলে তাঁকে জানি আমরা কিন্তু তাঁর বহুধাবিস্তৃত কৌতূহলের কথা জানি না।

'আমি বাইরে বাইরে থাকি বলে কেউ বুঝতে পারে না। আমি ভিতরে ভিতরে আগাপাশতলা বাঙালি। চিরকালই বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে কেটেছে, ইস্কুল কলেজে পড়াশোনা পর্যন্ত করা হয়নি—'

নিজের ছোটোবেলার কথা, বাবার কথা বলছিলেন। 'আমার বাবা, শ্যামশংকর, আটবছর বয়সে তাঁকে দেখি। আমি আমার বাবাকে খুব অল্প দেখেছি। এই সাতদিন দেখলুম তো আবার অনেক মাস পরে হয়তো দু'দিন, আবার বছর ঘুরলে তিনদিন, এরকম, বাবা তো থাকতেন না, হঠাৎ হঠাৎ আসতেন, ঘুরে বেড়াতেন ইউরোপে আমেরিকাতে, ওদিকে কাজ ছিল তাঁর। একবার একসঙ্গে দেশে দু'টো ভালো কাজ পেলেন, বরোদার দেওয়ানের কাজ, আর কলকাতায় মিন্টের সরকারি এক ভারী পদে চাকরি, নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত নিয়ে লেকচার দিয়ে উনি দেশে ফিরছিলেন। ইংল্যান্ডে পাকুড়ের রাজবাড়ির দুই ভাইয়ে মামলা চলছিল, বাবা তো আইনজীবী ছিলেন, সেটা লড়তে লন্ডনে থেমেছিলেন, সেখানে তাঁকে খুন করে ফেলা হয়। ট্রাফিক পুলিশ দূর থেকে দেখেছে কেউ এসে তাঁর মাথায় বাড়ি মারল। বাবা পড়ে গেলেন। তবু খুনি ধরা পড়েনি। বাবা তো ভালো ইংরেজি বলতেন কিন্তু মাথায় বাড়ি খাবার পরে কেবল বাংলা বলছিলেন, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি, ওঁকে চিনতে পারেনি। হাসপাতালে মারা গেলেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত তখন বাঙালি ছিলেন, বাবাকে চিনতেন, তিনিই আমাদের বাড়িতে খবর দেন ও সব ব্যবস্থা করেন।'

তখনও রবিশকংর কিশোর মাত্র।

'সেই থেকে আমাদের জীবন পালটে গেল।'

প্যারিসের গল্প করছিলেন, উদয়শংকরের সঙ্গে তিনি তখন প্যারিসে থাকতেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সাহেব আট মাসের জন্য ইউরোপে এসেছিলেন, ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশে বাজিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

রবিশংকর তখন উদয়শংকরের দলে নাচেন, কিন্তু দেখে দেখে নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র তিনি না শিখেও মোটামুটি বাজাতে পারতেন। সেই কারণে তিনি বাবা-র দলের সঙ্গে ইউরোপে ঘুরতে সুযোগ পেয়ে গেলেন। আটমাস পরে ঘরে ফেরার সময়ে বাবা বললেন রবিকে তাঁর সঙ্গে মাইহারে যেতে। এতো বড়ো সুযোগ, রবির বয়সে তখন ১৮, তিনি তো মহোল্লাসে চলে গেলেন গুরুগৃহে। গিয়ে মাইহারের অবস্থা দেখে কি বিচ্ছিরি মনখারাপ! নেহাত অল্পবয়শ, এই তো সদ্য ইউরোপের বড়ো বড়ো ফাইভস্টার হোটেলে থেকে এসেছেন আট মাস, আরামে বিলাসে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। মাইহারে অন্য গল্প। মাটির ঘর, মশা, ইঁদুর, ছুঁচো, ব্যাঙ, সাপ সবই

ঘরের মধ্যে চলে আসে। খুব মনখারাপ। কিন্তু কী করা। গুরুগৃহ বাস বলে কথা। এসব তো সয়ে নিতেই হবে। সেখানে জীবনে দু'টো প্রধান ঘটনা, দীক্ষা এবং প্রেম। অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলাপ, ভালোবাসা, বিয়ে।

'কে জানে কেন সম্পর্ক খুলে যায়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি।

সত্যিই, কে বলতে পারে কেন গ্রন্থি খুলে যায়?

'অন্নপূর্ণা চমৎকার মানুষ, এবং ওর মতো সুরবাহার আজ অবধি কেউ বাজাতে পারেনি। কিন্তু সম্পর্ক টেকেনি। অনেকদিন পরে সেও বিয়ে করেছে। আমার জীবনে কমলা, আপনি কি চেনেন, লক্ষ্মীমাসির বোন? সে অনেকদিন...'

'হ্যাঁ, আমি তাঁকে আপনার পাশে অনেক বছর দেখেছি।'

এই সময়ে হইহই করে হাসতে হাসতে সুকন্যা এসে পড়েন এবং যোগ দেন।

'তারপরে এসে গেল সুকন্যা, তখন ওঁকে কাকু বলতাম।' রবিশংকর একটু লজ্জা পেয়ে ব্যাখ্যা দিলেন, সুকন্যাও সায় দেন তাতে, ওঁর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ের বান্ধবী ছিলেন সুকন্যা। সেই সূত্রে কাকু। সন্দেহ নেই প্রাণোচ্ছল সুকন্যার হাসিখুশিতে, সেবাশুশ্রূষায়, আদরযত্নেই তিনি আনন্দে, সুস্থ দেহে মনে, উজ্জ্বল কর্মজীবনের মধ্যে রয়েছেন।

'সুকন্যা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে' কথায় কথায় এই বাক্যটিও বলেছিলেন সেদিন। ছোটোখাটো ডাক্তার হয়ে গিয়েছে সুকন্যা, সারাক্ষণ ইন্টারনেটে নতুন নতুন চিকিৎসার খবর সংগ্রহ করে।' তারই মধ্যে শুক্তি এসে রক্তচাপ পরীক্ষা করতে চাইল, উনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এখন না।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলি, 'সে কি? না কেন? সময় হয়েছে, এখুনি করুন।'

রবিশংকর দুষ্টু ছেলের মতো হেসে বললেন, 'বেশ, তা হলে আপনাকেও রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে হবে কিন্তু!'

'ঠিক আছে, তা না হয় হবে!' বলেই আমি সটকে পড়লুম রান্নাঘরের দিকে।

রবিশংকর একটি বাংলা গল্পসংগ্রহ এনে দেখালেন, লন্ডনের পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এনেছেন, ওই পাড়াতে এখন বাংলাদেশিদের বাস, মেয়রও একজন বাংলাদেশি ভদ্রলোক। বইটির নাম শ্রদ্ধাঞ্জলি জাতীয় কিছু। জনা দশেক পরিচিত লেখকের গল্পের সঙ্গে দু'জন অচেনা লেখকের গল্প, তাঁরাই সম্ভবত সম্পাদক। রবিশংকর দেখলুম তাঁদের নিয়েই চিন্তিত। কেন কদাচ তাঁদের নাম শোনেননি তিনি? লেখা পড়েননি কেন? 'এই রা বি রা কে বলুন তো?'

আমিও নাম শুনিনি জেনে নিশ্চিন্ত। এরকমও হয়? খুব হয়।

এই মুহূর্তে নবোকভের একটি উপন্যাস উনি পড়ছেন, ভালোই লাগছে পড়তে। বইটি দেখালেন, আমি পড়িনি। আহা, ওঁর চোখ ভালো আছে ভাগ্যিস, রীতিমতো পড়াশোনা করেন দেখে খুব ভালো লাগল। মনন তীক্ষ্ম। চোখের দোষে আমার এ সৌভাগ্য নেই। বই পড়তে খুব অসুবিধে। আর বই না পড়লে কী করবে আমার মতো মানুষ তার উদ্বৃত্ত সময় নিয়ে?

যখন তাঁর সামনে পৌঁছলুম, আমাকে কিছুতে প্রণাম করতে দেবেন না, শেষে বয়সের হিসেব কষতে বসলেন। উনি ১৯২০-তে জন্মেছেন আমি তার প্রায় দু'দশক পরে জেনে রাজি হলেন

পা স্পর্শ করতে দিতে। ওঁর এই শুভ্রশ্মশ্রুশোভিত ঋষিপ্রতিম মূর্তিটি আমি দেখিনি। তাঁর পদ্মপলাশ চোখে সৌন্দর্য তাতে ব্যাহত হয়নি, হাসির মাধুর্যও না। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সুপুরুষ আছেন নিজের মতোই। অমলাশংকরের এত বয়স তবু এত সুন্দরী, শুনে বললেন, 'অত বেশি তো নয়, আমার বউদি আমার চেয়ে মোটে এক বছরের বড়!' আমাদের অসীম স্নেহের আকর অমলাশংকর মাসিমার ১৯১৯-এ জন্ম। তিনিও কি সুন্দর তরুণী রয়েছেন। রবিশংকর সস্নেহে মমতাশংকর, চন্দ্রোদয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয় (ঘোষ) কাকুর কথা বললেন। মামণি মম-র দলে দশ বছর নাচ শিখেছে শুনে খুশি হলেন।

বন্ধুদের মুখে শুনলাম সম্প্রতি রবিশংকর একলা বাজিয়েছেন, মেয়ে ছিলেন সঙ্গে, কিন্তু ক্লান্ত হননি, সবার মুখে তার প্রশংসা। ২১ জুলাই আবার বাজাবেন শুনলুম। আমরা তো তখন চলে যাচ্ছি নিউ ইয়র্ক।

আমাদের সঙ্গে 'রং রসিয়া' দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর, বলছিলেন, রবি বর্মার জীবনের ওপরে ছবিটি উনি দেখতে চান, নন্দনাকেও দেখতে চেয়েছিলেন। নন্দনা শুনে ওঁদের জন্য টিকিটও রেখেছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো নেই অতক্ষণ হলের মধ্যে বসে থাকার মতো। সুকন্যারও খুব যেতে আগ্রহ ছিল কিন্তু কর্তাকে ফেলে যেতে ইচ্ছে হল না। নন্দনাও স্ক্রিনিং ফেলে আসতে পারল না, কিন্তু পণ্ডিতজির বাড়িতে গিয়ে ছবি দেখিয়ে আসবে বলে জানাল। সুকন্যা বললেন, তিনি 'রং রসিয়া'র একটা রাশ প্রিন্ট দেখেছেন, দিল্লিতে। অনুষ্কাকে বলা হয়েছিল সংগীত করতে, তাই ছবিটি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নিঃশব্দ। কোনো শব্দই ছিল না। মাত্র একমাসের মধ্যে, করতে হবে বলায় অনুষ্কা রাজি হয়নি কাজটা নিতে। কিন্তু তাতে নন্দনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে তিনি আবার ছবিটি দেখতে চান, এবং শব্দ সমেত। সুকন্যা বললেন, 'অমর্ত্যকে দেখে আমার মন হল আরে একে তো একেবারেই নন্দনার মতো দেখতে নয়? অনুষ্কাকে যেমন বাবার তো দেখতে, নন্দনা তো তা নয়? আজ বুঝতে পারছি নন্দনাকে কার মতো দেখতে হয়েছে, অবিকল তার মায়ের মুখ।'

'আমার বড়ো মেয়ের মুখে তার বাবার মুখ বসানো আছে, অন্তরাকে দেখলেই বুঝবেন।' আমি সান্ত্বনা দিই।

প্রসঙ্গত রবিশংকরের মুখ একটা মজার গল্প শুনলুম, সুকন্যাও সোৎসাহে সে গল্পতে যোগ দিলেন, সেটা আপনাদের না বলেই পারছি না। রবিশংকর যেবারে হার্ভার্ডের অনারারি ডক্টরেট পেয়েছিলেন, সুসান সনট্যাগ-এর সঙ্গে, আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে (উনি নাম বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি), সেবারে অমর্ত্য তাঁদের নিজের বাড়িতে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবং এটাই আসল কথা, বেচারি অমর্ত্য স্বহস্তে ভারতীয় খানা রান্না করে খাইয়েছিলেন রবিশংকর আর সুকন্যাকে। অমর্ত্য ওঁকে এক ঘণ্টা সরোদ বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন বললে আমি যত অবাক হতুম ততই আশ্চর্য হয়ে গেলুম তাঁর ভারতীয় রান্নার খবর শুনে। 'দেখুন গত পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে আমরা কেউই ওঁকে রান্নাবান্না করতে দেখিনি, বা শুনিনি। অতএব নিশ্চয়ই ওই দিনের রান্না এমা করেছিলেন বা বাড়িতে ওঁর ছেলেমেয়েরা আর কেউ।'

ওঁরা অবাক হয়ে বললেন— 'কিন্তু আমরা তো ভেবেছি অমর্ত্য নিজেই—'

আমার কথা ওঁদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না দেখে আমি আর জোর করিনি। অমর্ত্যকে

অর্থনীতি, দর্শনের পটুত্বের উপরন্তু দারুণ রাঁধুনিও ভেবে ওঁদের মতো মানুষ যদি খুশ থাকেন, ক্ষতি কী? অমর্ত্যরও প্রভূত আহ্লাদ হবে এই নতুন গুণগাথা শুনলে।

এই তো একের বদলে দুই নায়কের গল্প শুনিয়ে দিয়েছি। ভালো গল্প নয়?

শেষের কথা, আপনাদের যদি কৌতূহল জন্মে থাকে তবে শুনুন, সুকন্যা কিন্তু ওই অল্পসময়ের মধ্যে ফাটাফাটি রান্না করেছিলেন, বার-বি-কিউ মুরগি ছাড়াও অপূর্ব আভিয়াল, ডাল, দু'রকেমর সবজি, লেবু-সঙ্কা, ভাত।

কত সৌভাগ্য আমার, ভেবে দেখুন, পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে বসে অতক্ষণ গল্প করার সুযোগ পেলুম, একসঙ্গে চা থেকে ডিনার অবধি। আমাদের ছোট্ট নিয়ামনি সঙ্গে না থাকলে আরও কিছুক্ষণ বসতে পারতাম, সেটা সম্ভব হল না। নিয়ামণি কিন্তু একটুও বিরক্ত হয়নি বড়োদের মধ্যে থাকতে। কাঁদেনি। সে শুধু মাঝে মাঝে সু কি-র সঙ্গে খেলতে চাইছিল। কিন্তু সু কি একটু বাচ্চা ভয় পায় মনে হল, সব ছোটো কুকুরের মতোই, আগেভাগে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জাপানি নামের সু কি-কে দেখলুম সুজাতা, ডাকেন, আদর করে বাংলায় সুখী বলে। ওটাই ওর ঠিক নাম। সুজাতাকেও দূরে ফিরে যেতে হবে। সেদিনের মতো আড্ডা ভাঙল, কিন্তু সুকন্যার সঙ্গে কথা রইল, অনেকগুলো ঠিকানা দিয়ে দিলেন, রবিশংকর দম্পতির সঙ্গে দিল্লি, ক্যালিফোর্নিয়া, কলকাতা, লন্ডন কোথাও না কোথাও অনতিবিলম্বেই আবার আড্ডা বসবে আমার। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন মনের মধ্যে এই সন্ধ্যেটার ঝংকার থেকে যাবে, 'পথের পাঁচালি'র সেই মাতাল করা বাঁশির সুরটার মতো।

গোলাপবাগিচার দাদা

এক ফুলের প্রদর্শনীতে, মঞ্চের ওপরে দেখা। ধবধবে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবিতে এক অভিজাতদর্শন বয়শক ভদ্রলোক আমার পাশে বসেছিলেন। আমি গোলাপফুল ভালোবাসছি দেখে তিনি অঅমার সঙ্গে আলাপ করলেন, 'আপনি গোলাপ ভালোবাসেন, দিদি? আমার তো গোলাপফুলের চাষ!' সেই থেকে আমাদের ভাব হয়ে গেল। একজন গোলাপ ফুলের চাষ করেন আর একজন সেই ফুলের রূপ-গন্ধ উপভোগ করি। 'একদিন চলুন না আমার বাগানে, ঝাড়গ্রামে, জঙ্গলমহলে।' তখনও ঝাড়গ্রামের নিজস্ব রাজনৈতিক পরিচিতি তৈরি হয়নি। তবে অশান্ত জায়গা বলে বদনাম ছিল। 'কোনো ভাবনা নেই আমাদের গাড়ি পুলিশ কনভফয় দিয়ে নিয়ে যাবে', জানিয়েছিলেন তিনি। শুধু ফুল নয়, তাঁদের বাগানে দিশি-বিদেশি সবজিরও চাষ হয় নানা ধরনের, ফলনও প্রচুর। তিনি আমাকে মুখে আদর করে 'দিদি' বললেও কাযত্ত দাদা আমাকে তাঁর ছোটোবোন বানিয়ে ফেললেন, বয়সের সম্মানে তিনিই বড়ো। কেমন করে যেন আমাদের আত্মীয়তা জন্মে গেল প্রাণের মধ্যে। শুরু হল আমার ওদের বাড়িতে 'বাপের বাড়ি'র আদর পাওয়া। উত্তরপাড়ায় গেলেই ওখান যাওয়া চাই। না গেলে ইন্দিরার, বুম-এর ভার হবে না?'

যখনকার যেটা তখন সেইটে, ঝুড়ি ঝুড়ি শীতের সবজি, গ্রীষ্মে কার্টন কার্টন বাগানের অঅম, দাদার বাড়ি থেকে আসবেই। তিনি শিল্প সাহিত্য বালোবাসেন, যাদের পছন্দ করেন, এমন আরও অনেকের বাড়িতেই যেত শীত গ্রীষ্মের এই উপহার। আড়িয়াদহের ঘোষালপাড়ার অর্ধেক পথঘাট, বন-বাদাড়, দীঘি-পুকুর, একদা তাঁদরে নিজস্ব জমি ছি। পরিবারে একটা রক্তের চিহ্ন আছে, অল্পবয়সে নকশালদের হাতে হারিয়ে ফেলা ছোটো ভাইটির স্মৃতি।

অজয় ঘোষালই চিরাচরিত অর্থে ঘোষাল বাড়ির শেষ পেট্রিয়ার্ক। বন্ধ হয়ে যাওয়া দেড়শো বছর আগের দুর্গাপুজো আবার নতুন করে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। তাঁদের বানির দোল-দুর্গোৎসবে পাড়াসুদ্ধুর নেমন্তন্ন থাকে ভোজ খেয়ে যাওয়ার। বিশেষ করে রথে আর উলটোরথে ঘোষালবাড়ির জগন্নাথ মহা আনন্দ পান। তাঁকে পুজোর ঘর থেকে বের করে এনে রথে চড়ানো হয়, তিনি মন্দিরের মাসির বাড়ি যান। রথের সামন পথ ঝাঁটচ দিয়ে দেন পাড়ার নামী-দামি মানুষেরা। কখনও বা আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা কেউ কেউ এই সম্মান পান। রথের পথ সাফ করে দেওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আমার ননদ মঞ্জু (সুপূর্না দত্ত) ব্রাহ্ম বাড়ির বউ হলে কী হবে সে একবার নেমন্তন্ন পেয়ে আমার সঙ্গে দাদার ওখানে গিয়ে এই ঝাড়ুদারির সম্মান পেয়ে বেজায় খুশি হয়েছি। মাঝেমাঝেই সেই গল্প করতে তার বন্ধুদের কাছে।

দাদার স্বভাবের অনেকগুলো দিকের মধ্যে সেনহপ্রবমতার মতো, আড্ডাপ্রিয়তা ছিল খুব জরুরি একটি গুণ, আর ছিল মস্ত একটা দিল। দু'টোকে মিলিয়ে তঁদের সবজির বাগানে চমৎকার একটি চালাঘরে তিনি শুরু করেছিলেন, 'আড্ডাপীঠ, গুণীদের ঠাঁই। কলকাতার হেন গুণঈমানী

মানুষ নেই যিনি উপস্থিত হননি সেখানে। গানবাজনাই বলো, আর লেখালিখিই বলো, চিত্রশিল্পীই বলো আর চলচ্চিত্রজগৎই বলো, দোলের দিন সন্ধেবেলায় ঘোষালবানির 'আড্ডাপীঠের' আটচালার তলায় তাদের সবাইকে পাবে। চেনালোকের আড্ডা বসে যায় পূর্ণ চাঁদরে মায়ায়। কেু গল্প বলছেন, কেউ কবিতা, কেউ গান গাইচেন, কেউ চুটকি, কেউ স্মৃতিখা, কেু বা শুধুই ইয়ার্কি। আর সারাক্ষণ ধৈর্য ধরে একটানা বসে হাসিঠাট্টায় জমজমাট ভাবে সেই দোলের রাতের সভার পরিচালনা করছেন কে? পূর্ণচন্দ্রের তো সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল কত্তামশাই স্বযং, দাদা, শ্রী অজয় ঘোষাল।

আমরা সবাই কীভাবে যেন ওদের পরিবারের অঙ্গ হেয় পড়েছি, মাসিমা অমলাংশকর তো মাঝ মাঝে ও বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে আসেন বাপের বানি যাওয়ার মতো। আমার চোখের অপারেশএনর জন্য ওঁরা পুজো দিয়েছিলেন এবং আমাকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলে— ন। অজয় বিপত্নীক, কিন্তু সংসার পরিপাটি। কেননা দশভুজা হয়ে অত বড়ো সংসারের হাল ধরে আছেন অজয়ের বোন, অসাধারণ কর্মঠ, হৃদয়বতী এবং ধীমতী, আমাদের অতিপ্রিয় মানুষ, ড়িদরা। ইন্দরা প্রচুর পড়ুয়াও। বই অন্ত প্রাণ। আরও একটি অশাধারণ কর্মঠ মানুষ সেকানে অনেকখানি সময়ই কাটান, পুজোর সময়ে প্রতিদিন তিনশো লোকের এভাগ রান্না করেন যিনি, দাদার সুন্দরী সদাহাস্যময়ী আহ্লাদী মেয়ে বুম। তার বাপের বাড়ি শ্বশুরবানি দু'য়ের সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। অজয় ঘোষালেরও তাঁর পুত্রবৎ ডাক্তার জামাইটির ওপরে অনেকটাই নির্ভরতা। আর আছে পুত্র ঋজু, তরুণ ব্যারিস্টার, অঅমার মেয়েদের বন্ধু। ঋজুটা স্মার্ট, ছেলেমানুষ স্বভাব। অঅমার কেবল মনে হত, মাতৃহীন আদুরে ছেলে, খেনও যেন বড়ো হয়নি, কেমন করে সে হাইকোর্টে সওয়াল করে? কিন্তু দেখা গেল, ঘোষালবানির মনের জোর খুব। গোল্লাগাল্লা ঋজু এত খেতে ভালোবাসত, অথচ যেই মনে হল ওজন কমানো দরকার, এণন আশ্চর্যভাবে খাওয়া-দাওয়া কমাল, এবং হাঁটাচলা ব্যায়াম চালু করে দিল, দিব্যি স্লিম সিক্স প্যাক মূর্তি বানিয়ে ফেলেছে। এমন আত্মসংযম দেখে বিশ্বসুদ্ধ অবাক।

পশ্চিমবাংলায় টিভির পর্দায় কতকাল একটি নাম ভেসে উটেছে, অজয় ঘোষাল। এ এম আর আই-তে ভর্তি ছিলেন দাদা। ৯ তারিখে ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল তাঁর, ৯ তারিখেই বেরিয়ে এলেন। চিরমুক্তি পেয়ে।

এবারে আমাদের ঋজু বড়ো হয়ে যাবে।

১০.১২.১১

আনন্দ সংবাদ

মন ভালো থাকার দিন এসেছে আমাদের খুশি খুশি সময়। ভারতবর্ষের নতুন প্রেসিডেন্ট বাঙালি।

আমাদের মন মেজাজ বড়ো একটা ভালো থাকে না আজকাল। কাগজ খুললেই মানুষের অমানবিকতার কাহিনি পড়ি। টেলিভিশন খুললেই বিকৃত মানসিকতার 'সভ্য' জীবনযাপনের বিভিন্ন চিত্র চোখ পুড়িয়ে দেয়। খুশি হওয়ার সুযো আজকাল আসে কম। খুশির জন্যে তাকিয়ে থাকি পাতার দিকে, পাখির দিকে।

ইদানীং আমাদের মন খুবই ভালো। আনন্দে পাগল হওয়ার জন্যে ২৫ তারিখ অবধি অপেক্ষা করতে হয়নি, ১৯ তারিখ অবধিও না। যেই কাগজে ও টেলিভিশন-এ জানলুম প্রণববাবু রাজি হয়েছেন, তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপিতর পধে প্রার্থী করা হচ্ছে, সেদিন থেকেই মন প্রাণ আহ্লাদে লাফাচ্ছে। আর টিভি হয়ে উঠেছে প্রাণের সখা। শেষ অবধি মমতাদিদি ভোট দিয়ে তাঁর দাদার পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে তাঁকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, একদা মনে মনে আশা ছিল, কোনোও একদিন প্রণববাবু বসবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে। দিনের পর দিন তাঁর কাজে কর্মে মুগ্ধ হয়ে আমাদের মনে হত বুঝি সেই পদের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা তাঁরই। যে কোনোও কারণেই হোক সেটা সম্ভব হল না। জ্যোতি বসুকে যেমন দিল্লিতে পেতে-পেতেও পেলুম না আমরা, তাঁর নিজের বৈয়ামের কাঁকড়ারাই তাঁকে আটকে দিলে দলগত অদূরদৃষ্টির কারণে। সত্যিই সেটা ছিল ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি। বঙ্গসন্তান তো, তাই এখনও সেটা ভাবলে আমার রাগ হয়, মনে কষ্ট হয়। শুধু তো বাংলাকেই নয়, সারা দেশকেই বঞ্চিত করা হয়েছিল যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় পাওয়ার এক স্বর্ণ সুযোগ থেকে। প্রণববাবুকে নিয়েও মনখারাপ ছিল। তিনি অন্তরাল থেকে সমানে কলকাঠি নাড়বেন, গদি যায়-যায় হলে বুদ্ধি দিয়ে সুতো টেনে অবস্থা সামাল দেবেন, মুশকিল আসানের বর্তিকা হাতে করে দেশ-বিদেশে সভা করে নিজের দেশের মুশকিল আসান করে আসবেন, আর জগতের সামনে সমস্ত সম্মান উপভোগ করবেন অন্যেরা। দিনের পর দিন এ কি দেখে দেখে মন ভরে? একে কি সুবিচার বলে মেনে নেওয়া যায়? এসবের পরে আমরা রাগ করলে তোমরা বলবে, সংকীর্ণমনা? কিন্তু ওই যে, আমার সমস্যা, প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির ভেতরদিকের কলকব্জা কিছুই বুঝি না আমি। যা চর্মচোখে দেখি, সেইটুকুই। তো, আমার বাপু বিশাল উল্লাস হয়েছে আজ প্রণববাবুর মতো একজন অন্তর্মুখী, সুধীনজনকে আমরা দেশের রাজনীতির সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে পেয়েছি বলে। এমন নির্লোভ, পরিশ্রমী এবং সুবুদ্ধিমান, দীর্ঘকাল স্বদেশপ্রেমে আত্মনিবেদিত মানুষকে যে আমাদের দেশ তার প্রদেয় সম্মানের শিখরদেশে পৌঁছে দিতে পেরেছে, সেটা আমাদের পক্ষে খুব গৌরবের। বাঙালি হয়ে এই মহৎপ্রাপ্তি নিয়ে আমি আহ্লাদিত ও গর্বিত বইকি। আমি কাগজে পড়েছি অনেক উদার মহাপ্রাণ বাঙালি বলেছেন,

এত বাঙালি করে নৃত্য করার কী আছে? রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন, জৈল সিং, কালাম— কই এঁদের বেলায় তো তাঁদের রাজ্যের মানুষদের এমন ধারা প্রাদেশিক আদেখলেপনা করতে দেখিনি? আরে, তোমরা দেখবে কেমন করে? তোমরা তো সেখানে ছিলে না। সেই সব রাজ্যের সত্রাধারণ মানুষজন, নিজের নিজের ভাষায় তখন কী যে বলেছিলেন, কী যে করেছিলেন তা কি তুমি জানো? হয়তো এমনি একইভাবে হচ্ছিল সেই সব উল্লাসের প্রকাশ তাঁদের নিজেদের রাজ্যে, নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব ভঙ্গিতে। জাতীয় কাগজে তার রিপোর্ট বেরয়নি। আহ্লাদেপনা ব্যাপারটার পুরো ধরনধারণ তো একান্তই ঘরোয়, ভাষাগোষ্ঠীতে। আমাদের প্রেসিডেন্ট'দে সর্বদাই যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এমন না। ১৩ জনের মধ্যে সব প্রেসিডেন্টকে নিয়েই যে আমরা রাধাকৃষ্ণন আর কালাম সাহেবের মতো গর্বিত বোধ করেছি, তা বলতে পারব না। এত বিশাল গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্তির যোগ্যতা যে সকলেরই থাকে, এমন নয়। দেশের প্রাত্যহিক পরিচালনায় যদিও প্রেসিডেন্টের বিশেষ কিছু করণীয় থাকে না, তবুও মাঝে মাঝে অস্বস্তি হয়েছে। অনেককেই এই পদে কিঞ্চিৎ বেমানান ঠেকেছে। যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লাগেনি। বিদেশে দেখেছি, আমাদের একজন মাননীয় প্রেসিডেন্ট সলজ্জ ঘোমটা টেনে আসনে বসে ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। পাশে সেই দেশের জাগর প্রেসিডেন্ট বসে। যারপরনাই লজ্জা বোধ করেছি তা দেখে। কিন্তু তিনি করবেনই বা কী? তিনি তো তাঁর নিজের দায়িত্বে সেখানে যাননি। দিল্লির দাবাখেলায় চাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর কতটা ছিল জানি না। খেলার পুতুলের মতো নিজেই তিনি দলের রাজনীতির চালে ওই উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন। ওই পদে বসে সাধ্যমতো সম্ভ্রান্ত আচরণ ছাড়া কিছু করার নেই তাঁর। (এতদিন তাই ভেবেছিলুম, এখন শুনছি তা নয়, করার আছে অনেক কিছুই। কত অগুন্তি 'কোটি' ট্যাক্স পেয়ার্স মানি খরচ করে এই ক'বছরে তিনি নিখরচায় সপরিবার বারবার বিশ্বভ্রমণ করেছেন। একটা কোনো দেশ যেন বাকি ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা বোধহয়, নতুন প্রেসিডেন্ট আসার আগে তাড়াতাড়ি সেটাও নাকি সেরে নিতে চেয়েছিলেন। শেষ অবধি সেই ভ্রমণটি সুসম্পন্ন হল কি না খবর পাইন। কাগজেই দেখেছি এইসব।)

হঠাৎ দেকা যাচ্ছে মহত্ত্ব ও উদারতার উদাহরণস্বরূপ, তোমরা মননজীবীরা কেউ কেউ হয়েছ সর্বভারতীয় আর আমাদের বাকিদের বানিয়েছ পাতি প্রাদেশিক। এই কাণ্ডটা সেই অমিত চৌধুরীর প্রথম বইয়ের সুন্দর নামটি মনে পড়িয়ে দিল, 'আ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস'। মনে আছে? সেই ঠিকানাটা? পরিচয় হিসেবে আমার ওটা খুব পছন্দ। আমি একটু বদল করে নিয়েছি। আমি মানুষ, আমি এশীয়, আমি দক্ষিণ এশীয়, আমি ভারতীয়, আমি বাঙালি, আমি কলকাতার, আমি বালিগঞ্জের, আমি হিন্দুস্থান পার্কের, আমি মেয়ে। এই ঠিকানাগুলো, এই পরিচয়গুলো প্রত্যেকটাই আমার কাছে জরুরি। তাই কোনো একদিন, কোনো এক বঙ্গসন্তানকে দিল্লির মসনদের চূড়োয় দেখতে পেলে আমার মনে ফুরফুরে হাওয়া বইবে, সেই হাওয়া পালে লেগে বুক গর্বে ফুলে উঠবে, এ তো অন্যায় কিছুই নয়। ভারতীয় বলে কি আমার নিজস্ব প্রাদেশিক পরিচয় নেই? আলাদা অহংকার নেই? রবীন্দ্রনাথ বাঙালি লেখক বলে তুমি আলাদা করে একটুও গর্ব করবে না? তাঁকে একজন ভারতীয় লেখক বলে ধরে নিয়েই পরিতৃপ্ত বুঝি তোমরা, উচ্চকোটির উদারহৃদয় বঙ্গসন্তানেরা? আমি তাতে সন্তুষ্ট নই। একই অঙ্গে অনেক মানুষ আমরা প্রত্যেকেই। আর ভেতরের প্রতিটি ব্যক্তিই জরুরি।

প্রেসিডেন্ট প্রণবাবুর কথা রোজ রোজ খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। তাঁর রুটিন, তাঁর পারিবারিক খবর, তাঁর গ্রামের ইশকুলের গল্প, তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিজে পুরোহিত হয়ে প্রতি বছর দুর্গাপুজো করার কথা (প্রসঙ্গত, তাঁর স্ত্রী শুভ্রা পুজোর সময়ে নিজের হাতে সকলরে জন্য ভোগ রান্না করেছেন, যতদিন সুস্থ ছিলেন), তাঁর ফুটবল খেলা, তিনি যে পোস্ত খেতে ভালবাসেন, তা পর্যন্ত আমরা জেনে গিয়েছি। দেখেছি, ওঁর শোয়ার ঘরে খাটের পাশের টেবিলে, বাতির নিচে বেশ কয়েকটা নতুন বাংলা বই রাখা। তাঁর নিত্যিকার বই পড়ার নেশা, শোয়ার আগে খানিকক্ষণ বই না পড়ে ঘুমোতে পারেন না। আর দিনলিপিও লিখে রাখেন সাধ্যমতো। ভারতের ইতিহাস। সারা দেশের দায় মাথায় নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়োদৌড়ি, মস্তিষ্ক এবং শরীরের এত অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যেও এইভাবে নিজস্ব একটিন নিয়ম মেনে সরল, সংহত দিনযাপন, আর তারই মধ্যে রাজনীতি-অসম্পৃক্ত বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা যে কঠোর আত্মসংযমের গল্প বলে দেয়, তা থেকে কিছুটা চেনা যায় মানুষটিকে। ভারত সরকার ও বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রচিত্রাবলির যে ঐতিহাসিক সংকলন চার খণ্ডে প্রকাশিত হল কবির সার্ধশতবর্ষে, তার পশ্চাৎপটে প্রধান উৎসাহী ছিলেন প্রণবাবু। আশ্চর্য হতে হয় দেখলে, এত অন্য জাতের কাজের মধ্যেও মানুষটির সাহিত্য শিল্প রুচিতে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি। কত কিছুই করেন, কিন্তু নিজেকে কোনোদিনই সামনে নিয়ে আসা তাঁর চরিত্রে নেই। প্রচণ্ড পরিশ্রমী, তুখোড় বুদ্ধিমান, আর প্রবলভাবে আন্তরিক, ইনিই আমাদের ভারতবর্ষের নতুন প্রেসেডিন্টে। আমাদের বাঙালি প্রেসিডেন্ট।

একটা গল্প বলি। অনেক বছর আগের কথা। আশির দশকের গোড়া হবে। একদিন সকালে একজন কেউ ফোন করে আমাকে বলল, সকাল এগারোটায় সময়ে ফিনান্স মিনিস্টার আসবেন আপনাদের বাড়িতে। ছুটির দিন, আমি সকালে থাকতুমই। আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, অশোকদা হঠাৎ এমন ফর্মালিটি কেন করছেন? এমনিই তো আসেন গৌরীদি অশোকদা। আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার তখন অশোক মিত্র। তারপরে এগারোটার সময়ে প্যাঁপোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে যিনি এলেন, তিনি অশোকদা নন, তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। প্রথম আলাপ। তিনি এসেছেন লেখা পড়ে ভালো লেগেছে বলে একজন নতুন, অচেনা গদ্যকারের সঙ্গে নিজের আগ্রহে পরিচয় করতে। তিনি দিল্লির ফিনান্স মিনিস্টার। আরও একটু চেনা গেল কি নিরহংকার সাহিত্যপ্রেমীটিকে? গতকাল স্বচক্ষে প্রণবাবুর শপথগ্রহণ দেখলুম, তাঁর অপূর্ব ভাষণটি শুনলাম। হৃদয়বত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় ঝলমল করছে সেই ভাষণ। বহুদূর অবধি পৌঁছে গিয়েছে তাঁর চোখ। যেমন তেমন নয়, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রত্যেকটি জরুরি প্রসঙ্গ তিনি টেনে এনেছেন, যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে কথা কইবার পরিপূর্ণ অধিকার তিনি অর্জন করেছেন তাঁর নিজের কর্মে ও জ্ঞানে বিগত বৎসরগুলো ধরে। প্রণববাবু অবাস্তব স্বপ্নদ্রষ্টা নন। তিনি জানেন কঠিন সমস্যার সামনাসামনি কীভাবে হতে হয়, যতই শক্তিশালী হোক, দু-টো শিং কীভাবে মুঠোয় চেপে ধরে পাগলা ষাঁড়কে বাগে আনতে হয়। কিন্তু এখন, এই বিশেষ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায়, জানি না প্রয়োজনমাফিক দেশের উন্নতির স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে, তাঁর অভিজ্ঞতা, ইচ্ছে এবং পরিকল্পনার কার্যকরী ক্ষমতা কতদূর। সর্বোচ্চ শিখর হলেই বা, প্রেসিডেন্ট নাকি নৈবেদ্যের মাথায় সন্দেশ।

কিন্তু তার বিপরীতও শুনেছি। এই পদে যিনি আসীন তাঁর বোধ-বিবেচনার ওপরে ভরসা

করে, ভারতীয় কনস্টিট্যুশন-এ তাঁকে সব কিছুই করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। কিন্তু কিছুই পৃথকভাবে উচ্চারিত নেই। অবিকল ইংলন্ডের রাজা-রানির মতো, আমাদের প্রেসিডেন্টও কাগজে কলমে সর্বশক্তিমান। সবই তাঁর ইচ্ছের ওপরে। ব্রিটেনের রানির কিন্তু একটি আবশ্যিক রাজ্য পরিচালনার কাজ আছে। রাজনীতিতে ঝড় ঝঞ্ঝা যাহাই আসুক, প্রতি সপ্তাহে একদিন রানি আহ্নিক করার মতো নিয়ম করে বসেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, দরজা-বনদ ঘরে, দেশের পরিস্থিতি আলোচনায়। রানিকে সপ্তাহের সব খবর জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এর নড়চড় নেই। সেই গোপন পর্যালোচনার সময়ে রানি তাঁকে কী বললেন, সেটা সর্বসাধারণের জন্য নয়, মন্ত্রীই জানেন শুধু।

আমাদের দেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থাটি খুবই সুফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়। আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং মাননীয় প্রেসিডেন্টকে, যে অনুরূপ উপায়ে আমাদের রাষ্ট্রপতির ও প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে এবার থেকে এই একটা নতুন অবশ্যকরণীয় কাজ যুক্ত হোক।

শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী যতই ব্যস্ত থাকুন, সময় করে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একটিবার অনুগ্রহপূর্বক অত্যাবশ্যকভাবে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একান্তে দেখা করবেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁর ভবনের ৩৪০টি কামরার মধ্যে একটিতে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসবেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে গোপন পর্যালোচনায়। তাতে ভারতবর্ষের উপকার হবে। রাষ্ট্রপতির দিনযাপনের পুরনো নীতি তো চলছে, চলবে, সঙ্গে কিছু কিছু নতুন ব্যবস্থাও যুক্ত হোক না। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি যখন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর দীর্ঘ, ব্যাপ্ত, হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার সুযোগ আমাদের দেশের পাওয়া উচিত।

প্রণববাবু, শুনছেন তো? মনমোহন, শুনুন আপনিও। এই গরিব জনগণের কথায় কান দিন। এতে আপনার ভালোই হবে এবং আমাদেরও।

যাই হোক, আমি তো নাতনিকে বলতে পারব, জানিস হিয়ামন, আমাদের বাড়িতে একদিন ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন, আপনা থেকে।

‘ইলাবাসের’ জ্যাঠামশাই

আমার ছোটোবেলাতে হিন্দুস্থান পার্কে কয়েকটা বাড়ির ঠিকানা ছিল তাদের নামগুলি— যেমন ধরুন, ‘ইলাবাস’, ‘সুধর্মা’, ‘ভালো-বাসা’। তিনটি বাড়িরই গৃহকর্তাদের নাম ছিল সর্বজনপরিচিত। ‘ভালো-বাসা’ বাড়ির তো গৃহকর্তার সঙ্গে গৃহকর্ত্রীও ছিলেন সুপরিচিতা। ‘সুধর্মা’ বাড়িটি ছিল কাকাবাবু-কাকিমার, পাঁচ মেয়ে, এক পুত্র এবং অগুন্তি বই নিয়ে তাঁদের সংসার। ‘ভালো-বাসা’ বাড়িতে থাকতেন আমার বাবা-মা, আমাকে নিয়ে। আর ‘ইলাবাস’-এ থাকতেন জ্যাঠামশাই, জেঠিমাকে আমার মনে পড়ে না, দুই দাদা, দুই বউদিদি আর বড়োদার পাঁচকন্যে, ছোড়দার দুই পুত্র নিয়ে। ‘সুধর্মা’ বাড়িতে সবাই বড়ো, তবুও কাকাবাবুর ছোটো দুই মেয়ে আমার খেলার সাথী ছিল, বুলু আর টুলু। আমি ওদের দুজনের চেয়েও বয়সে ছোটো বলে বুলু কিঞ্চিৎ সর্দারি করত। টুলু কিন্তু করত না। আর ‘ইলাবাস’-এ আমার খেলার সাথী ছিল একগুচ্ছ— সমবয়সি ছিল শুধু সুনন্দা, কিন্তু সে চিরকালই রুগ্ন, ভীরু এবং শান্ত। আমিও রুগ্ন কিন্তু চঞ্চল এবং দুরন্ত। তাই আমার সঙ্গে সুনন্দার তত ভাব জমত না। কাজলদিদি অনেকটা বড়ো হলেও তার সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল। আর সুনন্দার ছোটো বোন ‘মম’ ছিল খুবই ছোটো। গত ২৫ বছর অবশ্য সুনন্দার বড়ো মেয়ে ঈশিতাই আমার ‘ইলাবাস’-এর বন্ধু। সে কবি। এবং পাঠক। ঈশিতার মামারা, রবি আর অলোক, ওরা লাজুক মেয়েদের সঙ্গে খেলত না। যদিও আমরা সকলেই ছিলাম মণিমেলার সদস্য আর পাড়ার মণিমেলাটি ছিল ‘ইলাবাস’-এরই বাগানে। বিকেলবেলা হলেই সবাই ছুট ছুট ‘ইলাবাস’-এর বাগানে। সেখানে আমরা ব্রতচারী নৃত্য, জারিগান, সারিগান তো শিখতুমই, শিখেছি লাঠিখেলা, ছুরি খেলাও। আমাদের পাড়ার ‘বিবেকানন্দ মণিমেলা’ রীতিমতো উচ্চপ্রশংসিত মণিমেলা ছিল।

তাছাড়াও আমরা পাড়ার মেয়েরা মিলে তখন মাঝে মাঝে নাটক করতুম, নাচ-গান করতুম, সরস্বতী পুজোয় ‘ফাংশন’ হত। তখনও ‘ইলাবাস’ বাড়ির মেয়েরা খুব করিৎকর্মা হয়ে উঠত। আমার ছোটোবেলার অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে ‘ইলাবাস’-এর বাগানে। তার ঘাসে ঘাসে, তার গাছে গাছে।

‘ইলাবাস’-এর পাশে এখন যেখানে শিল্পী সুনীলমাধব সেনের দোতলা বাড়িটা আছে, সেখানে পঞ্চাশ বছর আগে একটি বিশাল ঝুরি দোলানো বটবৃক্ষ ছিল। গাছটি ‘ইলাবাস’-এর বাগানেই ছিল, নাকি তার সীমান্তে, অতশত আমার মনে নেই— আমাদের মনের হিসাবে ওটি ‘ইলাবাস’-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত রেখা সূচিত করত। বৃদ্ধ বটগাছটি প্রচুর পাখির আশ্রয় ছিল, আর আমাদের বাড়িগুলির সামনের রাস্তাটি লাল টুকটুকে বটফলে ভরিয়ে রাখত। সেই গাছ যেদিন কেটে ফেলা হল, সেদিন আমার বুকের মধ্যে যে কষ্ট, যে বিস্ময়, যে যন্ত্রণা, আজও তার স্মৃতি তেমনই জোরালো আছে। এমন বিপুল মহীরূহ যে কেটে ফেলা সম্ভব সেই সত্য আমাকে প্রচণ্ড বিচলিত উদ্‌বিগ্ন করেছিল। পৃথিবীতে কিছুই তাহলে নিশ্চিত নয়? সুস্থির নয়?

'ইলাবাস'-এর বাগানে একটি রোগা পাতলা বকফুলের গাছ ছিল— তাতে প্রচুর সাদা বাঘনখের মতো বাঁকা বকফুল ফুটত। সেই ফুলের পকৌড়া ভেজে খেতে খুব ভালো লাগত। মাঝে মাঝে বউদিরা এ বাড়িতে বকফুল পাঠিয়ে দিতেন। ওই গাছে কখনো চড়িনি, বড্ড রোগা গাছ। কিন্তু 'ইলাবাস'-এর বাগানে আরেকটি ফলন্ত মোটাসোটা গাছ ছিল, জামরুল গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ জামরুল ফলত। সেই গাছে চড়া খুব একটা শক্ত ছিল না, নামা তো আরও সোজা। নামবার সময়ে ডাল ধরে ঝুলে দক্ষিণের ছাদে লাফিয়ে পড়লেই হল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো। (গাছ বেয়ে নামটা শক্ত ছিল— কিন্তু গাছ বেয়ে নামতে হবে কেন?) মণিমেলায় আমিই যা গাছে চড়িয়ে মেয়ে ছিলুম। 'ইলাবাস'-এর মেয়েরা ভদ্রসভ্য, তারা গাছে চড়ত না। জামরুল পেড়ে দিলে খেত। আমি চিরকালই আদর-আহ্লাদ পেয়েছি বউদিদিদের কাছে— বউদিরা তো নামেই বউদি— তাঁরা মায়ের মতো ছিলেন। বেবিবউদি আর পুতুলবউদি। বড়ো বউ বেবিবউদি গোলগাল গিন্নিবান্নি। ছোটো বউ পুতুলবউদি পুতুল পুতুল। রোগা, ফর্সা কোঁকড়া চুল। বিবাহিত দুই দিদিই ছিলেন আমার চোখে পরমা সুন্দরী। বৃদ্ধ বয়সেও রোগা, লম্বা তরুণীর মতো সুতন্বী ছিলেন তাঁরা দুই বোন।

'ইলাবাস'-এর জ্যাঠামশাইয়ের একশো বছর যে বছর উদযাপিত হল, তখন তাঁর ছেলেরা কেউ জীবিত নেই— এই দুই কন্যাই উদ্যোগ নিয়ে শতবর্ষের জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, সেই পরিকল্পনার অনেকটাই 'ভালো-বাসা' বাড়িতেও হয়েছিল। আমার বাবা তখন নেই, কিন্তু মা রাধারাণী দেবী ছিলেন ওঁদের উপদেষ্টা।

'ইলাবাস'-এর জ্যাঠামশাই, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর এ বছর ১২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে ২৭ নভেম্বর। আর ৩০ নভেম্বর রাধারাণী দেবীর শতবর্ষ পূর্তি হবে। সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটোবলার হিন্দুস্থান পার্কের দিনগুলো। 'সুধর্মা' বাড়ির কর্তা ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি নেই, তাঁর পুত্র বাদলদাও চলে গেছেন। 'সুধর্মা' বাড়িতে এখন FAB INDIA-র দোকান বসেছে। ক্রেতারা কি জানতে পারেন, কোন তীর্থস্থানে তাঁরা পোশাক কিনতে গেছেন?

'ভালো-বাসা' বাড়িতেও নরেন্দ্র দেব-রাধারাণী দেবী আর নেই। তাঁদের মেয়ে, আমি আছি। বাড়ির এখনও অদলবদল হয়নি কিছু। জানি না, যখন আমি থাকব না, তখন এ বাড়িটি কেমন হবে।

'ইলাবাস' বাড়িরও বদল হয়েছে অনেক। দাদা-বউদিরা কেউ নেই। দিদিরাও না। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাতি-নাতনিরা আছেন। সেই বাগান আর নেই, ঘরদোর উঠে গেছে সেখানে। কেবল সদর দরজার মুখে 'ইলাবাস' নামটি লেখা আছে মর্মর ফলকে। আজও অমলিন।

চোখ বন্ধ করলে আমি দেখতে পাই সামনের ঘরের তক্তপোশে, বুকে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, গোল গোল সোনালি ফ্রেমের চশমা চোখে, কখনো ফতুয়া পরে, কখনো খালি গায়ে, সম্ভবত লুঙ্গি, বা লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরে, জ্যাঠামশাই বসে আছেন। জ্যাঠামশাইকে খুবই ভয় পেতুম— অথচ তিনি আমাকে কোনোদিনই বকুনি দিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তক্তপোশের ওপারে তো জ্যাঠামশাই বাঘের মতো বসে আছেন, আর তক্তপোশের নীচে কী? সারি সারি বয়াম। আর আমার দৃঢ় ধারণা সেইসব বয়ামে ভর্তি ভর্তি আচার রাখা আছে! সেই

আচার কে বা বের করে, কে বা খায়! আজও জানি না বয়ামগুলোতে সত্যি সত্যি আচার ছিল কি না। কাজলদিদি, অঞ্জলিদিদি, দীপাদিদিরা নিশ্চয় জানবে। ওরা আসলে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাতনি, আমি যদিও দিদি ডাকি। হিসাব কষলে আমিই আসলে ওদের পিসি। ওদের মা আমার বড়োবউদি। সুনন্দা, চতুর্থ বোনটি আমার সমবয়সি, একই সপ্তাহে জন্ম আমাদের— আমি বৃহস্পতিবার, সুনন্দা মঙ্গলবার। দুজনেরই ডাকনাম খুকু। এই সুনন্দারই মেয়ে কবি ঈশিতা ভাদুড়ী। এখন যে আমার 'ইলাবাস'-এর বন্ধু। সুনন্দার পরে আরেকটিও বোন আছে, মম। সে খুবই ছেলেমানুষ ছিল, আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল না। আমরা 'ইলাবাস'-এ খেলতে যেতুম। কেননা ও বাড়িতে যেমন বাগান ছিল, তেমনই খেলার সঙ্গীও ছিল। বাগানে খেলা করতে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। আমদের বাড়িতে রুমালের মতো ছোট্ট এক টুকরো তিনকোণা বাগান ছিল, খেলার ঠাঁই হত না। 'সুধর্মা' বাড়িতে বাগান ছিল, কিন্তু সেখানে খেলাধুলো করার স্মৃতি আমার নেই। কাকিমাকে খুবই ভয় পেতুম, কাকাবাবুকে যদিও না। বরং কাকাবাবুর (সুনীতিকুমার) সঙ্গে পরে বড়ো হয়ে আমার রীতিমতো ভাব হয়েছিল।

'ইলাবাস'-এর জেঠুর সঙ্গে আমার ভাব ছিল না। যদিও আমি ছিলুম তাঁর নাতি-নাতনীদের খেলার সাথী, তিনি আমাকে কখনো কাছে ডেকে আদর করেছেন বলেও আমার মনে পড়ে না। যা গম্ভীর মানুষ! তাঁর কাছ থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়েই বেড়াতুম। 'ইলাবাস'-এর কর্তা ছিলেন তিনিই। বউদিদিদের এ বাড়িতে 'কাকিমা'র কাছে আসা-যাওয়া ছিলই, মা-ও ওঁদের খুব স্নেহ করতেন। বউদিরাও ওঁকে অভিভাবিকার মতো মনে করতেন, সংসারের নানা ব্যাপারে উপদেশ, পরামর্শ চাইতে ওঁরা আসতেন মার কাছে।

জ্যাঠামশাইকে আমার ভয় ভয় করত। তাঁর ওই চশমা পরা, ফতুয়া পরা গম্ভীর গোলগাল মুখখানিকে আমি কিছুতেই... 'মাগো আমার শোলোক বলা কাজলাদিদি কই?'...-র সঙ্গে মেলাতে পারতুম না। এমনিতেই কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার মনে ভীষণ কষ্ট হত। অনেক বছর পরে, যখন আমি বড়ো, কাজলাদিদির গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, গানটি শুনলেই আমার ভিতরে ভিতরে ছোটোবেলার মতোই কান্না পেত।

তারপরে দেখি, আমার দুই কচি কচি কন্যারও কাজলাদিদির রেকর্ডটি শুনলেই ঠোঁট কেঁপে যায়— টলটলে জল এসে যায় চোখে— ওরাও ওই গানটি শুনতে পারে না, আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। অবিকল আমারই মতন। 'ইলাবাস'-এর জেঠুর একখানি কবিতা এই যে প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে ছোটোদের চোখে জল আনছে, জীবনে এরকম একটি মাত্র কবিতাও লিখতে পারা এক কবির পক্ষে কম কীর্তি নয়। আমি তো এরকম হলে কবি-জীবন সার্থক মনে করব।

নভেম্বর ১৪, ২০০৩

দাদাভাইয়ের গল্প

দাদাভাইয়ের সঙ্গে বসলেই দারুণ দারুণ সব গপ্পো শুনতে পাই। সেদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাচ্ছি শ্যামবাজারে, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে অনেকটা পথ। পার্ক সার্কাসের পদ্মপুকুর অঞ্চলের কাছে একটি বাড়ি দেখিয়ে দাদাভাই বললে,— 'ওইটা মান্নাদার বাড়ি, মান্নাদার ৮০ বছরের জন্মদিন গেল পরশুদিন। কী চমৎকার মানুষ।'

—শৈলেন মান্না, উনি হাওড়ায় থাকেন না?'

—'থাকতেন, কিন্তু আসা-যাওয়ার অসুবিধা হয় বলে এই বাড়ি তো ওঁকে যতীনদা দিয়েছিলেন, যখন উনি পূর্তমন্ত্রী। অনেক ভালো কাজ করে গেছেন যতীনদা। বিশেষ করে খেলার লোকজনের জন্যে প্রচুর করেছেন।' দাদাভাই নিজেও খেলার লোক। হ্যাঁ, 'খেলা' বলে একটা পত্রিকাও আছে ওদের, কিন্তু সেটার কথা হচ্ছে না, ভারতবর্ষের ফুটবল জগতে অশোক ঘোষ নামটি জরুরি। শুরু ফুটবল দিয়ে IFA, তারপর AIFF, তারপর FIFA। তারপর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে দাদার খেলা নিয়ে কাজকর্মের এরিয়া— Bengal Olympic Association-এর প্রেসিডেন্ট, Indian Olympic Association-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সর্বত্র, Asian Games, Commonwealth Games, Afro Asian Games— কোথায় নেই দাদাভাই? দাদাভাই বার্সেলোনা অলিম্পিকে ভারতবর্ষের শেফ দ্য মিশন ছিল। পতাকা হাতে শোভাযাত্রার সামনে হেঁটেছিল, একমাত্র বঙ্গসন্তান এই কর্মটি করেছে! দাদাভাই ৬টা অলিম্পিক দেখেছে, ৬টা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছে, (আমার দাদা ভারতবর্ষে একমাত্র লোক যার এই সৌভাগ্য হয়েছে) বহু এশিয়াড, বহু সার্ক, বহু কমনওয়েলথ গেমস, স-ব দেখেছে আমার দাদা। আর তেমনি আড্ডাবাজ।— 'যতীনদা দারুণ মজার মানুষ ছিলেন।' দাদাভাই শুরু করল যতীন চক্রবর্তীর গল্প। দাদাভাই তখন FIFA-তে। — 'যতীনদা একদিন আমাকে ফোন করলেন। সেবার স্পেনে ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে। যতীনদা বললেন, 'অশোক, আমি তখন লন্ডনে মেয়ের কাছে থাকব, স্পেনে চলে যেতে পারব, আমাকে একটা টিকিট জোগাড় করে দেবে?' আমি বললুম 'নিশ্চয় চেষ্টা করব।' স্পেনে গিয়ে কর্তাদের জানালুম, 'আমাদের মিনিস্টার খেলা দেখতে চান অন্তত একদিনের জন্য, একটা VIP টিকিট দিতে হবে।' টিকিট পাওয়া গেল, কিন্তু মাদ্রিদে নয়। বার্সেলোনাতে। যতীনদা লন্ডন থেকে মাদ্রিদে এলেন। প্রিয়বাবু (দাশমুন্সী) আর আমি মাদ্রিদেই ছিলাম, তিনজনে একসঙ্গে বার্সেলোনা গেলাম। হোটেলে আমাদের দুটি ঘর বুক করা ছিল। যতীনদাকে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বাবু আর আমি অন্য ঘরটাতে থাকব, ঠিক হল। ভোরে উঠে দেখি প্রিয়বাবু বসে বসে বই পড়ছেন। 'এত ভোরে উঠে পড়েছেন?' প্রিয়বাবু করুণ হাসি হেসে বললেন,— 'ঘুমোলাম কখন? আপনি এমনই নাক ডাকালেন যে শুতেই পারা গেল না!'...

দাদাভাই নাক ডাকে ঠিকই, তবে সেটা এমন কিছু নয় বলেই আমদের মনে হত। যেহেতু

আবাল্য শুনছি। পরিণত বয়সে অকস্মাৎ সেই নাসিকা গর্জনের মুখোমুখি হলে কেমন লাগবে, সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। একবার অমর্ত্য, সুখময় (চক্রবর্তী), আমি ও ললিতা (চক্রবর্তী) বস্টন থেকে গাড়িতে ওয়াশিংটন বেড়াতে গিয়েছিলুম ১৯৬১-তে। গিয়ে অশোকদা গৌরীদির (মিত্র) কাছে উঠব, উনি তখন (World Bank)-এ। অশোকদাদের ফ্ল্যাটটি খুব দামি পল্লিতে, তাই খুব ছোটো। শোবার ঘরে খাটে শুলুম আমরা তিন বউ, আর বসার ঘরের কার্পেটের ওপরে বিছনা পেতে শুলেন তিন স্বামী। মাঝে আছে রান্নাঘর। মধ্যরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রকাণ্ড শব্দ হচ্ছে। একটা কোনো মেশিন চলতে শুরু করেছে কোথাও। দেখি ললিতাও উঠে বসেছে। — 'ভূমিকম্প হচ্ছে?'— 'কী জানি রে? শব্দটা কীসের?' বিছানা ছেড়ে উঠে আমরা দুজন গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে যাই— যত কিছু যন্ত্রপাতি তো সেইখানে— হঠাৎ যদি একটা কিছু চলতে শুরু করে থাকে? না, রান্নাঘরে কোনো যন্ত্র চলছে না। পরের ঘরটাই বসার ঘর। সেখানে দেখি আলো জ্বলছে।

টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে অমর্ত্য আর সুখময় বসে বসে দাবা খেলছেন। মেঝেয় অশোকদা অকাতরে নিদ্রামগ্ন। তাঁর নাসিকা গর্জনেই আমরা চারজন জেগে আছি। গৌরীদির তো স্বামী, তাই তিনিও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। নো প্রবলেম! দাদাভাই আর প্রিয়বাবুর গল্পে সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল।

দাদাভাইয়ের নাক ডাকার আর একটা গল্প জানি আমরা। সেবারেও ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে— মিউনিখে। সম্ভবত ১৯৭৪, দাদাভাই গিয়েছে কলকাতা থেকে খেলা দেখছে। অভীক ('আজকাল' খ্যাত, দাদাভায়ের ছোটো ভাই অভীক ঘোষ) গিয়েছে লস এঞ্জেলস থেকে। তারা দুজনে উঠেছে দাদাভাইয়ের বন্ধু সত্যর বাড়িতে। সত্য ব্যাচেলর। তার একটাই বড়ো ঘরে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। সেইখানে আদর করে সোফা কাম বেডটাতে (ডবল বেড) দুটি বিছানা করে দাদা ও সত্য— দুই বন্ধু শুয়েছে। পাশে একটা সিঙ্গল সোফাতে অভীককে বিছানা করে দিয়েছে।

সকালে উঠে দাদাভাই দেখে অভীক ঘুমন্ত, সত্য কফি খাচ্ছে, কাগজ পড়ছে, চুল খাড়া খাড়া। দাদাভাই বলল, 'কী রে, ভালো ঘুম হল?' সত্য বলল— 'ভালো ঘুম? ডানদিকে আপনি গাঁক গাঁক করছেন, বাঁদিকে আপনার ভাই কোঁ কোঁ করছেন— আমি ঘুমোব কী?'

পরের রাত্রে দুই ভাইকে ঘর ছেড়ে দিয়ে সত্য তার গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে শুতে চলে গেল। দাদাভাইয়ের মতে সেইটেই টার্নিং পয়েন্ট— ওই গার্লফ্রেন্ডই তার পর বউমা হয়ে ঘরে এলেন।

সে যাই হোক— আমাদের দাদাভাই এখন মিউনিখে নেই, তিনি বার্সেলোনাতে। দাদা, প্রিয়বাবু আর যতীনবাবু। খেলা হবে ব্রাজিল ভার্সেস ইতালি।— 'তিনজনে মিলে তো মাঠে গেছি। মাঠের বাইরে টি শার্ট বিক্রি হচ্ছে— ব্রাজিলের, আর ইতালির। যে যাকে সাপোর্ট করছে, সেই টি-শার্ট কিনে পরে নিচ্ছে। আমি কিনলুম না। প্রিয়বাবুও কিনলেন না। কিন্তু যতীনদা কিনলেন। 'ব্রাজিল' লেখা চমৎকার টি-শার্ট। কিনে, জামা খুলে সেইটি পরে নিয়ে মাঠে ঢুকলেন। কিন্তু যথাসাধ্য উৎসাহ দান সত্ত্বেও ব্রাজিল সেদিন হেরে গেল। মন খারাপ করে বেরোচ্ছি। আমরা সকলেই ব্রাজিলের সাপোর্টার যদিও টি-শার্ট পরেছেন যতীনদা একাই।

ফেরার পথে গাড়িগুলো থেকে কেবলই গলা ফাটানো চিৎকার উঠছে ইতালির ফ্যানেদের— 'ইতালিয়া। ইতালিয়া! ইতালিয়া!' ব্রাজিলের নামগন্ধ নেই। সাপোর্টারদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

যতীনদা কিছুক্ষণ ব্যাপারটা দেখলেন। তারপরে টি শার্টটা খুলে, নিজের জামাটি গলিয়ে নিলেন। এবং তারপরে শূন্যে মুঠি ছুড়ে, 'ইতালিয়া। ইতালিয়া! ইতালিয়া!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চললেন।

আমরা তো কাণ্ড দেখে হাঁ। প্রিয়বাবু বলেই ফেললেন যতীনদাকে— 'যতীনদা, আপনি অ্যাত্তো তাড়াতাড়ি পার্টি বদল করেন? তাহলে তো দেশে ফিরে এবারে আপনাকে আমার দলে টানবার চেষ্টা করতে হবে— কংগ্রেস থেকে দাঁড় করাব আপনাকে—।'

যতীনদা হাসতে হাসতে বললেন— 'দূর দূর! এই পার্টি কি আর সেই পার্টি? সবাই হই চই রইরই করে মাথা উঁচু করে ফিরছে, আমি কি চোরের মতো মাথা নীচু করে ফিরব নাকি? অলওয়েজ মাথা উঁচু করে থাকতে পছন্দ করি— ইতালিয়া! ইতালিয়া!'

দাদাভাইয়ের গল্পে মনে পড়েছিল যতীনবাবুর অফিসযাত্রার কথা। রোজ সকালে তিনি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াতেন, জ্যোতিবাবুর গাড়িতে একসঙ্গে রাইটার্সে যাবেন বলে। যতক্ষণ জ্যোতিবাবু না নামছেন, রাস্তার ছেলেবুড়ো রিকশাওয়ালা সবার সঙ্গেই তাঁর বাতচিত করা চাই। ঠিক ওই সময়ে আমিও বেরোতুম বাচ্চাদের ইস্কুলে পৌঁছে দিতে। আমার সঙ্গে, আমার মেয়েদের সঙ্গেও তিনি হাসিঠাট্টা করতেন। যেদিন উনি মনুমেন্টের মুণ্ডুটা লাল রং করলেন, সেদিন তাই ওঁরই জন্যে মনে দুঃখ হয়েছিল, রাগ হয়নি। ওঁর মেয়েটি যখন খুন হয়ে গেল দিল্লির উপকণ্ঠে, কারোরই সন্দেহ ছিল না খুনি কে— খুনি যে জামাতাবাবাজি, সকলেই তা বুঝেছিল। শুধু মানতে পারেননি যতীনবাবু। এতটা বিশ্বাসঘাতকতা, এতটা নির্মমতা মানতে পারেননি। সরকারও সেই হত্যামামলা নিরসনের কোনো চেষ্টা করেনি। বরং পুরো ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।— 'যতীনদা সন্তানশোকেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন' — দাদাভাই বলল। আমিও ঠিক সেটাই ভেবেছিলাম সেই মুহূর্তে। আমরাও শুনেছিলাম সেই ব্যাপারে পার্টির কাছেও ঠিকমতো সাপোর্ট পাননি তখন— মনোকষ্টেই নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাঁর। যে লোকটি মাথা উঁচু করে বাঁচতে ভালোবাসতেন, তিনি মাথা নীচু হওয়ার আগেই চলে গেলেন সেই দেশে, যেখানে নীচু মাথা উঁচু হয়, আর উঁচু মাথা নীচু।

অক্টোবর ১৫, ২০০৩

শেকলভাঙা মেয়ে

আমাদের এই সন্ধ্যাটি যাঁকে নিয়ে, যাঁর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত, তাঁর মতো মানুষ আমার এই অতি দীর্ঘ জীবনে আমি বেশি দেখিনি। কনিষ্ঠদের স্মরণসভায় থাকতে কারুর ভালো লাগে না।

মীনাক্ষী আমাদের চেয়ে অনেক ছোটো, তাঁর স্বামী সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের বন্ধু মানবেন্দ্রের ভাই। ওদের মতো এমন আশ্চর্য নির্লোভ এবং সংবেদনশীল জুড়িও বেশি দেখা যায় না। আদর্শ ওঁদের জীবনে অলংকার ছিল না, আত্মপরিচয় ছিল।

মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার যে খুব ঘন ঘন দেখা হত তা নয়, কিন্তু যখনই দেখা হত, সেই সাক্ষাৎটি প্রাণের স্পর্শে উষ্ণ, উজ্জ্বল একটি নিখাদ মানুষকে আমার জীবনে উপহার দিয়ে যেত। আন্তরিক শ্রদ্ধা কেড়ে নেবার মতো মেয়ে ছিলেন মীনাক্ষী। বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি না করেই বলা যায়, আত্মবিশ্বাসে এবং পরের প্রতি সম্মানে সমানভাবে ঝলমলে এমন প্রকৃত সম্ভ্রান্ত মানুষ আমাদের মধ্যে বেশি নেই। মীনাক্ষীর খোঁজ নিচ্ছিলুম, আমাদের আগামী 'সই-মেলাতে' তাকে ডাকব বলে। তাঁর জেল বিষয়ক লেখাগুলি জড়ো করে একত্রে নতুন করে বেরুল, 'জেলের ভেতর জেল' নামে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, জয়াকে (তার 'হন্যমান' আমরা ভুলিনি) আর মীনাক্ষীকে সামনাসামনি বসিয়ে জেলের মেয়েদের নিয়ে একটি কথোপকথন রাখব। সেই সঙ্গে অলকানন্দাকে ডাকব, আলোচনার ওপরে মন্তব্য করতে। জেলের মানুষদের নিয়ে তিনি অনেক দিন ভালোবেসে কাজ করে চলেছেন। রামকুমারের কাছে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুনি মীনাক্ষীর স্ট্রোক হয়ে, তিনি হাসপাতালে, শেষ অবস্থায়। তার কিছুকাল আগে আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল, পরের সপ্তাহেই বোধ হয় কলকাতায় চলে আসার কথা ছিল তাঁর, অবসর পেয়ে, মাকে নিয়ে। ছেলের চেন্নাইয়ের কলেজে ভর্তির খবর দিলেন খুব আনন্দ করে। ওই ছেলেকে তার মা এক দিনও ছেড়ে থাকবেন কী করে তাই ভাবছিলুম। নানা সভাসমিতিতে ওঁকে দেখেছি বাচ্চাটাকে সঙ্গে আনতে। সে সভাঘরে আসত না, কোথাও সিঁড়ির ওপরে বসে নিজের মনে বই পড়ত, মা মিটিং করে বেরিয়েই ছেলের কাছে ছুটতেন।

আমাদের দ্বিতীয় 'সই-মেলা'তে তাঁকে আমরা আদর করে ডেকে এনেছিলাম। সেদিনকার একটি ঘটনা বললেই আমাদের সামনে মীনাক্ষীর নিরহংকার আত্মবিশ্বাসের ছবিটি স্পষ্ট হবে। উদ্বোধনের দিনে আমি মঞ্চে এক এক করে ডেকে নিচ্ছি বিভিন্ন রাজ্যের অতিথি লেখিকাদের, পরিচয় করিয়ে দিচ্চি শ্রোতাদের সঙ্গে। আসাম, ওড়িশা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড একে একে সবাই উঠে এলেন, আমি বেশ নার্ভাস, ও উত্তেজিত। তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে, আমার বক্তৃতা শুরু করতে যাচ্ছি, মনে হল যেন মঞ্চের নীচে, উইংস থেকে কেউ একগাল হাসি নিয়ে হাত নেড়ে ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকছেন, আর কিছু বলছেন। বলছেন, 'ও দিদি, আমি আছি, আমাকে ডেকে নিন?' আমার ভুলে মজা পেয়ে হেসে আকুল মুখখানি ত্রিপুরার মীনাক্ষীর।

আমি জানি না সভার মাঝখানে আমি মঞ্চে তাঁকে ডাকতে ভুলে গেলে আর কোনো লেখিকা এইভাবে সভার মধ্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আমার মুখরক্ষা করতেন কিনা? ভালোবেসে ও আমার ভালোবাসায় বিশ্বাস রেখে আমাকে বেদম লজ্জা ও অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতেন কিনা। আমাদের যে বড্ড ঠুনকো মান সম্মান। কাউকে আদর করে ডেকে এনে, এমন করে সহসা ভুলে গেলে সেটা যে ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়, এটুকু বুঝে নিতেন কজন সহমর্মী অতিথি? মীনাক্ষীর মতো উদার হৃদয়ে আমার ভুল শুধরে নেবার সুযোগ দিতেন কজন? অধিকাংশই সম্ভবত নিজেকে অবহেলিত, অপমানিত বোধ করে অভিমানে ফিরে চলে যেতেন, আমার চিরশত্রু হয়ে। ভুলো লোকের চট করে শত্রু হয়। আর লেখক শিল্পীদের চট করে খুব মান-অভিমান হয়।

মীনাক্ষীর বইয়ের বিষয়ে বলবার জন্যে অনেকে আছেন। অসামান্য সংবেদনশীল, বুদ্ধিদীপ্ত কাজ, জেলের মধ্যে কীভাবে অনাচার অবিচারের শিকার হয় বন্দিনীরা অসহায় শিশুরা, আমাদের সামনে এমন করে তুলে ধরেননি খুব বেশি মানুষ। ১৯৯১-এ 'স্পন্দন'-এর পরে ১৯৯৮-এ 'প্রতিক্ষণ' থেকে বেরিয়েছিল মীনাক্ষীর লেখাগুলি। এতদিনে ২০১৪-তে মীনাক্ষীর সব লেখাগুলি একসঙ্গে ছেপে সর্বসমক্ষে পৌঁছে দেওয়ার একটা সুব্যবস্থা করলেন 'কারিগর'। এ জন্য আমরা দেবাশিসের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বইটি খুব জরুরি সংযোজন। কিন্তু আজ আমরা সেই আহ্লাদটা করব কাকে নিয়ে?

সেই গৌরবের যিনি অধিকারিনী সেই মানুষটিই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই! মীনাক্ষীকে কলকাতায় পাইনা আমরা, কিন্তু আজ থেকে যেন সেই অভাব বেশি করে অনুভব করা শুরু হল।

আমি শুধু বলব উনিশ থেকে তেইশ, জীবনের এই ফুটে ওঠার সব চেয়ে জরুরি সময়টা এই মেয়ের কেটেছে হৃদয়হীন কারাগারে— নগ্ন পাগলবাড়ি আর স্টেমলেসের বন্দিনীদের বহিরঙ্গের আর অন্তরঙ্গের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে— যন্ত্রণা, বঞ্চনা, অবিচার, যৌন অনাচার, শাস্তি আর নির্মমতার মধ্যে— পাপপুণ্যের বিচারবিহীন, ক্ষমতালোলুপ কিছু কুৎসিত মনের মাঝখানে, নিরুপায় বন্দিজীবনে। সেই নরকের মধ্যেও মেয়েটি কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো করে খুঁজে পেয়েছে মনুষ্যত্বের মায়া, টুকরো টুকরো দরদী মনের স্পর্শ। আমরা দেখি, সব রকম পরিস্থিতিতেই তাঁর খোলা চোখ, আর শিরদাঁড়াটি আত্মবিশ্বাসে ও মানবতার মমতায় সোজা হয়ে আছে। শুধু তো সাহিত্যমূল্যেই ঐশ্বর্যমান নয়, এটি একটি বিশেষ সময়ের দলিল। রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার মূল্যে মীনাক্ষীর এই জরুরি বইটি ইতিহাস, মানবীবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় সহায় হবে।

ভালো করে ভেবে দেখলে হয়তো বিস্মত হবার কিছু নেই। এতদিন ধরে এত অমানবিকতা প্রত্যক্ষ করার পরে, সর্বান্তঃকরণের প্রতিবাদে তার বিপরীতচারী হয়ে ওঠাই আদর্শবাদী মেয়েটির পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। এতটা অসুন্দরের মধ্যে ছিলেন বলেই হয়তো অন্তরে অন্তরে আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে মানুষের আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। নিজেকে হারিয়ে যেতে দেন নি। এত সহৃদয়, এবং আত্মনির্ভর করে নিজেকে গড়ে নেওয়া হয়তো এমন মেয়ের পক্ষে বিস্ময়ের কিছু নয়।

কিন্তু তার বিপরীতও তো হতে পারতো। এই একই অভিজ্ঞতা তাঁকে বানাতে পারতো নির্মম

স্বার্থসন্ধানী ও মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা, অস্থির একটি মেয়ে। —পায়ের তলায় মাটি হারানো, ক্রুদ্ধ, কাতর এবং জটিল কোনো অসামাজিক প্রাণী, —অনির্বাণ অশান্তিতে পীড়িত, শূন্যহৃদয়।

এমন দুঃখী মানুষও আমাদের জীবনে একাধিক দেখতে হয়েছে। কণ্টকিত মন নিয়ে তারা নিজেরাও সুখী হয় নি অন্যকেও সুখ দিতে পারে নি।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, সে তীব্র যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা মীনাক্ষীকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করেছিল। তাঁর অন্তরে একই সঙ্গে সমান উজ্জ্বল বুদ্ধির দার্ঢ্য আর হৃদয়ের কোমলতাকে স্পর্শ করেনি কোনো অবিশ্বাস।

শুধু তো কারাবাস নয়, সংসারেও তাঁকে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। সুস্থ করে তোলার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম সত্ত্বেও কর্টটাক্রান্ত সত্যেনকে হারাবার পরে, সংসারে অনেক একক লড়াই চালিয়ে যাবার পরেও, এক বুক ভালোবাসা ও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি এই পৃথিবীর জন্যে তাঁদের সন্তানকে তৈরি করেছিলেন। শুনেছি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে মীনাক্ষী নাকি তাঁর কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক মানসিক ধাক্কা পেয়েছিলেন। অনেক অবিচার সহ্য করে আসা শরীরে মনে সেটা হয়তো তাঁর আর সহ্য হয়নি। হয়তো স্পর্শকাতর মনের প্রতিক্রিয়ায় চাপ পড়েছে দেহের ওপরে? এত অসময়ে আমরা তাঁকে হারাবো কল্পনাও করিনি। অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল মীনাক্ষীর। ছেলে বড়ো হয়ে যাবার পরে, অবসর নিয়ে কলকাতাতে এসে, মায়ের কাছাকাছি থেকে মীনাক্ষী মনের আরামে লেখালেখি করবেন, পরিকল্পিত বইগুলো শেষ করবেন, আমাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে, এমনটাই আমরা আশা করেছিলুম। একজন শক্তিশালী লেখিকাকে বাংলা সাহিত্য এবারে পুরো সময়ের জন্য পেতে চলেছে, এটাই ভেবেছিলুম। আমরা আশায় আশায় ছিলুম, 'শুধু 'সই-মেলা'-তেই নয়, অবসর গ্রহণের পরে কলকাতায় এলে, মীনাক্ষীর উজ্জ্বল উপস্থিতি 'সই'কে নিয়মিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবে।

কিন্তু সেটা আমাদের কারুরই ভাগ্যে ছিল না। এমনকী মীনাক্ষীর সঙ্গে জয়ার, 'সই'-পরিকল্পিত কথোপকথনটিও পাওয়া গেল না। শুধু তাঁকে আমরা অন্তরের ভালোবাসায়, মন-কেমনে, শ্রদ্ধায় স্মরণ করব 'সই-মেলা'-তে। অসম্পূর্ণ যাত্রাপথ সত্ত্বেও মীনাক্ষী সেন, এই নামটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে মুছে যাবে না। এটুকুই সান্ত্বনা।

পরিবারের সবাইকে, বিশেষত জননীকে আর সন্তানকে আমাদের আন্তরিক বেদনা ও শুভৈষণা জানাই, যদিও জানি এ শূন্যতা পূর্ণ হবার নয়।

সময় যৌবনকাল। ঠিকানা পৃথিবী।

এই আমাদের তপনদা।

অনন্ত যৌবন আর অনন্ত পৃথিবী যাঁর করতলগত ছিল।

তপনদার সঙ্গে আর কোনোদিনও দেখা হবে না, ভাবতে পারছি না। ওঁরা সাগরপারের পাখি, এপার-ওপার করাই ওঁদের নিয়ম, তপনদা কলকাতায় আছেন, আর তপনদা কলকাতায় নেই, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই দুটি অবস্থার মধ্যে প্রচুর ফারাক তিনি নিজের গুণেই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ওঁকে মিস করলেই ভাবি এই তো এবারে ওঁদের আসার সময় হয়ে এল।

তপনদা ছিলেন সেই মানুষটি, যাকে ঠাকুরদা থেকে নাতি সবাই বলবে, 'আমার বন্ধু'। তপনদার পাণ্ডিত্য, তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসচর্চা চিরকালীন মর্যাদা পেয়ে বেঁচে আছে ঐতিহাসিকদের জগতে, আর তপনদার মনের মানুষী সৌন্দর্য ঝলমল করছে আমাদের, সর্বসাধারণের হৃদয়ে।

তপনদা ছিলেন ভোগী মানুষ। তাঁর কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানান ভোগের সামগ্রী থরে থরে ডালি ভরে সাজিয়ে নিবেদন করেছে। বিদ্যাকেও তিনি তাঁর ভোগের, তাঁর বিলাসের অঙ্গ করে ফেলেছিলেন, তপনদার কাছে নতুন বই একটা নতুন ব্যঞ্জনের মতো যেন একটা অজানা স্বাদের খবর আনত।

একদিন আমি কলেজ থেকে ফিরে দেখি তপনদা 'ভালো-বাসা' বাড়ির বাইরে মার্বেলের রোয়াকে বসে আছেন। আমি গাড়ি থামাতেই উঠে দাঁড়িয়ে, ব্যস্তভাবে একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ একটা অসাধারণ বই পড়ে শেষ করেছি, তোমাকে সেটাই বলব বলে বসে আছি। "লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা"। পড়েছ তুমি? না পড়লে, এই নাও। তার পরে আলোচনা করব।'

মননকে যেমন, ইন্দ্রিয়গুলিকেও তেমন প্রশ্রয় দেওয়ায় বিশ্বাস করতেন তিনি। নিত্যনতুন আবিষ্কারের উত্তেজনায় চকচক করত তাঁর দৃষ্টি। হতে পারে তা ইতিহাসের অজানা দিকে কোনো আলোকপাত, হতে পারে সুন্দরী মেয়ের মুখ ফুটপাথে এক পলক দেখা, হতে পারে নতুন রেস্তরাঁ আবিষ্কার! নতুন খাদ্য খেয়ে এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি হাসিদিকে জানাতেন এবং ঘরে হেঁশেলে একদিন সেই পদটির আবির্ভাব ঘটত। আমাদেরও ডাক পড়ত স্বাদ নিতে।

ঢাকায় গেলে ঢাকাই শাড়ি না নিয়ে আসতেন না। আমার মতো, পনির আর বাখরখানিও তাঁর ঢাকাই সওদার মধ্যে পড়ত। যেটা রান্না করে দেব, সেটা ভালোবেসে যত্ন করে খেতে, আর খেয়ে অনেকদিন ধরে মনে রাখতে তপনদার জুড়ি মেলা ভার ছিল। হাসিদির অমৃতের মতো রান্না ভালোবেসে, পছন্দসই লোকজন ডেকে খাওয়ানোতেও তপনদা ছিলেন অদ্বিতীয়। নিজে গিয়ে বাজার করে আনতে পছন্দ করতেন, বাজারের সেরা মাছের টুকরোগুলি, টাটকা

নতুন ওঠা সবজি। সকালে ফোন করে বলতেন, 'আজ রাত্তিরে খেয়ে যাও, দারুউণ একটা রান্না করছে হাসি।' কীর্তিপাশার জমিদারি মেজাজখানা তিনি নিজের মধ্যে বহন করে এনেছিলেন।

শুধু তো পণ্ডিতই ছিলেন না, সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন জীবনরসিক একজন পুরুষমানুষ। হ্যাঁ, শুধু 'মানুষ' না বলে 'পুরুষমানুষ' বললুম, কেননা সেই বিশেষ পরিচয়টি তাঁর কাছে শেষ অবধি জরুরি ছিল, যেমন ছিল কবিবন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। নিজের বয়সের পরোয়া না করে ওঁরা স্বচ্ছন্দে মেয়েদের রূপ গুণের সমাদর করে গিয়েছেন একজন পুরুষের দৃষ্টিতে। কোনো মেয়ে একটু সেজেগুজে গেলে, ঠিক বলতেন, 'তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।' জীবনের সব সুন্দরই তাঁর নজরে আসত।

তপনদারা কলকাতাতে রাত জেগে ধ্রুপদি গান শুনতে যেতেন সংগীতোৎসাহী বন্ধুরা মিলে, বিলেতে নিয়মিত যেতেন থিয়েটার দেখতে। কারো বাগানে বিশেষ কোনো ফুল ফুটেছে খবর পেলে হাসিদিকে নিয়ে যাত্রা করেন সেই পুষ্প দর্শনে। ভালো সিনেমাও দেখতেন স্বামী-স্ত্রী মিলে। শীতের দিনে ঘরে বসে, মস্ত পর্দার টেলিভিশনে ছবি দেখতেন। আমি দেশে-বিদেশে তাঁদের সঙ্গে এইসব কত অভিযানেই যে সঙ্গী হয়েছি। প্রায় বছর বছর ইংল্যান্ডে যাওয়া হত তখন, অক্সফোর্ডে গেলেই আমাকে নিয়ে হাসিদি-তপনদা বেড়াতে বেরুতেন, আজ এই গ্রামের সেই পাব-এ লাঞ্চ খাওয়া, কাল সে-গ্রামের নদীর ধারে খেতের পাশে পিকনিক। আদরের পরাকাষ্ঠা। এক সময়ে আমার জীবনে একটু অনাদর বেশি হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো দাদা-দিদিদের এত আদর জুটেছে! তপনদা আর হাসিদি ভারতবর্ষে, ও ইংল্যান্ডে যতগুলো ঠিকানাতে বাস করেছেন, প্রত্যেকটি বাড়িতে আমি কোনো-না-কোনো সময়ে ঠিক উপস্থিত হয়ে, ওঁদের আতিথ্য নিয়েছি। এটা বলে, হাসিদি তপনদা ও আমি সমান আহ্লাদ পেতুম। গোনা শুরু সেই লন্ডনের ফ্ল্যাটটি থেকে, রণজিৎ গুহ ও মার্থার পাশাপাশি তপনদা ও হাসিদি যখন থাকতেন, সেখানেই তাঁদের একমাত্র সন্তান, সুকন্যা দাঁড়াতে শিখল। ১৯৬২/৬৩ হবে? আর সেই সুকন্যার যখন কন্যা হল, কচি লীলা লক্ষ্মী, তপনদা হাসিদি কলকাতার গঙ্গাবক্ষে বজরাপার্টি করে দিনভর আনন্দউৎসব করলেন এই নাতনিকে অভ্যর্থনা জানাতে। শেষ অবধি লীলা লক্ষ্মীই হয়েছিল তপনদার ধ্রুব তারকা। তার অক্সফোর্ডের ইস্কুলে পড়তে আসার সম্ভাবনা নিয়ে তপনদার আগ্রহের অন্ত ছিল না। সেই নাতনি ভরতি হল, কাছাকাছি এল, কিন্তু তপনদা তখন আনন্দ-দুঃখের ফারাক করার বাইরে অন্যমনা হয়ে মগিয়েছেন স্ট্রোকের পর স্ট্রোকে।

গত বছর ২০১৩ গ্রীষ্মে ওঁর সঙ্গে শেষবার দেখা, প্রথমে অক্সফোর্ডে ওঁদের বাড়িতে দুজনের সঙ্গেই এবং লন্ডনে, তপনদা সেজেগুজে এসেছিলেন নন্দনা-জন-এর বিয়ের গার্ডেন পার্টিতে, সারাদিন আনন্দ করে ফিরে গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে।

তপনদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন অমর্ত্য। বালিগঞ্জের নতুন খোলা 'কোয়ালিটি' রেস্তরাঁয় যাদবপুরের করেকজন বন্ধুর সঙ্গে কফি খেতে গিয়েছি, ওঁদের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় ১৯৫৬ কি ৫৭ হবে? পাশাপাশি দুজন যারপরনাই সুপুরুষ বঙ্গসন্তান বসে ছিলেন, আমরা তো আর চোখ ফেরাতে পারি না! রূপটাই তখন চোখে পড়েছিল, গুণটা হল ক্রমপ্রকাশ্য। (কিন্তু যে যাই বল, তখন ওঁরা ছিলেন মাস্টারমশাই।)

১৯৬০ জুনে আমার বউভাতে তপনদা এলেন 'প্রতীচী' বাড়িতে, শান্তিনিকেতনে। তারপর কলকাতাতে, ওই ১৯৬০-এর জুলাই মাসে, তপনদা-হাসিদির বিয়েতে আমার মা রাধারানি দেবী উপস্থিত ছিলেন আশীর্বাদ করতে।

বাবা-মায়ের বিধবা বিবাহ হয়েছিল তিরিশ বছর আগে, কিন্তু কিমাশ্চর্যম্! তপনদা-হাসিদির বেলায় বিধবা বিবাহ তখনও আলোচনার বিষয় ছিল এই উন্নাসিক কলকাতা শহরে।

দিল্লিতে, জুলাই ১৯৬০-এ, তপনদা আর হাসিদি এবং নবনীতা ও অমর্ত্যর বউভাতের রিসেপশন একইসঙ্গে হয়েছিল আমার শ্বশুরমশাইয়ের ৯, অশোক রোডের বাড়িতে। তারপরেই আমরা চলে গেলুম বস্টনে, তপনদা, রণজিৎদারা লন্ডনে।

১৯৬১-তে হাসিদি মা হলেন ইংল্যান্ডে। আমাদের সুকন্যার সঙ্গে দেখা হল আমেরিকা থেকে ফেরার পরে। ১৯৬৩-তে অমর্ত্য সস্ত্রীক ফিরে এলেন দিল্লিতে, তপনদারাও ফিরলেন, ড. ভিকেআরডি রাও-এর দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর আমন্ত্রণে। দিল্লিতে আমরা প্রতিবেশী ছিলুম, আমাদের মেয়েরা একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড়ো হচ্ছিল। তপনদা তাঁর ছোট্ট রেনো গাড়ি করে মেয়েদের 'এক চক্কর' ঘুরিয়ে না আনা অবধি তাঁরা ওর হাত ধরে ঝুলত।

তার আগের কথায় আসি। ১৯৬২-তে আমরা গাড়ি চালিয়ে কেম্ব্রিজ থেকে ফ্রান্সের এইক্স ও প্রভন্সে এক ইকনমিক হিস্ট্রির কনফারেন্সে গিয়েছিলুম। যাবার সময়ে আমাদের গাড়িতে সওয়ার ছিলেন অমর্ত্যর বন্ধু, লন্ডন স্কুলের ডাকসাইটে প্রফেসর এরিক হবসবম। ইউরোপের ইকনমিক হিস্ট্রি নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের বইগুলো আজও খুবই জনপ্রিয়। গেলুম জার্মানি, ইতালি হয়ে। আর ফেরার পথে আমাদের গাড়িতে যাত্রাসঙ্গী হলেন তপনদা। এই দশ দিন হাসিদি গেছেন কচি সুকন্যাকে নিয়ে হল্যান্ডে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। তপনদাকে নিয়ে আমরা প্যারিসে ফিরব, আর হাসিদিরাও প্যারিসে চলে আসবেন। তপনদা সিধে চলে যাবেন বউ মেয়েকে অভ্যর্থনা জানাতে, ইস্টিশনে।

আমার পরিকল্পনা ছিল এইক্স থেকে ফেরার পথে আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সের অসাধারণ প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র, লাসকো, দেখে আসব। অমর্ত্যকে রাজি করিয়েছিলুম কিন্তু তপনদা বাদ সাধলেন। তিনি কিছুতেই লাসকো যাবেন না, তাঁর ইস্টিশনে যেতে দেরি হয়ে গেলে শিশু-কোলে হাসিদি যে বিদেশবিভুঁইতে অথই জলে পড়বেন! কিন্তু আমার জেদই জিতল, কেননা অমর্ত্যরও খুব ইচ্ছে ছিল লাসকো দেখতে যাবার। শেষ অবধি লাসকো সফরান্তে, অমর্ত্যর এক প্রাণান্তকর ড্রাইভিংয়ের কল্যাণে তপনদাকে যথাসময়ে ইস্টিশনে উপস্থিত করতে পেরেছিলুম আমরা। স্ত্রী-কন্যাকে তাঁর বুকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন অমর্ত্য। আমার ৭০-এর জন্মদিনে তপনদা এই গল্পটি বলেছিলেন রবীন্দ্রসদনের সভামঞ্চে, এই উদাহরণ দিতে, যে 'নবনীতার জেদের ফল সবসময় মন্দ হয় না। কেননা তার পরেই লাসকোর গুহাচিত্রগুলি মানুষের নিশ্বাসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে দর্শকের কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। নবনীতা সেদিন অত ঝামেলা না করলে আমার দেখাই হত না!' তপনদার এই সুখ্যাতিটুকু আজ অনেক দিন পরে মনে পড়ল।

তপনদার মুখে তাঁর জীবনের হরেকরকম গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতুম, আর ভাবতুম, আহা এত সুন্দর, সরস কাহিনি সব হারিয়ে যাচ্ছে, বাতাসে ভেসে? আমি ঝোঁক করে জেদ করে তপনদার

কাছে আবদার করতুম, 'এইসব গল্প তুমি লিখে ফেল।' দু-একটা প্রবন্ধের বাইরে বাংলা লিখতে তখন তপনদার আত্মপ্রত্যয় ছিল না, বইপত্র সবই ইংরেজিতে এবং অসংখ্য প্রবন্ধও। খুব জবরদস্তির পরে তপনদা তাঁর অযথা সংকোচ সরিয়ে রেখে বাংলায় কলম ধরলেন, লেখা হত, আর আমাকে পড়ে শোনাতেন। সেই শুরু করলেন তাঁর দ্বিতীয় জীবন।

পণ্ডিতির জীবন থেকে একটু ছুটি নিয়ে নিজস্ব একটি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ছাপার হরফে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথনের সেই আরম্ভ। ভীমরতি প্রাপ্তের পরচরিতচর্চা দিয়ে শুরু হল তাঁর বাংলা পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পত্রপত্রিকায় তাঁর রসালো প্রবন্ধ-নিবন্ধ তখনও চোখে পড়েনি। এবারে বাঁধ ভেঙে গেল, তপন রায়চৌধুরী নামে এক রসিক, বিদগ্ধ, নবীন লেখক উদিত হলেন বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে। তারপরে তো তাঁর ভক্তে ভক্তে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জোগাড়! সত্যি, এমন কৌতুক আর পাণ্ডিত্যের সপ্রেম মিলন খুব বেশি তো দেখিনি আমরা? তপনদা আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব দিয়ে, সেটাই প্রতিফলিত হত তাঁর কলমে। তাঁর মতো সুপুরুষ, স্মার্ট, ঝকঝক, বিদ্বান বঙ্গসন্তান ক-টাই বা চোখে পড়ে আমাদের? এবং বিদ্যা যে বিনয় দেয়, তপনদা তার ঝকঝকে প্রমাণ ছিলেন।

এত আড্ডা দিয়েও তিনি ত্রিশের কোঠায় বয়স না পৌঁছোতেই, ইংল্যান্ডে আর হল্যান্ডে দু-দুটো পিএইচ.ডি. করে ফেলেছিলেন ভারতের ইতিহাসের দু-রকম ধরনের গবেষণার কাজ, একটির জন্য তাঁকে ফারসি শিখতে হয়েছিল, আরেকটির জন্য ওলন্দাজি ভাষা। তিনি উর্দু আর ফারসিও জানতেন। ২১ বছর বয়সেই অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেসব কথা তপনদার নিজেরই কি মনে থাকত? আমি তো শুনেছি রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মুখে। তিনি ছিলেন তপনদার এক গভীর শুভার্থী, আর তেমনিই আড্ডাপ্রিয় রসিক মানুষ, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যা তাঁদের ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশেছিল। আরেক বিনয়ী বিদ্বান।

তপনদাদের যুগটা কি তাহলে এতদিনে ফুরিয়ে গেল? সেই একটা সময় ছিল বটে। চতুর্দিকে উজ্জ্বল মানুষগুলি ঝলমল করছেন। তপনদার বন্ধুরা, পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমর গাঙ্গুলিরা ঠিক এমনই রঙ্গরস প্রিয় পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং বন্ধুবৎসল। তাঁদের বুদ্ধি রসালো দরবারি আড্ডায় চুপ করে বসে থাকলেও মনপ্রাণ উজ্জীবিত, প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠত। মুখের আগল অবিশ্যি খুব একটা ছিল না তাঁদের, ছেলেছোকরাদের হইহই আড্ডায় যেমনটা হওয়ারই কথা! আমাদের যে লজ্জাশরমের বালাই থাকতে পারে আড্ডার উচ্ছলতায় সেটা আর তাঁদের মনে থাকত না। (ভাগ্যিস থাকত না!)

কিন্তু পাঁজির হিসেবমাফিক শেষের দিকে তাঁরা তো আর যুবক ছিলেন না, ছিলেন বৃদ্ধ। ওইজন্যেই আমি কিছুতেই পাঁজির হিসেব মানতে চাই না। সব ভুলভাল অঙ্ক শিখিয়ে দেয়। এই তো আরেক ওই বয়সের চিরতরুণ আমাদের মধ্যে এখনও আছেন, নীরেনদা, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাঁর রঙ্গরসের চরিত্র ভিন্ন গোত্রের, (তপনদার গালগল্প প্রায়ই পর্দা মানত না) কিন্তু আড্ডাবাজ, সুরসিক, স্নেহময় গুরুজন হিসেবে তিনি তুলনীয়। তাঁদেরই সমবয়সি অশোক মিত্রও খুব আড্ডা প্রিয় মানুষ, তপনদার মতোই নিজেদের স্নেহের পাত্রদের ডেকে এনে খাওয়াতে ভালোবাসেন, অন্যের রঙ্গরস খুব উপভোগ করেন, কিন্তু অশোকদা নিজে রসিকতা করে

শ্রোতাদের মজার রসদ জোগান না। উনি একনিষ্ঠ আদর্শনিবিষ্ট সিরিয়াস মানুষ। তপনদার কথা ভাবতে বসে আজ যাঁদের প্রিয় মুখগুলো মনে পড়ছে, ঈশ্বরের কাছে একান্ত কামনা করছি তাঁদের সুস্থ, কর্মময়, দীর্ঘ আয়ু হোক। আরেকজন আড্ডাবাজ, বন্ধুবৎসল পণ্ডিত মানুষ আজ রোগশয্যায়, নির্বাক, তপনদার বন্ধু, আমাদের মণিদা, মণি নাগ। অথচ, মন কেবলই বলে, না, এ-রকমটা হবার কথা ছিল না। হাসিদি-তপনদারও অক্সফোর্ডে শেষ বছরটা রোগে রোগে কারুরই মনের মতো কাটেনি। অনেকবার স্ট্রোক হবার পরে যখন তপনদা ছুটি নিলেন, নিজস্ব বসতবাটী-তে, স্ত্রী কন্যার হাতে হাত রেখে, তখন তাঁর পক্ষে সেটাই কল্যাণের হল।

তপনদা মানুষটি ছিলেন অদম্য রোমান্টিক, চিরযৌবনের পূজারি। বয়েস যতই বাড়ুক, দেহে মনে চটপটে, আকুল, অস্থির, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনো খানে— তাঁকে বার্ধক্য স্পর্শ করতে পারেনি, যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপনা থেকে অবসরপ্রাপ্তির পরেই শুরু হল তাঁর আসল বেঁচে থাকা। বুড়ো হবার বদলে নবযৌবনে মেতে উঠলেন দুজনে। এবারে দায়মুক্ত। কোথায় কোথায় না গিয়েছেন বেড়াতে দুজনে মিলে? তুষারধবল আলাস্কাতে সবান্ধব জাহাজ বিহার থেকে আফ্রিকার জঙ্গলে সাফারি, ওংকারভাট থেকে চীনের সিল্ক রুট, গ্রিনল্যান্ড থেকে গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড, ওঁদের ছুটি কাটানোর বহর দেখে আমি তো হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরি। এটা-ওটা স্যুভেনির এনে দিতেন বটে, তবুও। হাসিদি খুব সুন্দর করে ভ্রমণের বর্ণনা দিতে পারেন, অন্তরে বাহিরে। তিনি সুন্দরের পূজারি। এক সময়ে ফোটো তুলতেও আগ্রহ ছিল হাসিদির। তপনদার হাতে ক্যামেরা? কদাচ দেখিনি। ক্যামেরার মতো মেমারি ছিল তাঁর আয়ত্তে। সব মনে রাখতে পারতেন, যেটা মনে রাখতে চাইতেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়েসে তিনি কম্পিউটার চালাতে শিখলেন এবং বাংলা হরফে দু-লক্ষ না কত শব্দের আত্মজীবনী লিখে ফেললেন। তপনদার ব্রিলিয়ান্স বয়েসের সঙ্গে মলিন হয়নি। আমার মহা সৌভাগ্য এমন মানুষকে কাছ থেকে দেখেছি।

বিশ্বনাগরিক ছিলেন, কিন্তু তার বদলে তপনদা নিজেকে কলকাতার বাসিন্দে বলে ভাবতে চাইতেন। তাই তপনদার কলকাতায় থাকা আর না থাকার মধ্যে সুস্পষ্ট তফাত ঘটত আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রায়। তপনদার দেশে আসা মানে দীর্ঘায়িত উৎসবের পালা শুরু হওয়া, রোজ এ বাড়িতে ও বাড়িতে নেমন্তন্ন, আড্ডা, আজ থিয়েটার, কাল জলসা, পরশু পিকনিক।

মনে কষ্ট হচ্ছে, এত ভালো ভালো কথা তো মনের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলুম, কই, তপনদার সামনে তো এমন করে বলা হয়নি কোনোদিন? শুধু ঝগড়া-অভিমান করেছি, খেপেছি আর খেপিয়েছি। ভালোবাসি, সেটা জানতেন, কিন্তু ভক্তি করি, সেটা জানানো হয়নি। সামনাসামনি তো শুধু সমালোচনাই করেছি।

৮ মে ১৯২৬ তপনদা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই ভারতের মাটিতে। আপাতত তাঁকে সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে শীতলপ্রকোষ্ঠে। 'আন্ডারটেকার'-এর প্রযত্নে। ক্রিমেটোরিয়ামের তারিখ পেলেই, তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে সাধারণের সামনে ফিরিয়ে এনে, দাহ করা হবে। আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তাঁর শরীর ভস্ম হয়ে আবার মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, ইংল্যান্ডে। তপনদার খুব ইচ্ছে ছিল শেষ জীবনটা কলকাতাতে কাটিয়ে যাবেন, তাঁর প্রিয় কেয়াতলার বাড়িতে,

আড্ডাজীবনে, ঠাট্টা ইয়ার্কিতে, খাওনদাওনে, বক্তৃতা দিয়ে, সভাসুন্দর হয়ে। ইচ্ছে ছিল বিদায় নেবেন বন্ধু-স্বজন, পুরোনো ছাত্রছাত্রী, আর নবলব্ধ পাঠকদের মাঝখানে, রাজার মতন সম্মানে আর ভালোবাসায়।

আমরা ওঁদের আসার দিন গুনতুম।

শীত পড়লেই খুশি খুশি গলায় ঝরনা বলে, কড়াইশুঁটির কচুরি আর ফুলকপির ডালনা রেডি রাখতে হবে এবারে, তপনজেঠু আসবেন। দীর্ঘ সটান ঋজু শরীর, সোজা তিনতলায় উঠে আসতেন, নক করে, পর্দা সরিয়ে, চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক নিয়ে উঁকি দেবেন,

'কী হে, আসতে পারি?'

শেষ দোলপূর্ণিমার সকালে এমনিই পর্দা সরিয়ে তপনদা উঁকি দিয়েছিলেন, পকেটে রুমালে বাঁধা রঙিন আবিরের পুঁটলি, পরনে ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে ইতস্তত শুকনো আবিরের স্পর্শ, রুক্ষ চুল উড়ছে, এক মুখ উজ্জ্বল হাসি।

'সে কী তপনদা, তুমি হোলি খেলতে বেরিয়েছ? বোসো বোসো চা করি—'

'আরে, না না আজ চা না, নীচে ট্যাক্সি ওয়েট করছে, আর সব বাড়ি বাড়ি যেতে হবে না?'

আবিরের চেয়েও রঙিন তপনদার মুখের হাসি।

'বাড়ি বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছ নাকি তুমি? গাড়ি নেই, তো ট্যাক্সি করে? এই শরীরে? বাহ—'

'চলো চলো তুমিও যাবে চলো—'

আমি যেতে পারিনি, আমার আবিরে অ্যালার্জি। আর অমন খুশি-ধবধবে চিরযৌবনের মালকিন কি আমি?

শীত পড়েছে।

তপনদাকে খুব মিস করব। বাকি জীবনটা।

৬.১২.২০১৪

কফি খাবেন?

বসন্তের সন্ধে। স্থান শান্তিনিকেতন, আম্রকুঞ্জ। দুজন তরুণী দোল উৎসবের আগের রাত্রে বৈতালিকে হাঁটছেন। 'সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।/দখিন হাওয়া, দিশাহারা দখিন হাওয়া' গান গাইতে গাইতে বৈতালিক চলেছে। একজন দীর্ঘকায় যুবক এসে শোভাযাত্রায় মিশলেন, তরুণী দুটির সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। তরুণীরা একজন নবনীতা, অন্যজন শান্তিনিকেতনের মেয়ে, মঞ্জরী দে।

নবনীতা এই যুবকটিকে চেনেন, ইনি শান্তিনিকেতনেরই ছাত্র। কিন্তু এখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতিবিদ, আবার যাদবপুর ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি। নবনীতাও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় দাপুটে তার্কিক! সেখানে তাঁদের আলাপ হয়েছে। কিন্তু আজ সন্ধের হঠাৎ দেখা হওয়ার মধ্যে অন্য কিছু ছিল, ছিল পূর্ণ চাঁদের মায়া আর বাসন্তী উৎসবের মাধুর্য। বৈতালিকের পথ চলা শেষ হলে অমর্ত্য নবনীতাকে অনুরোধ করলেন, তাঁর এক বিদেশিনি বন্ধুর বাড়িতে জ্যাজ শুনতে এবং কফি খেতে যেতে। খানিক ইতস্তত করে নবনীতা রাজি। কফির শেষে চাঁদের আলোয় হেঁটে মঞ্জরীর বাড়ি 'চিত্রলেখা'য় নবনীতাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরদিন কলকাতা ফেরার সময় আবার দেখা, ট্রেনে, আবার। কলকাতায় স্টেশনে নেমে অমর্ত্য নবনীতাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। হিন্দুস্থান পার্কে নবনীতাকে নামিয়ে চলে যাবেন, আয়রনসাইড রোডে নিজের বাসস্থানে। সে দিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল... অন্ধকারে বৃষ্টি পড়েছিল/গাড়ির কাচে নৃত্যপর ছায়া/নদীর হাওয়া হঠাৎ ছুঁয়ে দিল/ চিত্তে কাঁপে গোপন অশনায়া... (নদীর হাওয়া, *নবনীতা দেব সেন-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা*।)

অমর্ত্যর পরবর্তী প্রস্তাব এল ফোনে। তাঁদের বন্ধু পরমেশ রায় বিদেশ থেকে একটি 'কোনা কফি' বানাবার নতুন যন্ত্র এনেছেন, সেটির উদ্‌বোধন করতে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে নবনীতার কফি-প্রীতি সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন, শান্তিনিকেতনেই। আর পরমেশ-এর কফির যন্ত্রের মর্যাদা দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল সেই সময়ে। নবনীতা সেই বিকেলে তেতলার উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, 'ভালোবাসা' বাড়িতে। দূর থেকে অমর্ত্যকে দেখা গেল হেঁটে আসছেন, বুকের ওপর লাল টুকটুকে টাই দুলছে পায়ের ছন্দে, তাঁর সেই বিখ্যাত সবুজ স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটি আনেননি। অমর্ত্য ওপরে তাকিয়ে হাসলেন। কালীধন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতে এই অপরাহ্ণের কফি-উৎসবের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি রাধারানি দেবী। পরমেশ, মৃণাল, অমর্ত্য সবাই থাকবেন, কেবল বলেছিলেন, তিনি বা মৃণাল যে কেউ যেন নবনীতাকে পৌঁছে দিয়ে যান। না মৃণাল নয়, পৌঁছে দিয়েছিলেন অর্মত্যই।

ইতিমধ্যেই অমর্ত্য ট্রিনিটিতে প্রাইজ ফেলো হয়ে ফিরে গিয়েছেন। নবনীতা এম.এ. পরীক্ষায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। অমর্ত্যর পত্র এল জানুয়ারি মাসে, একটা খামের মধ্যে ট্রিনিটি কলেজের কার্ড : 'নবনীতা ১৩ জানুয়ারি তোমার জন্মদিনে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। পরীক্ষার ফলের জন্য অভিনন্দন— অমর্ত্য।' নবনীতা শুভেচ্ছাবার্তার উত্তর দিতে গিয়ে পাতার পর পাতা নষ্ট করে ফেললেন, দুটো এয়ার মেলও। বন্ধু অমিয় দেব পরামর্শ দিলেন, এয়ার মেল-এ না লিখে আগে রাফ কাগজে জুতসই একটা বয়ান তৈরি করে ফেলতে। অবশেষে লেখা হল উত্তর, 'অনেক ধন্যবাদ।— নবনীতা।'

নবনীতা এবার পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ নিয়ে পাড়ি দেবেন। প্রথমে ইংল্যান্ড, সাত দিন পরে আমেরিকা। জাহাজঘাটা থেকে বন্ধু যশোধরা নবনীতাকে নিয়ে যাবেন। আবার তুলে দেবেন পরবর্তী জাহাজে। জাহাজ টিলবেরি পৌঁছোল, নেমেই যশোধরার সঙ্গে দেখা, লটবহর নিয়ে দুজনে ট্রেনে উঠলেন, লন্ডনে ট্রেন থামতে দেখলেন চারজন যুবক তাঁদের অপেক্ষায়— অমর্ত্য, পার্থ গুপ্ত, বরুণ দে, জাক সাসুন। একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া হল। যশোধরা সম্পর্কে অমর্ত্যর মামাতো বোন। দাদা যশোধরা ও তাঁর বান্ধবীর জন্য একটা বাসার ব্যবস্থা করেছেন কেম্ব্রিজ-এ। ওঁরা সেখানেই থাকবেন। সবাই রাজি। কেম্ব্রিজ-এর ট্রেনে যেতে যেতে ওঁরা একটা খেলায় মাতলেন, ট্রেনযাত্রার মধ্যে একটিও ইংরেজি শব্দ বলতে পারবেন না কেউ, বললেই এক পেনি জরিমানা। নবনীতার জরিমানা হল এক পেনি, একটিমাত্র ভুলের খেসারত। অমর্ত্য চ্যাম্পিয়ন, একটিও ইংরেজি না বলে।

কেম্ব্রিজে থাকাকালীন একদিন অমর্ত্য নবনীতাকে লন্ডনে নিয়ে গেলেন তখনকার অবশ্য-দর্শনীয় 'দ্য হোস্টেজ' দেখাতে। নাটকের মধ্যেই নবনীতার অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। বসে থাকতে পারছেন না, বাইরে খোলা হাওয়ায় আসতে চাইলেন, থিয়েটার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন অমর্ত্যও। পাশেই বয়ে যাচ্ছে টেমস নদী। নদীর ধারে হাওয়ায় এসে বসলেন দুজনে, অ্যানাসিনের দৌলতে মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে নবনীতার। অমর্ত্য বললেন, তিনি ঠিক করেছেন জাহাজের টিকিটটা ক্যানসেল করে দেবেন! নবনীতা হতবাক! এবারে নবনীতাকে উষ্ণ অনুরোধ জানালেন অমর্ত্য, আরও সাতদিন পরে আমেরিকা যেতে। 'যে সাতদিন জাহাজে কাটাতে, সেই সময়টুকু বরং তুমি ইংল্যান্ডে থাকো।' জাহাজ চলে গেলে কীভাবে যাবেন নবনীতা? ক্লাস তো শুরু হয়ে যাবে। কোন উড়ানে? এর পর অমর্ত্যর বিবাহপ্রস্তাব! টেলিফোনে দু-পক্ষের বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কেম্ব্রিজেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ওঁদের বাগ্‌দান উৎসব।

তার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল, গতিপথ বদল করে বয়ে গিয়েছে সময়।

অক্টোবর ২০০৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। অমর্ত্যর পত্র এল জানুয়ারি মাসে, একটা খামের মধ্যে ট্রিনিটি কলেজের কার্ড : 'নবনীতা ১৩ জানুয়ারি তোমার জন্মদিনে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। পরীক্ষার ফলের জন্য অভিনন্দন— অমর্ত্য।' নবনীতা শুভেচ্ছাবার্তার উত্তর দিতে গিয়ে পাতার পর পাতা নষ্ট করে ফেললেন, দুটো এয়ার মেলও। বন্ধু অমিয় দেব পরামর্শ দিলেন, এয়ার মেল-এ না লিখে আগে রাফ কাগজে জুতসই একটা বয়ান তৈরি করে ফেলতে। অবশেষে লেখা হল উত্তর, 'অনেক ধন্যবাদ।— নবনীতা।'

নবনীতা এবার পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ নিয়ে পাড়ি দেবেন। প্রথমে ইংল্যান্ড, সাত দিন পরে আমেরিকা। জাহাজঘাটা থেকে বন্ধু যশোধরা নবনীতাকে নিয়ে যাবেন। আবার তুলে দেবেন পরবর্তী জাহাজে। জাহাজ টিলবেরি পৌঁছোল, নেমেই যশোধরার সঙ্গে দেখা, লটবহর নিয়ে দুজনে ট্রেনে উঠলেন, লন্ডনে ট্রেন থামতে দেখলেন চারজন যুবক তাঁদের অপেক্ষায়— অমর্ত্য, পার্থ গুপ্ত, বরুণ দে, জাক সাসুন। একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া হল। যশোধরা সম্পর্কে অমর্ত্যর মামাতো বোন। দাদা যশোধরা ও তাঁর বান্ধবীর জন্য একটা বাসার ব্যবস্থা করেছেন কেম্ব্রিজ-এ। ওঁরা সেখানেই থাকবেন। সবাই রাজি। কেম্ব্রিজ-এর ট্রেনে যেতে যেতে ওঁরা একটা খেলায় মাতলেন, ট্রেনযাত্রার মধ্যে একটিও ইংরেজি শব্দ বলতে পারবেন না কেউ, বললেই এক পেনি জরিমানা। নবনীতার জরিমানা হল এক পেনি, একটিমাত্র ভুলের খেসারত। অমর্ত্য চ্যাম্পিয়ন, একটিও ইংরেজি না বলে।

কেম্ব্রিজে থাকাকালীন একদিন অমর্ত্য নবনীতাকে লন্ডনে নিয়ে গেলেন তখনকার অবশ্য-দর্শনীয় 'দ্য হোস্টেজ' দেখাতে। নাটকের মধ্যেই নবনীতার অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। বসে থাকতে পারছেন না, বাইরে খোলা হাওয়ায় আসতে চাইলেন, থিয়েটার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন অমর্ত্যও। পাশেই বয়ে যাচ্ছে টেমস নদী। নদীর ধারে হাওয়ায় এসে বসলেন দুজনে, অ্যানাসিনের দৌলতে মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে নবনীতার। অমর্ত্য বললেন, তিনি ঠিক করেছেন জাহাজের টিকিটটা ক্যানসেল করে দেবেন! নবনীতা হতবাক! এবারে নবনীতাকে উষ্ণ অনুরোধ জানালেন অমর্ত্য, আরও সাতদিন পরে আমেরিকা যেতে। 'যে সাতদিন জাহাজে কাটাতে, সেই সময়টুকু বরং তুমি ইংল্যান্ডে থাকো।' জাহাজ চলে গেলে কীভাবে যাবেন নবনীতা? ক্লাস তো শুরু হয়ে যাবে। কোন উড়ানে? এর পর অমর্ত্যর বিবাহপ্রস্তাব! টেলিফোনে দু-পক্ষের বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কেম্ব্রিজেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ওঁদের বাগ্‌দান উৎসব।

তার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল, গতিপথ বদল করে বয়ে গিয়েছে সময়।

অক্টোবর ২০০৭

সেই প্রথম ও শেষ বলরুম ড্যান্স

শ্রীঅমর্ত্যকুমার সেন? আমি আবার তাঁর বিষয়ে কী বলব? আমি কি অর্থনীতিবিদ, না দার্শনিক? পামেলা বোর্দেও নই যে চমকপ্রদ, মুখরোচক কোনো কাহিনি ফাঁদতে বসব।

হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রী ছিলুম বহুকাল, বাগ্‌দত্ত অবস্থাতেই ক্ষিতিমোহন সেন আমাকে 'আদরের নাতবউ' সম্ভাষণে চিঠি দিতেন আমেরিকাতে। শ্বশুরঘর করেছি আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতোই, শাশুড়ি ননদের স্নেহ ভালোবাসা এখনও আমাকে ঘিরে আছে। আর সেই যে আমাদের ছোট্ট দুটি মেয়ে, এখন জাঁদরেল যুবতী। তারা এখন কলকাতাতে নেই, তাই। থাকলে হয়তো এটা লিখতেই দিত না। আপনারা অনুরোধ করে আমাকে মুশকিলে ফেলেছেন। আমি যা বলব তা তো প্রাগৈতিহাসিক। আমার পরেও আরও দু-বার ভালোবেসে অমর্ত্য সংসার পেতেছেন, আরও দুটি সুন্দর, মিষ্টি সন্তানের পিতা হয়েছেন। এতদিনে হয়তো সংসারী মানুষও হয়েছেন, সে-খবর আমি তো জানি না। আমার অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন পড়াপাগল, অসংসারী তরুণ। তাঁর খুব সুন্দর সেন্স অফ হিউমার ছিল, যেটা ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে প্রধান বাঁধন। নইলে আমরা একেবারে অন্য ধরনের মানুষ কিনা?

বিদেশে একবছর বাগ্‌দত্ত থাকার পরে দেশে এসে আমাদের বিয়ে হল যখন, আমি তখন হার্ভার্ডের ছাত্রী আর উনি ট্রিনিটি কলেজের প্রাইজ ফেলো। কিন্তু একত্রে সংসার করতে উনি একবছর ছুটি নিয়ে এম.আই.টি.-তে পড়াতে এলেন। সদ্য ডক্টরেট শেষ করেছেন, সেই থিসিস বই হয়ে বেরুল 'চয়েস অফ টেকনিকস', বিয়ের পরেই। দিল্লিতে আমি আর উনি ন-নম্বর অশোক রোডের শ্বশুরবাড়িতে রাত্রি জেগে ইনডেক্স তৈরি করলুম একসঙ্গে। ওমা, 'ধন্যবাদ'-এ তো আমার নাম নেই? অমর্ত্য বললেন, 'দুর দুর, নিজের বউকে ছাপার হরফে ধন্যবাদ দেওয়াটা কেমন অ্যাবসার্ড নয়? কেমন কৃত্রিম দেখায় না?' সত্যিই তো। আমার ঠোঁটফুলুনি চলে গেল।

প্রথম সংসার পাতা হল কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসে। (আমরা যে কতবার কত জায়গায় যাযাবরের মতো ঘুরে সংসার করেছি!) অমর্ত্য খুব মানুষকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে ভালোবাসেন, আর আমার তখন রান্নায় সবে হাতে-খড়ি হচ্ছে, আমিও খাইয়ে খুব খুশি। প্রতি সপ্তাহে নেমন্তন্ন হয়। ঠিক হয়েছে একেবারে সাহেব-মেমদের মতো স্টাইলে সংসার হবে। রাঁধব-বাড়ব আমি, বাসন মাজবেন অমর্ত্য সেন। এদিকে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো মহাশয়টি তো বিলেতে রাজার হালে ছিলেন, বিছানাও তুলে দিত বেডমেকার এসে, তিনি ঘরকন্নার কিছুই পারেন না, কেবল কফিটি বানাতে জানেন। নেহাত আমার ধুলো সয় না বলে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা চালাতে শিখে ফেললেন, কিন্তু বাসন মাজাটা সমস্যা হচ্ছে।

একদিন অমর্ত্যর দুই সিনিয়র সহকর্মীকে সস্ত্রীক ডিনারে ডেকেছেন, স্যামুয়েলসন আর সোলো। আমাদের চিলেকোঠার ঘরকে যথাসাধ্য সাজিয়েছি ফুল-টুল দিয়ে— ওইটেই শুধু

টাটকা, সমস্ত আসবাবপত্র স্যালভেশন আর্মি থেকে দু-তিন ডলারে কেনা, শ্রীনিকেতনের হ্যান্ডলুম কাপড়ে ঢাকাঢুকি দেওয়া হয়েছে। খুব যত্ন করে তো অতিথিদের খেতে বসালুম। কিন্তু বসেই সোলো তাঁর কোঁকড়া মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘ দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নো, অমর্ত্য, আই কান্ট লেট দিস হ্যাপেন।' আমার তো মস্তকে বজ্রপাত! কী রে বাবা? কী করলুম? তারপর সোলো সবিনয়ে বললেন, 'যদি আজ্ঞা দাও তবে আমি অতিথিদের বসানোর বন্দোবস্তটা পালটে দিই।' বলে সোলো সবাইকে আসন থেকে তুলে এর বউকে তার বরের পাশে বসিয়ে যথাযথ পাশ্চাত্য প্রথায় সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিলেন। আমি যে ওই যত্ন করে সবকটি স্বামী-স্ত্রীকে জোড়ায় জোড়ায় পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছিলুম সেটাই নাকি কেলেঙ্কারি। অমর্ত্যর এসব চোখেও পড়ে না। আর আমি তো গাঁইয়া। কী রেঁধেছিলুম মনে নেই তবে হাসাহাসিটা প্রাণে বিঁধে আছে। কপালগুণে সোলো আর স্যামুয়েলসন দুজনেই হাসিখুশি আমুদে মানুষ, সন্ধেটা ভালোই কেটেছিল।

প্রসঙ্গত একটি গোপন কথা। আমার শ্রীহস্তের অন্ন যেসব ইকনমিস্টরা খেয়েছেন (নোবেল পুরস্কার চালু হবার ঢের আগে) তাঁরাই প্রথম দশবছর ধরে ইকনমিক্সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সোলো, স্যামুয়েলসন, অ্যারো, লিয়নটিয়েফ, কুপমানস, মীড়, হিকস আরও যে কত কর্তাব্যক্তি, যাঁদের কাজকর্ম বিষয়ে আমি কিছুই জানি না! তবে ইদানীং যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা আমার হাতের রান্না না খেয়েই নোবেল লরিয়েট হচ্ছেন। অতএব আমার 'পয়া' সংস্কারটি ভেঙে গেছে। এঁরা আমার কাছে 'নাম না জানা কোনো বনফুল' মাত্র। অর্থনীতির জগৎ থেকে আমি বহুকাল বিচ্ছিন্ন, এঁদের নামও শুনিনি।

প্রতিমাসের শেষে আমাদের হাত শূন্য হয়ে যেত, আমি স্কলারশিপে পড়ি, উনি তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। প্রত্যেক মাসেই ওঁর বন্ধু রমেশ গঙ্গোলির কাছে টাকা ধার করি। তিন মাস ধার দেবার পরে রমেশ আমাদের একটি লিখিত 'বাজেট' প্রস্তুত করে দিয়ে অমর্ত্যকে বললে, 'এইভাবে সংসার খরচ হিসেব করে করতে হয়। কী যাচ্ছেতাই ইকনমিস্ট তুমি হে? সংসার খরচের বিলিব্যবস্থাও করতে শেখনি?' রমেশ নিজে ইকনমিস্ট নয় সে অঙ্কের র‍্যাংলার। সেই বাজেট অনুযায়ী চলে আমাদের ধার তো শোধ হয়ে গেলই, উলটে দেড়শো ডলার দিয়ে একটি পুরোনো শেভ্রলে কিনে ফেলে ওয়াশিংটনে অশোকদা (মিত্র) গৌরীদি, আই জি (প্যাটল) বিবিদের ওখানে সুখময় ললিতা (চক্রবর্তী) সমেত ঘুরে এলুম।

এবারে ফাঁস করি অমর্ত্যর বলরুম নৃত্যর গোপন কথা। এম.আই.টি.-র ফ্যাকাল্টি ক্লাবের অ্যানুয়াল ডিনারে গেছি। ডিনার জ্যাকেটে অমর্ত্যকে দারুণ দেখাচ্ছে এবং আমিও খুব সেজেছি। একদল তরুণ মাস্টার দম্পতির সঙ্গে আমরা নাচঘরে ঢুকলুম। আমি কখনো নাচিনি। কিন্তু অমর্ত্য আমাকে নিয়ে ফ্লোরে নেমে পড়লেন। বেশ নাচ হল। একটু ধাক্কাধাক্কি হয়ে যাচ্ছিল অন্যদের সঙ্গে এই যা। একবার তো খোঁপা থেকে সোনার চিরুনিটা খুলেই পড়ে গেল। তখন নাচ থামিয়ে ওটা কুড়িয়ে নিতে হল। ফিরে এসে, আমি বেশ খুশিই। পরের ডান্সে ক্রিস্টিন, আমাদের বন্ধু মাইকেলের স্ত্রী, গেল অমর্ত্যর সঙ্গে নাচতে। নাচের অন্তে ক্রিস্টিন ফিরল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তখন সদ্য-ওঠা স্টিলেটো হিলের জুতো ছিল ওর পায়ে। ক্রিস্টিনের অভিযোগের অন্ত নেই। বেচারি অমর্ত্য নাকি অনবরত ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছেন, ওর দিকে মোটেই মনোযোগ দেননি,

আপন মনে উলটোপালটা নেচেছেন। যখন সবাই একদিকে ঘুরছে, অমর্ত্য তখন তার বিপরীত মুখে ঘুরেছেন, ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে ক্রিস্টিনের দমাদম ধাক্কা লেগেছে। ক্রিস্টিন বেচারি খুব ডেলিকেট ধরনের, আর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বদমেজাজি মেয়ে। মাইকেলের আর অমর্ত্যর তাকে শান্ত করতে প্রচুর পরিশ্রম হল। সেই আমাদের প্রথম ও শেষ বলরুম ডান্সিং। এতদিনে অমর্ত্যর এ বিষয়ে উন্নতি হয়েছে কি না, আমি খবর পাইনি। আমার তো হয়নি।

অমর্ত্য সেনের বাসন মাজা নিয়ে শুরু করেছিলুম, সেটা দিয়েই শেষ করি। আমাদের ফ্ল্যাটে একটা কাচের ডিনার সেট ছিল। কর্মতৎপর হয়ে অমর্ত্য মাত্র দেড় হপ্তার মধ্যেই নব্বুই ভাগ কাচের বাসন মাজতে গিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেললেন। মহতী বিনষ্টি! বলতেই হল, 'থাক বাবা, তোমার আর বাসন মেজে কাজ নেই!' (সামনের বাড়িতে সুখময় চক্রবর্তীও মাজেন না, সে-খবর অমর্ত্যর অজানা নয়!) কিন্তু ডোরা (ঢাকার ইকনমিস্ট আনিসুর রহমানের স্ত্রী) বললে, 'তুইও যেমন! শুনিস কেন? ওসব বাসন ভাঙা অমর্ত্যর দুষ্টুমি। দাঁড়া, ওর বাসন না-মাজার ফন্দি আমি বের করছি!' পরের দিনই ডোরা বস্টন থেকে একটা নন-ব্রেকেবল ডিনার সেট কিনে আনলে। মেলম্যাকের তৈরি, দু-বছরের গ্যারান্টি। ফাটলে কি চটা উঠলেও বদলে দেবে। অমর্ত্য বেচারির আর বাসন না মেজে উপায় নেই!

দু-বছরের গ্যারান্টির বাসন-কোসনগুলো এখনও দিব্যি চলছে। বিয়ের গ্যারান্টিটা ছিল অবশ্য জীবনভরের। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। এই বিচ্ছেদেও নিশ্চয়ই তাঁরই কল্যাণহস্ত আছে।

১৪ জানুয়ারি ১৯৯০

অমর্ত্যর নোবেল

সাফল্য ব্যক্তিমানুষকে গিলে ফেলে, কিন্তু অমর্ত্য চির অম্লান থাকুক
অমর্ত্য সম্পর্কে যা মনে এল

সম্পাদক মশাই তো বলেই খালাস, লেখো, লেখো, লেখো, কিন্তু লেখা কি সহজ? অর্থনীতিবিদ নই, দার্শনিক নই, ওঁর মা-বোন-বউ-বাচ্চা, কিছু নই— লিখি কবিতা, পড়াই সাহিত্য। অর্থনীতির নোবেল লরিয়েটের বিষয়ে মুখ খোলবার অধিকার কি আমার থাকতে পারে? এমনকি আমি মোনিকা লুইন্‌স্কিও নই যে দুটো রসালো গপ্পো দিতে পারবো। উপরন্তু বিবাহবিচ্ছিন্ন বউ হয়ে আমার হয়েছে শাঁখের করাত। আহ্লাদটা প্রকাশ করলে আপনারা বলবেন— 'আহা, আদিখ্যেতা দ্যাখো না!' আর চুপ করে থাকলে বলবেন— 'দেখলি তো, মনের দুঃখে বনে গেছে।'

হবি তো হ, বনেই প্রায় গিয়েছিলুম চলে, ১৪ অক্টোবর ভোরবেলাতে 'ভ্রমণ' পত্রিকার নেমন্তন্নে গাদিয়াড়া। আর ঠিক সেই দিনখানাতেই কিনা— হা কপাল!

গাদিয়াড়াতে সেদিন দিনভর লোডশেডিং আর বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। সন্ধেবেলায় মোমের আলোয় আমরা ভূতের গল্প বলাবলি করছি, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। টিভিটা চলে কিনা দেখি তো! খুলতেই,— ঝিরঝিরে অনৈসর্গিক পর্দা আলো করে ফুটে উঠলেন শ্রীমতী অমিতা সেন। ইনসেটে অস্পষ্ট তাঁর পুত্রের হাসিমুখ। শব্দ নেই। আমি লাফিয়ে উঠেছি— 'দিদিভা— ই! উনি পেয়ে গেছেন!' টিভির ঘর্ঘর শ্রুতিবোধ্য নয়, অথচ ঘরের চারজন বাঙালির বুঝতে দেরি হল না, কে পেয়ে গেছেন। 'অ-ব-শে-ষে!' চিৎকৃত কোরাসে উছলে পড়ল উল্লাস। ফুসফুসে আর খুশির বাতাস আঁটছে না। এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে। তাই এতে চমক নেই, কিন্তু প্রতীক্ষাশেষের শান্তি আছে। আশাপূরণের আহ্লাদ আছে। ইচ্ছাপূরণই বা বলব না কেন? কে না চায় ঘরের ছেলেটা একখানা নোবেল প্রাইজ ঘরে আনুক, আর কেই বা না চাইবে তার ছানাপোনাদের একটা করে নোবেল লরিয়েট বাবা থাকুন? সেই মুহূর্তে পিকো টুম্পার জন্য খুব মন কেমন করল।

কী আর করা! ললাটে লেখা ছিল, পথে পথে চিৎকার করে হকারদের সান্ধ্য পত্রিকা বিক্রি করা শুনতে পাব না। কলকাতার উত্তাল আহ্লাদ দেখতে পাব না, বাংলা আর ভারতের এই চরম উল্লাস, উত্তেজনার মোহন মুহূর্তটা আমার জীবন থেকে কাঁচি দিয়ে কাটা থাকবে। ১৪ অক্টোবরটা ছিল কলকাতার মানুষের নিজস্ব দিন।

আর শান্তিনিকেতনের।

—'রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা?'

সেই অঝোরঝরণ সন্ধেবেলায় ভাগীরথী আর রূপনারাণের তীরে, আলো-আঁধারির মধ্যে আবার মনে ভেসে উঠলো এই পুরোনো পঙ্‌ক্তি দুটো।

১৯৫৯-এর আগস্ট মাসের এক মধ্যরাত্রে আমার আশৈশবের বন্ধু, আর অমর্ত্যর সম্পর্কিত বোন, যশেধারা (এখন বাগচী) আমাদের মুখে অপ্রত্যাশিত এক সুখবর শুনে এই লাইন দুটো বলে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কেমব্রিজের সেই দিনটাও ছিল সুন্দর অবিকল রূপকথার মতো, অমর্ত্যর জীবন একটা মোড় ঘুরেছিল সেদিন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনটাও।

কিন্তু ১৯৯৮-র অক্টোবরের এই দিনটি আরও সুন্দর। এই রূপকথা মুছে যাবার নয়। অমর্ত্যর তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই প্রায়-বিস্মৃত পোড়োবাড়ির মতো সভ্যতার ছায়াচ্ছন্ন মুখটি আজ আরেকবার আলোর দিকে মোড় নিল। পোখরানের ছাইমাখা কালো চেহারাটাই যে ভারতীয় মননচর্চার একমাত্র রূপ নয়, বিশ্বের মানুষের সেটা আরেকবার স্মরণে এল। ভারতেরও। অমর্ত্যর কাজটা মানুষেরই অযত্নে ঘটানো মানুষের মৃত্যুর বিরুদ্ধে চেতনাসঞ্চার করছে। অমর্ত্যর কাজে পোখরানের বিপরীত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। ওটা যদি হয় মরণকাঠি, এটা হল জীয়নকাঠি।

আমি অর্থনীতিতে গোমুখ্যু মানুষ। ওঁর বইয়ের নামগুলো থেকেই এটুকু বোঝা যায়। ক্রমশ উনি এগিয়ে যাচ্ছেন অর্থনীতিকে কাগজ কলমের অঙ্ক আর হিসেবের যন্ত্র থেকে মুক্ত ক'রে জ্যান্ত করে দেবার দিকে। আগে ওঁর লেখা কিছুই বুঝতে পারতুম না। এখন দেখছি তার গায়ে রক্তমাংস লেগেছে, নাকে নিশ্বাস বইছে, আর চোখেও চামড়া লেগেছে। এখন সেটা আমার মতো প্রশিক্ষণবিহীন মানুষকে তত ভয় দেখায় না। অমর্ত্যর বৃত্ত ক্রমশ বড়ো হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, অনেকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ যে কেবলই আত্মসর্বস্ব প্রাণী নয়, আত্মোন্নতির বাইরেও তার চেতনা আছে, নীতিবোধ আছে, অন্যের জন্যে ভাবনা আছে, ভালোমন্দের জ্ঞান আছে— এইসব কিছু মিলিয়ে, সব কিছুর খেয়াল রেখে চললে, তবেই অর্থনীতি মানুষের কল্যাণ করতে পারবে— মোটামুটি এটুকুই আমি বুঝতে পেরেছি, অমর্ত্যর জনকল্যাণের অর্থনীতির মূল ধারণা হিসেবে। সব মানুষের জীবনকে যা উন্নত করবে না, সেই অর্থনীতির দিকে অমর্ত্যর মন নেই।

যে পাণ্ডিত্যে শুধুই মেধার ঝলসানি, যাতে হৃদয়ের ছায়া পড়ে না, কেবল বিদ্যে ফলানোর জন্যই যে কঠোর শাণিত মস্তিষ্কচর্চা, জীবনে তার দাম অল্পই। বিশুদ্ধ পণ্ডিতিপনার এই দুর্বল অহঙ্কার উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে, মানবকল্যাই তো হওয়া উচিত সকল বিদ্যার লক্ষ্য। আমাদের যাবতীয় মননচর্চা তো জগতের মঙ্গলের জন্যই উদ্দিষ্ট হবার কথা।

এটাই জগৎকে নতুন করে মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে। পৃথিবী ক্রমশ ছোট্ট হয়ে এসেছে— ঠিকই— কিন্তু এখন আমাদের এই গ্রহটি যেন মহাশূন্যে ডুবন্ত একটা টাইটানিক। ফুটো হয়ে গেছে, মৃত্যু ঢুকছে চতুর্দিক থেকে— আমাদের মননচর্চার এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই ডুবে যাওয়া কী করে আটকানো যায়।

অমর্ত্য কাজের মাধ্যমে হয়তো এটাই বলতে চেয়েছেন— একটা দুটো লাইফবোট গড়তে চেয়েছেন।

যদিও আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, আমি তো ইস্কুল-কলেজে অর্থনীতি পড়িনি, অমর্ত্যর সঙ্গে যতকাল সংসার করেছি, তখনও কিছু শিখিনি। অর্থনীতিবিদদের পারস্পরিক আলোচনা আমার কাছ সান্ধ্য ভাষার মতো শোনাত। তাঁদের নিজস্ব টার্ম ছিল, জার্গন ছিল। কানে শুনে প্রবেশ করা যেত না। আঙ্কিক ভাষাতেই ছিল অর্থনীতির কৌলীন্য।

অমর্ত্যর প্রথম বই 'চয়েস অব টেকনিকস' (১৯৬০), ওঁর পি.এইচ.ডি. থিসিস, মা-বাবাকে

উৎসর্গ করা। তার ইনডেক্স তৈরি করছি যখন দু'জনে মিলে রোজ রাত জেগে বিছানায়— বইটি তখনও প্রেসে— দু' সপ্তাহ হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমরা দিল্লিতে ৯, অশোক রোডের শ্বশুরবাড়িতে রয়েছি। ওই বইয়ে একটা 'ছবির' ক্যাপশন ছিল। 'আ সিম্পল মডেল!' ওরে ব্বাপরে, আমি শিউরে উঠেছিলুম— এই যদি হয় সিম্পল, তা হলে complex model কী রকম হবে? এবং ইকনমিক্সের ভাষা বোঝার আশা তখনই জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিন বদলায় মানুষ বদলায়, ভাষাও বদলায়। অথচ সেই তখনই কিন্তু 'চয়েস অব টেকনিকস' বইয়ের বিষয়ে প্রশংসা করে বন্ধুরা বলত, বইটি নাকি খুব সহজ ভাষাতে লেখা। অতীব বোধগম্য বইয়ের বক্তব্যের মতোই তার ভাষাও নাকি বইটিকে মূল্যবান করেছে। হবে হয়তো। আমি অত বুঝিনি। সেটা ১৯৬০, আমি ছাত্রী হার্ভার্ডে, অমর্ত্য এম.আই.টি.তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর। সুখময়ও সেখানে। টি.এন. কৃষ্ণান, অর্জুন সেনগুপ্ত, এঁরা ওখানে পি.এইচ.ডি. করছেন। ড. অশোক মিত্র, ড. আইজি. প্যাটেল, এঁরা ওয়াশিংটনে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এই জাতীয় সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। আমি পড়ছি হ্যারি লেভিন, অ্যালবার্ট বি. লর্ড, আই. এ রিচার্ড ইত্যাদি কিংবদন্তিপ্রতিম অধ্যাপকদের কাছে। কবি অমিয় চক্রবর্তী তখন বস্টনে তুলমামূলক রিলিজিয়ান পড়ান।

একদিন মহা উৎসাহে আমরা সস্ত্রীক সোলো আর স্যামুয়েলসনকে ডিনার খেতে ডেকেছি। আমি সদ্য ঘরকন্না, রান্নাবান্না শিখছি। আদবকায়দা কিছুই জানি না। আমাদের সে সরু চিলেকোঠাতে দুটো ঘর, একটি শোবার একটা বসার, তারই একদিকে কিচেনেট। সরু লম্বা একটা টেবিল। তাতেই পড়া, তাতেই খাওয়া। খেতে বসেই সোলো তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'উঁহু এ চলবে না।' আমরা সন্ত্রস্ত। কী আবার হল? সোলো হেসে উঠলেন। আমি পাশাপাশি সুন্দর করে জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রীদের বসিয়েছি। সোলো— 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে এ বারে বিলিতি কায়দায় এর বউকে তার পাশে বসিয়ে আমার সুব্যবস্থাটা ঘোঁট পাকিয়ে দিলেন। আমুদে মানুষ, সোলো স্যামুয়েলসন দু'জনেই।

ওই সময়েই ১৯৬১তে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে আমরা নিউ ইয়র্কে যাই। তখন বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুও নিউ ইয়র্ক ছিলেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী অন্যতম প্রধান। আমাদের মতোই শিকাগোর এভানস্টন থেকে নরেশ গুহ সপরিবারে এসেছিলেন। যে মার্কিনি মহাকবিকে প্রধান বক্তা করে আনা হয়েছিল তিনি মঞ্চে এসে বললেন, টেগোরের নাম শুনেছেন বটে কিন্তু কবিতা পড়েননি। তাই তিনি তাঁর নিজের কবিতাই শোনালেন। তাই হল এঁরই বিখ্যাত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নেহরুর মৃত্যুর পরে তাঁর টেবিলে মিলেছিল।

বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে বলি, ১৯৬৪তে আমরা যখন শিকাগো যাই, এ.কে. রামানুজন আর মলির কাছে, এবং সেই হার্ভার্ডের যুগের আমাদের তরুণ বন্ধু দম্পতি সুজান ও লয়েড রুডলাফের কাছে, তখন অর্মত্য আর আমি ব্লুমিংটন ইলিনয়ে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুর কাছেও গিয়েছিলাম। আবার বুদ্ধদেব বসুও বার্কলেতে আমাদের বাড়িতে এসে কয়েকটি আনন্দোজ্জ্বল দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন বার্কলেতে ক্লাসিকসে এবং কম্প্যারেটিভ লিটারেচারে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো। সেই প্রথম গ্রিক শিখছি। LSE থেকে সেখানে সদ্য এসেছেন সপুত্রক, সস্ত্রীক অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জি এবং D.S.E. থেকে অমর্ত্য সেন, অর্থনীতির অধ্যাপনা করতে। আমরা দশ মাসের জন্য আমাদের প্রথম সন্তানটিকে দেশে রেখে গিয়েছিলাম। তার জন্যে সব সময়েই আমার বুকে মোচড় দিত।

পিকোলোর হাঁটতে শেখা আমার দেখা হয়নি, এ দুঃখু ভোলার নয়। বার্কলের সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটে এসেছিলেন অনেকেই, তরুণ বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর এসেছিলেন, এসেছিলেন আমার ছাত্রজীবনের বয়সে বড় বন্ধু কবি এ.কে. রামানুজন— যে বন্ধুত্ব আমৃত্যু বজায় ছিল। আমার প্রিয় অধ্যাপক। কবি বুদ্ধদেব বসুও বার্কলেতে এসেছিলেন এবং আমি তাঁকে লুচি বেগুনভাজা জলখাবার করে সঙ্গে দেওয়ায় প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মার্কিন ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৪-৬৫-র বার্কলে অবিস্মরণীয়। সেই শুরু হল প্রতিবাদের নতুন পন্থা, অহিংস সত্যাগ্রহ, ভিয়েতনাম বিরোধী ছাত্র অধ্যাপকদের teach-in-sit-in ইত্যাদি। এলো ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট— যার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়লুম। বেটিনা আপটেকর, মারিও সাভিও, জেরি রুবিন, ছাত্রনেতারা সকলেই আমার বন্ধু হয়ে গেল। জেরি হঠাৎ একবার আমার কলকাতার বাড়িতেও আবির্ভূত হয়েছিল। অনেক বছর বাদে।

অমর্ত্য সেই সময়টা যেন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করে চলেছিলেন। অসাধ্য সাধনের তপস্যায় অন্যমনস্কভাবে সন্নিবদ্ধ। জেমস বল্ডউইন বক্তৃতা দেবেন সানফ্রান্সিসকোয়, আমি একাই শুনতে গেলুম। কিন্তু জোন বায়েজের কনসার্টে অমর্ত্যও সঙ্গে গিয়েছিলেন।

জোন বায়েজকে আমরা যে একসঙ্গে আবিষ্কার করেছিলুম, হঠাৎই, ১৯৬০-এ গ্রিনিচ ভিলেজের ছোটো একটা বেসমেন্ট রেস্তরাঁয়। সবুজ স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ পরা কালো এলোচুল এক প্রায় কিশোরী আশ্চর্য গলায় সেখানে গান গাইছিলেন— 'হাশ মাই বেবি, ডোন্ট ইউ ক্রাই...।' নাম জিজ্ঞেস করে জানলাম জোন বায়েজ। ১৯৬৪-তে তাঁর নামে ছাত্রছাত্রীরা পাগল।

সেই জোন বায়েজ বিরাট একটা টিকিট বিক্রি করে কনসার্ট দেবার দু'দিন পরেই, আমাদের সঙ্গে এসে সারারাত গান গেয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মনোবল জুগিয়ে গেলেন স্বেচ্ছায়।

এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, সারা রাত্রি ছাত্রছাত্রীদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং অধিকার করে বসে আছি— শত শত ছাত্রছাত্রী। আমরা গান গাইছি— 'উই শ্যাল ওভারকাম' গাইছি 'কিপ ইওর আইজ অন দ্য প্রাইজ, হোলড্ অন...' আমাদের গানে নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি এলোচুল মেয়ে, হাতে গিটার— তার নাম জোন বায়েজ। সে ছাত্রী নয়, তবু এসেছে। সারারাত্রি চলল এই জেহাদ— যতক্ষণ না পুলিশ এল, ৮০৪ জনকে মারতে মারতে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল— তার আগেই মারিও লাউডস্পিকারে নির্দেশ দিল: 'বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা চলে যাও, তোমরা গ্রেফতার হয়ো না, ডিপোর্টেড হয়ে যাবে, এদেশে আর আসতে ভিসা দেবে না—' আমরা কয়েকজনই মাত্র বেরিয়ে এলুম। বিদেশি বেশি ছিলুম না সেদিন, তার মানে? মারিও আবার বলল— 'তোমরা পুলিশকে হাতে পায়ে বাধা দেবে না, আমরা অহিংস, মনে থাকে যেন, শুধু শুধু পড়বে— ওরা আমাদের সিঁড়ি দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে যাক—'

শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়লেন পরদিন, যখন ৮০৪ ছাত্রের গ্রেফতারের খবর পেলেন। জন সার্ল-এর বক্তৃতা আমার মনে অছে। সার্লের সঙ্গে অমর্ত্যর বন্ধুতা ওখানেই। বার্কলের সেই একটা বছরে উনি যত অল্প সময়ে যত বেশি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, এর আগে তা পাননি। এতখানি একাগ্রতা নিয়ে কাজ করে উনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। যা অর্থনীতির জগতে সাড়া তুলেছিল। ১৯৬৬ থেকেই সে সব প্রবন্ধ বেরুতে শুরু করে।

তারই মধ্যে আমরা বেড়াতে গেছি। শিকাগো থেকে ফিরছিলাম বিখ্যাত 'ক্যালিফোর্নিয়া জেফির' ট্রেনে। যার ছাদে কাচের কামরা থেকে পথের দৃশ্য দেখবার জন্যে। সেই বছরেই ঘটল আরেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের ট্রেন ফেদার-রিভার ক্যানিয়নে তুষারবন্দি হয়ে পড়ল। সেতুর সামনে পিছনে বিপুলবপু রেড উড ট্রি ভেঙে উলটে পড়েছে, রক্তের মতো লালমাটির স্রোত ছুটেছে নীচে, ট্রেন ন যযৌ ন তস্থৌ।

আস্তে আস্তে জল ফুরল, খাদ্য ফুরল, বাচ্চাদের দুধ ফুরল, আলো নিভল হিটিং গেল, শিশুরা কেঁদে উঠল, বড়োরা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

অবশেষে উদ্ধারকারী বাস এসে আমাদের উদ্ধার করল। সেও এক কাণ্ড, বাসপথও বরফে বন্ধ, বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে পথ চলা। তিনবার তিনটে শহরে থামা হল। খাদ্য চাই, টয়লেট চাই। প্রতিবারই অমর্ত্য ছুটে ছুটে বার্কলেতে ডিপার্টমেন্টে ফোন করেন, কাজে যোগ দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে!

—'স্যার, আমরা ''রিনো''তে আটকে পড়েছি,' রিনোর সুনাম নেই। জুয়া এবং নেভাডা ডিভোর্সের জন্য কুখ্যাত ঠাঁই।

—'স্যার, আমরা ''লাস ভেগাসে'' আটকা আপাতত—' কে না জানে এ শহরে জুয়ার আড্ডা ছাড়া কিছু নেই।

তারপর রাত্রিবাস— 'লেক টাহো'তে। সেও জুয়ার শহর। তবে সেখানে পাহাড়ে ঘেরা অপূর্ব লেক টাহো আছে। অমর্ত্য প্রত্যেকবার লজ্জায় ম্রিয়মাণ— 'ওরা নিশ্চয় ভাবছে আমি জুয়াটুয়া খেলে ফুর্তি করছি বলে যেতে দেরি করছি— এরা জায়গাগুলোও বেছেছে বটে!'

শেষপর্যন্ত বাস স্ট্যান্ডে নেমে দেখি অবাক কাণ্ড! আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রন আর ফারেন এসেছে গাড়ি নিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে।

—'তোমরা কেমন করে জানলে আমার এখানে, এখনই আসছি?'

—'সারা আমেরিকাই তোমাদের গতিবিধি জানে। ক্যালিফোর্নিয়ার জেফির বরফঝড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে— রেডিও খবর দিচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।' যাক অমর্ত্যর বদনামের ভয়টা কাটল।

সেই সময়টা খুব সৃষ্টিশীল ছিলেন অমর্ত্য। শুধু তো প্রতিভাই যথেষ্ট নয়, চাই শ্রম, চাই অনন্য মনঃসংযোগ— এও একরকমের মেধা বৈকি। এমন অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারাও দেবদত্ত ক্ষমতা। দূর থেকে ওঁর কাজ-করা দেখলেই তো আমার কোমর ব্যথা করতে থাকে! এজন্য ওঁকে ঈর্ষাই করতে পারি, অনুসরণ করতে পারব না।

জানি ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার না করা, তাঁর করুণকে অবহেলার সমান। আমার মতো অলস মানুষরা যে কুকাজটি সর্বদাই করছে। সময়ের অপচয়, করুণার অপচয়। অমর্ত্য কদাচ তা করেন না। কোনো অজুহাতেই তিনি আলস্যকে প্রশ্রয় দেন না। কাজকে ফাঁকি দেন না। নিজেকে চাবুক মেরে ছোটান। এরই নাম সাধনা।

'পুরস্কার' তো কোনো 'সাধনা'র লক্ষ্য হতে পারে না? জনকল্যাণের অর্থনীতির তত্ত্বনির্দেশ একটা পন্থামাত্র। এই পন্থা ধরে যখন কাজ হবে, বুভুক্ষু থাকবে না কেউ, অসাম্য থাকবে না সংসারে, একশো মিলিয়ন নিরুদ্দিষ্ট নারীকে আর হারিয়ে যেতে হবে না সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে, তখনই তো প্রকৃত সাধনায় সিদ্ধি।

পুরস্কারের তা বলে গুরুত্ব কম নয়। এই পুরস্কারের গুণে হয়তো আরও অনেক মানুষ এখন

এই তত্ত্বে আগ্রহী হবেন, আরও ঝুরি নামবে এই মহীরুহ থেকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে। বিশ্বচেতনা নতুন করে ভাবতে বসবে গরিব দেশের সমস্যা নিয়ে। গরিব দেশের অর্থনীতির নৈতিকতা নিয়ে। এখানেই অমর্ত্যর মূল জিত হবে। 'এই পুরস্কার গরিব মানুষের কাজে লাগাবে' ১৪ তারিখে গাদিয়াড়া থেকেই ফোনে 'আজকাল' কাগজকে আমি বলেছিলুম। পরে দেখি অমর্ত্য নিজেও এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

ওই দিনের 'আজকাল'-এ পাশাপাশি অমর্ত্যর মায়ের এবং আমার দুটি 'প্রতিক্রিয়া' (১৫ অক্টোবর) বেরিয়েছিল। তাতে আমি বলেছি, '৭০-'৭১ সাল থেকেই আমরা এই খবর আশা করেছিলুম। অমর্ত্যর মা-ও বলেছেন— 'আসলে আরও আগেই আমার ছেলের নোবেল পাওয়ার কথা। ১৯৭১ থেকেই ওর নাম উঠেছে।' ওঁর বাবাও মৃত্যুশয্যায় ওর নোবেল পাওয়ার আশা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুও ওই ১৯৭১, মার্চে। তা হলে অনেক আগেই অমর্ত্যর কাজে দেখা গিয়েছিল সেই বিশেষ প্রতিভার চিহ্ন, সেই দৈব বিভা ফুটেছিল তাঁর কলমে। যে জন্যে সেই ৩৮ বছরের যুবকের নোবেল সম্ভাবনা বারবার বাতাসে রটেছে এবং ভেসেও থেকেছে, উড়ে যায়নি। এই তো সেদিনই (বছর তিন-চার আগেই?) নিউ ইয়র্ক টাইমসে বিস্তৃত লেখালেখি হল, সেই বছরে নাকি অমর্ত্যের নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা। এ প্রাপ্তি অপ্রত্যাশিত নয়। এতে চমক নেই।

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, সামাজিক অসাম্য, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য— এসব জিনিস নিয়ে গত ১৫ বছরে অমর্ত্যের প্রচুর কাজ। ১৯৮৩-তে অন্তরা-নন্দনাকে উৎসর্গ করা 'অসাম্য' বিষয়ক বইয়ের উৎসর্গপত্রে তাঁর বাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আশা উৎকীর্ণ আছে। ১৯৭০-এ বেরিয়েছিল Collective Choice and Social Welfare— শুনেছিলুম সেই বই নাকি Welfare economics-এর ক্ষেত্রে নতুন দিগ্‌দর্শন ঘটিয়েছিল। কেনেথ অ্যারোর 'অসম্ভবের তত্ত্ব' যখন জনকল্যাণাকাঙ্ক্ষী অর্থনীতিকে রুদ্ধদুয়ার কুঠুরি বলে মনে করেছে যেখান থেকে বেরুবার পথ নেই— তখনই অমর্ত্যর এই কালেক্টিভ চয়েসের তত্ত্ব জনকল্যাণের দিকে অনেকগুলি দরজা-জানলা খুলে দিয়েছিল (এই বইটি কোনো এক নবনীতাকে উৎসর্গ করা) সেই থেকে জনকল্যাণের অর্থনীতিতে নতুন বাতাস বইতে শুরু করে। নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, নতুন উৎসাহ জন্মায়। যা এখনও বয়ে চলেছে। ১৯৭১ থেকে যে-গুজব উঠেছিল, সেটা অনেকটা সেই নতুন প্রাণের জোয়ারে। কিন্তু নোবেল কমিটি অবধি তার ঢেউ গিয়ে লাগতে লাগতে সাতাশ বছর কেটে গেল।

মনে পড়ে ষাটের দশকে অর্মত্যর অনেকগুলি সাড়া-জাগানো প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। একটির নাম মনে পড়ে, সেটি উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল 'হিউম্যান ল' অ্যান্ড হেয়ারস্ রুল'। ওই সময়ে কোয়ার্টারলি জর্নাল অব ইকনমিক্সে ওঁর একটি প্রবন্ধ বেরোয়। সেটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। তাতে প্রিজনার্স ডিলেমা নিয়ে অনেক তত্ত্ব ছিল ('Isolatiohn and Assurance'??) ওটা দিয়ে অনেকদিন খেটেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'প্রিজনার্স ডিলেমার সমস্যাটা কী?' যত্ন করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অমর্ত্য যেমন শেখাতে ওস্তাদ, তেমনি শিখতেও। দারুণ জেদী যে!

যখন ১৯৬০-এ এম.আই.টি.-তে পড়াতে গেলেন, আমেরিকাতে তখন ইকনোমেটরিকস খুব ফ্যাশনেবল। তা ছাড়া এম.আই.টি.-তে সবাই অঙ্কের পণ্ডিত। আমেরিকার অর্থনীতির জগতে, তখন যা বুঝলুম, জটিল গণিতের ভাষায় কথা না বললে তোমার অর্থনীতি কলকে পাবে না।

অমর্ত্য কেমব্রিজের ছাত্র, দেশে যথেষ্টই ভালো অঙ্ক করেছেন, কিন্তু আমেরিকার অঙ্ক তখন অন্য জাতের। অমর্ত্য ইংল্যান্ডে সদ্য পি.এইচ.ডি. শেষ করেছেন, তাতে অত মার্কিনি অঙ্কবিদ্যে তাঁর দরকার হয়নি।

M.I.T. থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেই কেমব্রিজে, লেকচারার মশাই অঙ্কের ক্লাসে যেতে শুরু করলেন। ভোরে উঠে যেতে হয়, অঙ্কের যে-সব ক্লাসে উনি যেতে চান সেগুলো ন-টায় বসে। অমর্ত্য রাতজাগা পাখি, (আমিও!) ভোরে উঠতে ওঁর কষ্ট হয়। তবু কষ্ট করে উঠে নিয়মিত ক্লাস করলেন যতদিন না ওঁর মনে হল যথেষ্ট বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত একদিন ইকনোমেটরিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বশিক্ষিত অঙ্কের জন্য পণ্ডিতদের কাছে সম্মান পেলেও, ওই ধরনের কাজ থেকে তাঁর মন ফিরে এসেছে সহজবোধ্যতার দিকে।

অমর্ত্যর যে এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকেন্দ্রিক অর্থনীতি, এর জন্যে তাঁর দর্শনশিক্ষা অনেকটা দায়ী। ভারতীয় দর্শন তাঁকে বাল্য-কৈশোরে দাদু শিখিয়েছেন, তার পরে আধুনিক দর্শনশাস্ত্র অমর্ত্য স্বশিক্ষিত। ষাটের দশকে Rawls-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি দর্শন বিষয়ে কাজ করছিলেন। একবার Garry Runciman-এর সঙ্গেও একটা দর্শন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। শেষ করেছিলেন কিনা মনে নেই।

তবে দর্শনশাস্ত্রে তাঁর স্বীকৃতি এল যখন দর্শনের উন্নাসিক পত্রিকা Mind-এ তাঁর একটি প্রবন্ধ বেরুল। ষাটের দশকের মধ্যভাগেই বোধহয় কি শেষ দিকে? তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না। আমাকে বইটা এনে হাতে দিলেন। বোধহয় অরেঞ্জ মলাট ছিল? তখন ওঁর মুখে সাফল্যের সেই উজ্জ্বল হাসা হাসিটি নোবেল প্রাপ্তির খোলা হাসির চেয়েও মূল্যবান। ওই কাছাকাছি সময়েই জোন যখন অবশেষে প্রফেসর এবং কেমব্রিজের কিংস কলেজের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন— তখন আমাকে একদিন ডিনার খাইয়েছিলেন তাঁর হাইটেবিলে। রিচার্ড কান-ও ছিলেন সেখানে। জোনের বন্ধু, অমর্ত্যর তিনিও এক মাস্টারমশাই। ওই দিনই সমালোচক ফ্র্যাঙ্ক কারমোডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

প্রসঙ্গত একটা গল্প মনে পড়ল। কান ও জোনের মধ্যে ভালোবাসা ছিল। সকলেই জানত! কিন্তু যে কথাটা ওঁরা বোধহয় জানতেন না। তখন আমরা প্রায়ই প্যারিস যেতুম, আমাকে বিবলিওতেক নাসিওনালে গবেষণার জন্য কাজ করতে হত। আর দু'জনেরই খুব প্যারিসের কাফেতে বসে রাস্তা দেখতে ভালো লাগত। আমার এখনও লাগে। অমর্ত্যর আর সে ফুরসত সম্ভবত নেই। শান্তিনিকেতনে মেলার সময়ে কালোর দোকানে দু'ঘণ্টা। অমর্ত্যর বোধহয় একমাত্র ছুটি মেলে, উনি যখন এমার সঙ্গে কোনো নীলনির্জন দূরের দ্বীপে চলে যান, যেমন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, ফিচারবাডস, কিংবা গ্রিসের কোনো ছোট্ট দ্বীপে। যেখানে ভক্তেরা ওঁর নাগাল পাবে না।

তা, কান আর জোনও ওই গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যারিসে যাচ্ছেন, কিন্তু গোপনে। শুধু অমর্ত্যকে ঠিকানা দিয়ে গেলেন। দেখা কোরো— খুব চুপিচুপি! দু'জনেই শুভ্রকেশ, তবু সমাজকে এতটাই গ্রাহ্য করতেন। ওঁদের কাছে আমরা যখন গেলুম, আমাদের দেখে খুশি হলেন বটে, কিন্তু একটু বুঝি বিব্রতও। 'কে কোথায় দেখে ফেলল' গোছের কিশোরীসুলভ চাউনি।

অমর্ত্যকে মরিস ডব, পিয়েরো স্রাফা, ডেনিস রবার্টসন এঁরাও খুব স্নেহ করতেন। মরিস ডব শহরের একটু বাইরে থাকতেন তাঁর স্ত্রী বারবারাকে নিয়ে। সপ্তাহে দু'বার ট্রিনিটি কলেজে খেতে

আসতেন। আমরাও প্রায়ই ওদের বাড়িতে যেতুম। অমর্ত্য সব কাজে ডব ও স্রাফার পরামর্শ নিতেন, গুরুর কাছে শিষ্যের যেমন উচিত। ১৯৬৩তে যখন ভি কে আর ভি রাওয়ের ডাকে অমর্ত্য DSEতে আসছেন, ট্রিনিটি ত্যাগ সুনিশ্চিত হয়ে গেছে, একদিন দুপুরবেলায় স্রাফা এসে হাজির। আমাদের ১৫ ট্রিনিটি স্ট্রিটের ফ্ল্যাট কলেজের সামনেই ছিল। স্রাফার মুখটি খুব কোমল। স্নেহপ্রবণ, লাজুক মানুষ। অবিবাহিত, কলেজেই বসবাস করেন, আক্রটিজের চিরাচরিত নিয়মে। ওঁকে দেখে আমি বললুম, 'অর্মত্য বাড়ি নেই।' উনি বললেন, 'জানি।' আমি অবাক। 'তোমার সঙ্গেই একটু গল্প করতে এলুম।' আমি তো আরও অবাক।

সার ডেনিস রবার্টসনের একটা গল্প মনে পড়ছে। আমরা সেদিন প্রফেসর চ্যাম্পারনাওনের বাড়ি ডিনারে গেছি। আরও অনেকে ছিলেন। সেদিনই প্রথম আমরা Electronic Music শুনলাম— Eletronically Produced Bash; সঙ্গীতপ্রিয় চ্যাম্পারনাওন অন্তর্মুখীও ছিলেন। সেইখানেই প্রায় অশীতিপর সার ডেনিস আহ্লাদ করে আমায় একটা গান শোনালেন, The Owl and the Pussycat went to sea-র একটি adult version! (প্রসঙ্গত বলি, যদিও মোহরদি আমাকে বলেছিলেন— 'বাবলুকে আমি বলেছিলাম, আমার গানের ক্লাসে তোর ছুটি। আমি এমনিই তোকে নম্বর দিয়ে দেব। কেননা ও ক্লাসে থাকলে আমি নিজেই বেসুরে হয়ে যেতাম!' অমর্ত্য কিন্তু মুড ভালো থাকলে একটাই গান আমাকে দিয়ে ভালোবেসে গেয়ে শোনাতেন। শুনবেন সেটা? 'কে তুমি ডাকিনী রয়েছ আড়ালে/লম্বা ন' হাত চরণ বাড়ালে'— ইত্যাদি। 'ভূশণ্ডির মাঠ' নাটকে কারিয়া পিরেতের গান। আমার তো বাবা বেশ সুন্দরই লাগত!) 'যে-কোনও মুহূর্ত জীবন থেমে যেতে পারে'— এই তীব্র অনুভব অমর্ত্যকে সেই ১৮ বছর বয়স থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজে, এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক জীবন থেকে আরেক জীবনে। অসীম শ্রম যোগ করেছে তাঁর প্রতিভায়। অনন্য একাগ্রতা দিয়েছে তাঁর সাধনায়। অল্প সময়েই অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে যে! সেই ১৮ বছর থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর মহাকালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই একক দৌড়। ঈশ্বরের দয়ায় সে ভয়টা এখন তেমন প্রবল নেই, কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার অভ্যেসটা তো আর যায়নি? ওটা তাঁর চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ওই জন্যেই এত অল্প সময়ে এত বেশি কাজ এবং এত বিভিন্ন ধরনের ভাবনাচিন্তা করা ওঁর পক্ষে সম্ভব। মনকে, শরীরকে উনি শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন। (কেবল ঘুমটা যে দরকারি জিনিস, এটা আর শেখাতে পারেননি। এদিকে এত স্বাস্থ্যসচেতন, এত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত অভ্যাস!) অমর্ত্য এক মিনিটও কিছুই না করে বসে থাকতে পারেন না। আগের মতন লম্বা আড্ডা দেবার মতন ফাঁকা সময় আর অমর্ত্যর নেই। দিনভর একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে ছুটছেন আরেকটায়। তারপরে সারারাত জেগে প্রবন্ধ শেষ করে সকালবেলায় প্লেন ধরে অন্য কোনো মহাদেশে উড়াল দেওয়া, বক্তৃতা দিতে। চল্লিশ বছরের ছোকরাও লজ্জা পাবে ওঁকে খাটতে দেখলে। 'অবসর'-ই অমর্ত্যর কাছে ক্লান্তিকর। এইভাবে উনি কেবলই কাজ আর বিশ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেন। ১৯৯৫-তে মেয়ের বিয়ে দিতে এসে, বিয়ের পরদিনই ছুটলেন নন্দনে সত্যজিৎ রায় বক্তৃতা দিতে। রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে মস্ত এক প্রবন্ধ লিখলেন নিউ ইর্য়ক রিভিউ অফ বুকস্-এর জন্যে। ১৯৯৮-তে।

মাকে পৌঁছতে এসে প্রস্তুত করলেন দিল্লির জন্যে ভারতবর্ষের প্রথম UNESCO বক্তৃতা, সহস্রাব্দের শেষ বিষয়ে। এইই ওঁর বিশ্রাম। কেননা এগুলো একটাও ওঁর 'কাজের' বিষয় নয়।

একটার বিষয় ফিল্ম, একটা সাহিত্য, আরেকটা ইতিহাস। কিন্তু এমন করেই ওঁর চিন্তার জগৎ প্রসারিত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। নিজেকে ঠেলে ঠেলে কতদূর নিয়ে যাওয়া যায়— সেটা দেখাতে চাওয়াই আকৈশোর অভ্যেস করেছেন।

নোবেল পুরস্কারের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি গরিমাতুষ্ট হয়ে কখনোই বসে থাকবেন না।

নিজের মতো করে খুঁজে নেবেন নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ, কর্মক্ষেত্রকে বাড়িয়ে দেবেন এক দিগন্ত থেকে অন্য এক দিগন্তে। নতুন করে আবিষ্কার করবেন বেঁচে থাকার মানে।

শেষ করার আগে একটা কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে। অমর্ত্যর দর্শনে উৎসাহের ব্যাপারে যেমন তাঁর দাদু ক্ষিতিমোহনের অবদান ছিল, তেমনি তাঁর এই দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজের মধ্যে হয়তো তাঁর বাবা আশুতোষ সেনেরও অবদান ছিল।

বাবা আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি এমন একটি দৃশ্য দেখেছিলেন যা তাঁকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। পাঁচজনের একটি পরিবার এসেছিল, 'ফ্যান দাও গো মা'— বলে। গামলায় ফ্যান দেওয়া হল। কর্তা সবটা ফ্যান খেয়ে শূন্য পাত্র নামিয়ে রাখতেই বাচ্চাগুলো কঁকিয়ে কেঁদে উঠল— 'বাবা গো! আমাদের জন্যে একটুও রাখলে না?' এবার যেন ক্ষুধার্ত পিতার ঘুম ভাঙলো। সে ফুটপাতে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলল— আর বলতে লাগল— 'ভগবান, এ তুই আমার কী করলি? আমাকে জনোয়ার বানিয়ে দিলি? জনোয়ার?'

সেই থেকেই বাবা মনস্থির করেছিলেন হাতে যখন সময় আসবে, পৃথিবীতে ক্ষুধার নিরসন করার কাজে বাকি জীবনটা নিবেদন করবেন। বাবা ছিলেন Soil Chemist, আমার বিয়ের সময়ে UPSC-র সদস্য। অবসর নিয়ে বাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে তাঁর নিজস্ব সেই প্রাচীন সবুজ সেভ্রলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন— IR-8, তাইচুং ইত্যাদি নতুন পাওয়া সংকর জাতের ধানের বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে, চাষ করার নিয়মকানুন শিখিয়ে দিতেন। মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে হবে, খাবারের উৎপাদন বাড়াতে হবে, কাউকে ক্ষুধার্ত রাখলে জগৎ চলবে না— বাবার ছিল এটা স্বপ্ন। আজ বেঁচে থাকলে বাবা দেখতে পেতেন, অনেক বড়ো মাপে তাঁর স্বপ্নটাই তাঁর ছেলে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রেসের জন্য ছবি খুঁজতে খুঁজতে একটা পুরোনো টেলিগ্রাম বেরিয়ে পড়ল সেদিন— জেনিভা থেকে অমর্ত্য পাঠিয়েছেন নবনীতাকে, ২৮ জুন ১৯৭০। আমাদের বিয়ের তারিখে 'Treat this telegram as flowers.'

দিল্লি, তেরসা নভেম্বর, ১৯৯৮, ভোর পাঁচটা। সারারাত্রি জেগে লেখাটি লিখে ফেললুম, যা মনে এলো, তাই। আজ নোবেল লরিয়েট অমর্ত্যর জন্মদিন। দুর্জয় সাফল্য ব্যক্তিমানুষটাকে ক্রমশ গিলে ফেলতে থাকে। এই জগতের নিয়ম। বাহির ভিড় করে এসে ভিতরটাকে একা করে দেয়। তাই প্রার্থনা করছি, এমা যেটাকে বলেন 'Amartya's' great big laugh — সেটি শত সাফল্যেও চির-অম্লান থাকুক। আর অমর্ত্যকে জন্মদিনে বলি— 'Treat this article as flowers.'

দেশ পত্রিকা, নভেম্বর ১৯৯৮